(Magh) and of his other enemies. These twelve Boioes of Bengal ruled over all the low lands watered by the Ganges (*eram senhores de todas terras de baixo queregao orio Ganges*") পর্ত্তুগীজ পর্য্যটকগণ এবং যেসব জেস্যুইট পাদ্রী ঐ সময়ে বাঙ্গলাদেশে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতে আসিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে অনেকেই বারভূঁইয়াগণের অপূর্ব্ব বীর্য্যবত্তার কাহিনী জ্বলন্ত ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই বারভূঁইয়াদের মধ্যে প্রায় সকলেই তেজবীর্যসম্পন্ন ছিলেন। কিন্তু ইহাঁদের মধ্যে বিক্রমপুরের কেদার রায়, যশোহরের প্রতাপাদিত্য এবং চন্দ্রদ্বীপের কন্দর্পনারায়ণ ও খিজিরপুরের ঈশার্খার নামই সমধিক প্রসিদ্ধ। কেদার রায়, প্রতাপাদিত্য এই দুই মহাপুরুষের পুণ্য-জীবন-কথা লইয়া বাঙ্গলা সাহিত্যে নাটক, ইতিহাস, উপন্যাস প্রভৃতি রচিত হওয়ায় বাঙ্গলার ঘরে ঘরেই ইঁহাদের নাম সুপরিচিত। বর্ত্তমান প্রবন্ধে চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশের আদি ইতিহাস এবং তৎসহ কন্দর্পনারায়ণ রায়ের কার্য্যাবলীর আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি।

চন্দ্রদ্বীপ নামোৎপত্তির কারণ।

উপাখ্যানবহুল বাঙ্গলাদেশে প্রত্যেক ব্যাপারের সহিতই কোন না কোন উপাখ্যানের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশের আদি ইতি-কথার সঙ্গেও বহুবিধ কিংবদন্তী বিজড়িত। সে সমুদয় বংশপরম্পরানুগত কিংবদন্তীর মধ্যে কতটুকু সত্য বা মিথ্যা নিহিত আছে তাহা সামান্য অনুসন্ধিৎসার সহিত আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। সম্প্রতি শ্রীচন্দ্রদেবের একখানা তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হওয়ায় এতদিন পর্য্যন্ত যে সকল কিংবদন্তী বা কুলগ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়াই যে সকল পূর্ব্বতন ঐতিহাসিকগণ চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশ সম্বন্ধে গ্রন্থ বা প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন, তাহার পরিবর্ত্তন ও সংশোধন আবশ্যক হইয়াছে।

এতকাল চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশের উৎপত্তি সম্পর্কে যে সমস্ত কিংবদন্তী

প্রামাণিক রূপে গৃহীত হইয়াছিল, আমরা একে একে সে সকলের উল্লেখ করিতেছি।

(১) অতি পূর্ব্বকালে বিক্রমপুরে চন্দ্রশেখর চক্রবর্ত্তী নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি ভগবতীর উপাসক ছিলেন। চন্দ্রশেখর বিবাহের পরে নবপরিণীতা পত্নীকে গৃহে আনয়ন করিবার কালে জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার পরিণীতা বনিতা ও তাঁহার উপাস্যা দেবী একই নামে অভিহিতা। তখন তাঁহার মস্তক ঘুরিয়া গেল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন ইষ্টদেবীর নাম গ্রহণ সময়ে কিরূপে তাঁহাকে মাতৃ সম্বোধন করা যাইবে। এই চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া তিনি গৃহ পরিত্যাগ করিলেন। প্রবাদ এইরূপ যে, যে সময়ে চন্দ্রশেখর একখানি তরাতে আরোহণ করিয়া অকূল সাগরজলে ভাসিতেছিলেন, তখন দেখিতে পাইলেন যে একটি ধীবর বালিকা ঐ অসীম জলরাশির মধ্যে একমাত্র ক্ষুদ্র তরী আরোহণে মাছ ধরিতেছে। তদ্দৃষ্টে তাঁহার মনোমধ্যে যারপর নাই বিস্ময়ের সঞ্চার হইল। তিনি সেই বালিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মা তুমি কে এবং কোন্ সাহসে একাকিনী এই অকূল পারাবারে অবস্থান করিতেছ? তদুত্তরে বালিকা বলিল যে, মদীয় প্রিয় শিষ্য অকূলপাথারে ভাসিতেছে, আমি কিপ্রকারে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি? আমি তাহার অপেক্ষায় এই সলিলরাশি মধ্যে অবস্থান করিতেছি। তাহার ভ্রম নিরসন করাই আমার উদ্দেশ্য। তাহার সহধর্ম্মিণীর নামের সহিত আমার নামের একতাপ্রযুক্ত সে কিরূপে আমাকে মাতৃসম্বোধন করিবে তাহা ভাবিয়া আকুল হইয়া গৃহ পরিত্যাগ করিয়াছে। কিন্তু যদি বুঝিত যে জগতের যাবতীয় নরনারী ও সমুদয় বস্তুনিচয়ই আমাতে প্রতিবিম্বিত এবং আমারই অংশসম্ভূত, তাহা হইলে সে কখনও গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বিবাগী হইত না। বালিকার এই উপদেশ শুনিয়া চন্দ্রশেখর বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহারই ইষ্টদেবী আবির্ভূত হইয়া ভক্তের সন্দেহ দূর করিতেছেন। তখন ভক্তিভাবে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "মাতঃ! এতদিনে

আমার ভ্রম দূর হইল, এখন আমার প্রতি কি আজ্ঞা হয়?" দেবী বলিলেন, "যাও বৎস, এখন স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিয়া পরিণীতা বনিতা-সহ সুখ-স্বচ্ছন্দে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ কর।"

দেবী আরও বলিলেন, 'এই যে অকূল সাগর বিদ্যমান দেখিতেছ, ইহা ত্বরায় লুপ্ত হইয়া এইস্থান দ্বীপে পরিণত হইবে। এবং তোমার নামানুসারে তাহার নাম হইবে চন্দ্রদ্বীপ।"

অপর কিম্বদন্তী এই যে পূর্ব্বকালে চন্দ্রশেখর চক্রবর্ত্তী নামে একজন সাধু মহাত্মা ছিলেন, তিনি অত্যন্ত ভ্রমণপ্রিয় ছিলেন। একবার স্বীয় ভক্ত-ভৃত্য দনুজমর্দ্দন দেকে সঙ্গে লইয়া ভ্রমণে বাহির হ'ন। একদিন চন্দ্রশেখর রাত্রিতে নৌকায় শুইয়া স্বপ্ন দেখিলেন যে দেবী পার্ব্বতী তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতেছেন, "বৎস! আগামী কল্য প্রত্যুষে তোমার নৌকাসংলগ্ন জলমধ্যে তোমার ভৃত্যকে নামাইয়া দিও, দনুজমর্দ্দন জলমধ্যে ডুব দিলেই তিনটি শ্রীমূর্ত্তি প্রাপ্ত হইবে, ঐ শ্রীমূর্ত্তি তিনটি যে ব্যক্তি যত্নপূর্ব্বক স্থাপন করিবে, সে নিশ্চয়ই এই প্রদেশের রাজা হইবে।" ভৃত্য দনুজমর্দ্দন দুইবার ডুব দিয়া দুইটি মূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়, সে পুনর্ব্বার আর ডুব দিতে রাজী হয় নাই, যদি পুনরায় ডুব দিত তাহা হইলে দেবীর কৃপাবলে চঞ্চলা লক্ষ্মীদেবীকে অচঞ্চলারূপেই গৃহে পাইত, কিন্তু দৈব-চক্রে তাহা হইল না! যে নদীর জলমধ্যে ঐ মূর্ত্তি দুইটি পাওয়া যায়, ঐ নদীর নাম সুগন্ধা বা সোন্ধা। সোন্ধার সহিত পৌরাণিক উপাখ্যানের একটু সংযোগ আছে। পুরাণে বর্ণিত আছে যে, সতী-বিয়োগ-বিধুর মহাদেব যখন সতীদেহ স্কন্ধে করিয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন বিষ্ণু-চক্রে ছিন্ন হইয়া তাঁহার নাসিকা সোন্ধার জলে পড়িয়া যায়, এই জন্যই এই নদীর নাম সুগন্ধা হইয়াছে। বাখরগঞ্জের বহুস্থানই এই সুগন্ধার জলনিঃসরণের সঙ্গে ক্রমে * জলগর্ভ হইতে উত্থিত হইয়াছে।

* J. A. S. B. 1874. History of Bakarganj Beveridge.
ফরিদপুরের ইতিহাস—শ্রীআনন্দনাথ রায় প্রণীত।

(২) "সমুদ্র-পরিবেষ্টিত চন্দ্ররাজবংশের অধিষ্ঠান ভূমিই চন্দ্রদ্বীপ আখ্যা লাভ করিয়াছিল। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে সুপ্রসিদ্ধ চান্দ্র-ব্যাকরণ রচয়িতা চন্দ্রগোমীর আবির্ভাব হইয়াছিল। তিব্বতের জ্ঞান-ভাণ্ডার টেঙ্গুর গ্রন্থে লিখিত আছে, 'বরেন্দ্রের ক্ষত্রিয় বংশে চন্দ্র-গোমীর জন্ম। আচার্য্য স্থিরমতির নিকট ইনি সূত্র ও অভিধর্ম্ম-পিটক অধ্যয়ন করেন এবং বিদ্যাধরাচার্য্য অশোকের নিকট বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হন। তিনি অবলোকিতেশ্বর ও তারার বড় ভক্ত ছিলেন। তৎকালে বরেন্দ্র হর্ষের উত্তরাধিকারী শিলের সাম্রাজ্যান্তর্গত ছিল এবং সিংহ নামক এক লিচ্ছবি এই প্রদেশ শাসন করিতেছিলেন। সম্রাট্ শিল নিজ কন্যার সহিত চন্দ্রগোমীর বিবাহ দিবেন ইচ্ছা করিয়া বরেন্দ্র-রাজের নিকট সংবাদ প্রেরণ করেন। চন্দ্রগোমীও প্রথমে তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিলেন, কিন্তু পরে সেই রাজকন্যার তারা নাম শুনিয়া তাঁহার আরাধ্যা দেবী তারার নামের সহিত মিল হওয়ায় আর বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন না। বরেন্দ্ররাজ ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে তখন একটি সম্পুটে আবদ্ধ করিয়া গঙ্গায় নিক্ষেপ করিলেন। পেটকাটি ভাসিতে ভাসিতে গঙ্গা ও সমুদ্রের সঙ্গমের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলে তথায় একটি দ্বীপ উৎপন্ন হইল। চন্দ্রগোমীর নামানুসারে এই ভূভাগ চন্দ্রদ্বীপ নামে পরিচিত হইয়াছিল।' * এই কিংবদন্তীর সহিত পূর্ব্বোল্লিখিত কিংবদন্তীর যথেষ্ট ঐক্য আছে। চন্দ্রগোমী ও চন্দ্রশেখরের মানসিক বিপ্লবের একই কারণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তবে একটু সামান্য ঘটনা-বৈচিত্র্য আছে এই পর্য্যন্ত। প্রাচীন বাঙ্গলার ভৌগোলিক বিবরণ আলোচনা করিতে গেলে স্পষ্টই জানিতে পারা যায় যে, পূর্ব্বে পূর্ব্ববঙ্গের বহু স্থানই সমুদ্র-গর্ভে নিহিত ছিল, পরে কাল-পরিবর্ত্তনে সমুদ্র দূরে সরিয়া যায় এবং ক্রমশঃ বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপের সৃষ্টি হয়। চন্দ্রদ্বীপও এইরূপ ভাবে উদ্ভূত, এই অনুমান করা যাইতে পারে।"

* রাজন্যকাণ্ড—শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।

চন্দ্রদ্বীপ নামের প্রাচীনত্ব।

চন্দ্রদ্বীপ যে অতি প্রাচীন স্থান তাহা সহজেই সপ্রমাণ হয়। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়স্থিত পুস্তকাগারে 'অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা' নামক একখানা প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি আছে; ঐ গ্রন্থখানা ১০১৫ খ্রীঃ অঃ নকল হইয়াছিল বলিয়া পণ্ডিতগণ নির্ণয় করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থে চন্দ্রদ্বীপস্থ 'ভগবতীতারা' নামক এক দেবীর চিত্র আছে। ভগবতীতারাকে দেখিবার জন্য নানা স্থান হইতে যাত্রিগণ আসিতেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে চন্দ্রদ্বীপ একাদশ শতাব্দীর পূর্ব্ব হইতেই প্রসিদ্ধ স্থান বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত ছিল। *

চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশ।

বিশ্বকোষকার প্রাচ্য-বিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বিশ্বকোষে চন্দ্রদ্বীপ শব্দে সেনবংশীয় শেষ নৃপতি দনুজমাধব সেন ও দনুজমর্দ্দন দেবকে অভিন্ন ব্যক্তিরূপে চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশের আদিপুরুষ বলিয়া সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। বঙ্গের অনেক আধুনিক ঐতিহাসিক নগেন্দ্রবাবুর এই মতের প্রতিবাদ করিয়াছেন। তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায়, পণ্ডিত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, গৌড়ের ইতিহাস প্রণেতা পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী প্রভৃতির নাম বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। প্রতিবাদকারীগণ মধ্যে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র, ৺রাবেশচন্দ্র শেঠ ও রাখালবাবু দনুজমর্দ্দন দেবের দুইটি মুদ্রার দ্বারা তাঁহাদের উক্তির সমর্থন করিয়াছিলেন। মুদ্রাদ্বয় মধ্যে একটি গৌড়ের নিকটস্থ পাণ্ডুয়ায় আবিষ্কৃত হয়, অপরটি বরিশাল জেলাস্থ চন্দ্রদ্বীপ হইতে পাওয়া যায়। সে সকলের আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় নিজ ভ্রম স্বীকার করিয়া লিখিয়াছেন, "দ্বিজ বাচস্পতির বঙ্গজ কুলজিসার-সংগ্রহে লিখিত আছে,—

* Catalogue of the Buddhist Sanskrit Manuscripts in the University Library, Cambridge by Cecil Bendall, M. A. P. 151. A. Foucher, Page 192.

'দনুজমর্দ্দন রাজা চন্দ্রদ্বীপ পতি —
সেই হইল বঙ্গজ কায়স্থ গোষ্টীপতি ॥'

মূল পুঁথি হইতে নকলকারীর দোষে একস্থানে 'দনুজমর্দ্দন' স্থানে 'দনুজমাধব' পাঠ হইয়া ভ্রমক্রমে পূর্ব্বে দনুজমাধব সেন ও দনুজ-মর্দ্দন দেবকে অভিন্ন বলিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম, এখন উভয়ে ভিন্ন বংশীয় ও ভিন্ন সময়ের লোক বলিয়াই প্রতিপন্ন হইতেছেন।"*

বর্ত্তমান চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশের বহুপূর্ব্বে তথায় চন্দ্রবংশের অভ্যুদয় হয়। চন্দ্রবংশের পরিচয় শ্রীচন্দ্রদেবের তাম্রশাসনের আবিষ্কারের পূর্ব্বে একরূপ অজ্ঞাত ছিল বলিতে পারা যায়। বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস লেখক তারানাথ ব্যতীত চন্দ্রবংশ সম্বন্ধে আর তেমন কেহই বিশেষ কোনও আলোচনা করেন নাই। তারানাথ খ্রীঃ ১৬শ।১৭শ শতাব্দীর লোক, কাজেই তাঁহার লিখিত বিবরণী সত্য বলিয়া গ্রহণ করা সঙ্গত নহে। সে যাহা হউক, শ্রীচন্দ্রদেবের তাম্রশাসন হইতেই চন্দ্রবংশের অস্তিত্ব সপ্রমাণ হয়। উক্ত তাম্রফলকে চন্দ্রদ্বীপ সম্বন্ধে স্পষ্ট উল্লেখ আছে। যথা :— * * আধারো হরিকেলরাজককুদচ্ছত্রস্মিতানাং শ্রিয়াং যশ্চন্দ্রোপপদে বভূব নৃপতির্দ্বীপে দিলীপোমঃ—ইত্যাদি। মোট কথা, খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতেই চন্দ্রদ্বীপের উদ্ভব এবং চন্দ্রবংশের অভ্যুদয় হয়, এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। চন্দ্রবংশের সহিত বিক্রমপুরের ইতিহাসেরও সংযোগ আছে। শ্রীচন্দ্রদেবের যে তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি বিজয়শ্রীমণ্ডিত শ্রীবিক্রমপুর নামক জয়স্কন্ধাবার হইতে ভূমি দান করিতেছেন। অতএব চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশের শ্রীচন্দ্র কোনও সুযোগে বিক্রমপুরে একটি বৌদ্ধরাজ্য স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এরূপ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে; কাজেই এত দিন পর্য্যন্ত চন্দ্রদ্বীপ সম্বন্ধে যে ভ্রান্ত ধারণা ছিল তাহা দূরীভূত হইল। চন্দ্রবংশ কতদিন পর্য্যন্ত যে চন্দ্রদ্বীপের সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। চন্দ্রবংশের বহুপরে দনুজ-

---

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—রাজন্যকাণ্ড (অষ্টম অধ্যায় ৩৭০পৃষ্ঠা)।

মর্দ্দন রাজা চন্দ্রদ্বীপ-রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। দনুজমর্দ্দন দে উপাধিধারী কায়স্থ ছিলেন। ঘটকগণ তাঁহাকে বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজের সমাজপতি এবং রাজা বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। দেবরাজবংশীয়-গণের বংশাবলী সম্বন্ধে নানারূপ মতানৈক্য দৃষ্ট হয়। আমরা ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বীগণের প্রদর্শিত বংশাবলী উদ্ধৃত করিলাম।—

(ডাক্তার ওয়াইজ ও বঙ্গীয় সমাজে প্রকাশিত বংশাবলী)

রাজা দনুজমর্দ্দন
|
রমাবল্লভ রায়
|
কৃষ্ণবল্লভ রায়
|
জয়দেব (নিঃসন্তান) — কমলা (কন্যা)
|
পরমানন্দ বসু রায়)
(চন্দ্রদ্বীপের রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন)

(মিঃ বিভারেজ প্রদত্ত বংশাবলী)

দনুজমর্দ্দন
|
রামনাথ
|
জানকীবল্লভ
|
রামবল্লভ
|
শ্রীবল্লভ
|
হরিবল্লভ
|
কৃষ্ণবল্লভ
|
কমলা (কন্যা)
|
পরমানন্দ বসু (রায়)

১০

কন্দর্পনারায়ণ।

'বিশ্বকোষ' প্রণেতা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু উক্ত দেববংশ সম্পর্কে ভিন্নরূপ আলোচনা করিয়াছেন। এখানে বাহুল্য ভয়ে সে সকল আলোচনার উল্লেখ করিলাম না। সে যাহা হউক, আমরা দেখিতে পাইতেছি যে কন্যা কমলার বংশধরগণ বর্ত্তমান চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশ। পরমানন্দের পুত্র জগদানন্দ, জগদানন্দের পুত্র কন্দর্পনারায়ণই বার ভূঁইয়ার অন্যতম প্রসিদ্ধ বীর ছিলেন। আমাদের দেশের কুলাচার্য্যগণ কুলীন ব্যতীত অন্য কোন বংশের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন না, ইহাই তাঁহাদের সনাতন রীতি। সে জন্যই কোনও ঘটককারিকায় চাঁদ রায় কেদার রায় সম্বন্ধে কোন বিষয়ের উল্লেখ নাই। সৌভাগ্যের বিষয় কন্দর্পনারায়ণ রায় বসুবংশীয় কুলীন, কাজেই তাঁহার সম্বন্ধে কুল-গ্রন্থে অনেক কথা লিপিবদ্ধ আছে। ঘটককারিকায় দেখিতে পাওয়া যায়ঃ—

কন্দর্পোকন্দর্পো জগদানন্দকাত্মজঃ।
মহাধনুর্দ্ধরো মানী মহারথো মহাশূরঃ॥
অক্ষৌহিণীপতির্ধীরঃ সব্যসাচী সমোরণে।
যুদ্ধপ্রিয়ো মহাচক্রী যবনারির্ম্মহাবলঃ॥
যবনাধিপতিং গাজি, রণে ব্যাপাদয়ৎ কিল।
মগবীর্য্যং তথা খর্ব্বমকরোৎ সঃ নৃপোত্তমঃ॥
স্থাপয়মাস পুরঞ্চ বাসুরিকাটি সংজ্ঞবাম্।
তথা মাধবপাশাঞ্চ ক্ষুদ্রকাটিং তথৈবচ॥
অতাড়য়ৎ যবনান্ স হোসেনাখ্যা পুরোত্তথা।
রথীনাঞ্চ রথীশূরঃ সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদঃ॥

কন্দর্পনারায়ণের বীরত্বসম্বন্ধে ঘটককারিকায় যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহার একবর্ণও অতিরঞ্জিত নহে। কন্দর্পনারায়ণ যখন চন্দ্রদ্বীপের রাজা, তখন রালফ্ ফিচ্ ১৫৮৬ খ্রীঃ অঃ চাটিগাঁ হইতে বাঙ্গলাদেশে

আগমন করেন এবং অবশেষে বাক্‌লায় উপস্থিত হন। তিনি বাক্‌লা চন্দ্রদ্বীপের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন,—"From Chittagong in Bengal I came to Bacola (Bakla), the king where of is a gentile, a man very well disposed, and delighteth much to shoot in a gun. His country is very great and fruitful and hath store of rice, much cotton cloth and cloth of silk. The houses be very fair and high builded, the streets large, the people naked, except a little cloth about their waist. The women wear great store of silver hoops about their necks and arms, and their legs are ringed about with silver and copper, and rings made of elephant's teeth."*

কন্দর্পনারায়ণ তিনবার রণক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছিলেন। (১) সনদ্বীপের যুদ্ধ, (২) মাসুম কাবুলির সহিত রণ, (৩) মোগল সেনাধ্যক্ষ মুরাদখাঁর সহিত সংগ্রাম। এই তিন যুদ্ধেই তিনি বিশেষ বীর্য্যবত্তার এবং সাহসিকতার পরিচয় দিয়াছিলেন। পাঠান এবং মোগল এ উভয়ের সঙ্গেই তাঁহাকে সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। আকবরনামায়ও কন্দর্পনারায়ণের নামের উল্লেখ আছে। আকবর বার-ভূঁইয়ার গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার জন্য বহুদিন হইতেই যত্নপরায়ণ ছিলেন এবং তারজন্য মানসিংহ, মন্দারায়, কিলমক্, মুরাদ প্রভৃতি মোগল সেনাপতিগণকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ঈশাখাঁ, প্রতাপ, কেদার রায় প্রভৃতির ন্যায় কন্দর্পনারায়ণ রায়ও মোগলসেনাপতি মুরাদখাঁর অভিযানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরিশেষে অন্যান্যের ন্যায় তাঁহাকেও পরাস্ত হইতে হইয়াছিল।† শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায়

---

* Hackluty's Voyages, Vol. II P. 257.

† Bakla or Chandradwip was invaded by Muradkhan, one of the generals of Akbar and annexed to the empire. H. Bloch-

বলেন, "বারভূঞার বিদ্রোহদলের সহিত যোগ দিবার অব্যবহিত পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়।" এ উক্তির তিনি কোনও প্রমাণ দেন নাই।

এই রাজবংশের প্রাচীন স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ একটি মাত্র কামান বিদ্যমান আছে। কামানটি পিত্তল-নির্ম্মিত। শ্রীপুরনিবাসী রূপিয়া খাঁ কর্ত্তৃক ইহা প্রস্তুত হইয়াছিল। ইহার দৈর্ঘ্য ৭৸৹ ফিট, বেড় ২৷৹ ফিট, মধ্যভাগের ব্যাস ১৯৷৹ ইঞ্চি। ঐ কামানের গায়ে রাজা কন্দর্পনারায়ণের নাম ও '৩১৮' এইরূপ লিখিত আছে। রূপিয়া খাঁ সাং শ্রীপুর লেখা থাকায় তাহাকে শ্রীপুরের অধিবাসী বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছে।

কন্দর্পনারায়ণ রায়ের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই চন্দ্রদ্বীপের রাজধানী কাচুয়া নামক স্থান হইতে মাধবপাশায় স্থানান্তরিত হয়। বর্ত্তমান সময়েও কন্দর্পনারায়ণের বংশধরগণ তথায়ই বাস করিতেছেন। সম্ভবতঃ পর্ত্তুগীজ দস্যুগণের এবং মগগণের ঘন ঘন আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্যই এই ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছিল। কাচুয়াতে অদ্যাপি বহু প্রাচীন দেবমন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ পরিলক্ষিত হয়। কন্দর্পনারায়ণের পুত্রের নাম রামচন্দ্র রায়। কন্দর্পনারায়ণের মৃত্যুর পর তিনি চন্দ্রদ্বীপের সিংহাসনারোহণ করেন; সে সময়ে তাঁহার বয়স মাত্র আট বৎসর হইয়াছিল।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

---

man A. S Bengal 1873, Elliot's History Vol. III.—'Akbarnama.'

বৌদ্ধ-ধর্ম্ম

[৯]

বৌদ্ধ-ধর্ম্মের অধঃপাত।

সহজযানের কথা গত মাসে বলিয়াছি। সহজযানের ফল যে অতি বিষময় হইয়াছিল তাহা বোধ হয় কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে না। যে পঞ্চকামোপভোগ নিবারণের জন্য বুদ্ধদেব প্রাণ-পণে চেষ্টা করিয়াছিলেন, যে চরিত্র-বিশুদ্ধি বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাণ, যে চরিত্র-বিশুদ্ধির জন্য হীনযান হইতেও মহাযানের মহত্ব, যে চরিত্র-বিশুদ্ধির জন্য আর্য্যদেব 'চরিত্র-বিশুদ্ধি-প্রকরণ' নামে গ্রন্থই রচনা করিয়া গিয়াছেন, সহজযানে সেই চরিত্র-বিশুদ্ধি একেবারেই পরি-ত্যাগ করিয়া দিল। বৌদ্ধ-ধর্ম্ম সহজ করিতে গিয়া, নির্ব্বাণ সহজ করিতে গিয়া, অদ্বয়বাদ সহজ করিতে গিয়া, সহজযানীরা যে মত প্রচার করিলেন, তাহাতে ব্যভিচারের স্রোত ভয়ানক বাড়িয়া উঠিল। ক্রমে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম 'নেড়ানেড়া'র দলে গিয়া দাঁড়াইল। সহজযানীরা সন্ধ্যাভাষায় গান লিখিতে আরম্ভ করিলেন। সন্ধ্যাভাষার অর্থ আলোআঁধারী ভাষা। কাণে শুনিবামাত্র একরকম অর্থ বোধ হয়, কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলে তাহার গূঢ় অর্থ অতি ভয়ানক। তাঁহারা দেহতত্ত্বের গান লিখিতে আরম্ভ করিলেন। সমস্ত জগৎ ব্রহ্মাণ্ড এই দেহের মধ্যেই আছে, তাহাই দেখাইতে আরম্ভ করি-লেন। সুতরাং দেহে আকাশ, কামধাতু, রূপধাতু, অরূপধাতু, সুমেরু সবই রহিল। যে বোধিচিত্ত মহাযানমতে নির্ব্বাণ পাই-বার আশায় ক্রমেই আপনার উন্নতি করিতেছিলেন, দেহতত্ত্বের মধ্যে আসিয়া তাহার যে কি দশা হইল তাহা আর লিখিয়া জানাইব না। জানাইতে গেলে সভ্যতার সীমা অতিক্রম করিয়া যাইতে

হয়। দেশের লোকে এই ইন্দ্রিয়াসক্ত বৌদ্ধদিগকে কি চক্ষে দেখিত তাহা যদি জানিবার ইচ্ছা থাকে, প্রবোধচন্দ্রোদয়ের তৃতীয় অঙ্কটি একবার মন দিয়া পড়িয়া দেখিবেন। ঐ নাটকখানি ১০৯০ হইতে ১১০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে লেখা হয়। উহাতে বৌদ্ধ ও জৈন যতিদের যে 'কেচ্ছা' দেওয়া আছে, তাহা পড়িলে অবাক হইয়া যাইতে হয়। বৌদ্ধ-ভিক্ষুরা তখনও খুব বড়মানুষ, কাষায় বস্ত্র অথবা ছোবান কাপড় পরেন; কিন্তু সে রেশমের কাপড়। পুঁথি পড়েন—সে পুঁথির পাটায় সোণালী কাজকরা; যে কাপড়ে পুঁথি বাঁধা থাকে, তাহা রেশমের, তাহার উপর নানারকম কাজকরা। ভিক্ষুরা তখনও খুব বাবু, বিলাসী ও তাহার উপর অত্যন্ত ইন্দ্রিয়াসক্ত।

এই অধঃপাতের একটা দিক্। আর একটা দিক্ হইতে অধঃপাতের কারণ দেখাই। মহাযান ধর্ম্ম খুব উঁচু ধর্ম্ম—সেকথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু মহাযান বুঝিতে, আয়ত্ত করিতে ও মহাযানের মত কর্ম্ম করিতে বহুকাল লাগে, অনেক পরিশ্রম করিতে হয়—অনেক পড়িতে হয়—অনেক ভাবনাচিন্তা করিতে হয়। ততটা সকলে পারিয়া উঠিত না। মহাযানের আচার্য্যেরা ইহার জন্য একটা সহজ পন্থা বাহির করিয়া দিয়াছিলেন—তাহারা বলিয়া দিয়াছিলেন তোমরা 'ধারণী' মুখস্থ কর—'ধারণী' জপ কর—ধারণার পুঁথি পূজা কর। তাহা হইলেই তোমাদের মহাযানের পাঠ, স্বাধ্যায়—যোগ—সকলের ফল হইবে। মনে কর 'প্রজ্ঞাপারমিতা' একখানি বৃহৎ গ্রন্থ—পড়িতে অনেক দিন লাগে—আয়ত্ত করিতে আরও দিন লাগে—তাহার মত কাজ করিতে আরও দিন লাগে। আচার্য্য বলিয়া দিলেন 'প্রজ্ঞাপারমিতা হৃদয়-ধারণী'—মুখস্থ কর—তাহা হইলেই তোমার প্রজ্ঞাপারমিতা পাঠের সমস্ত ফল হইবে। এইরূপ যদি

"ওঁ নমঃ সমস্তবুদ্ধানাং অপ্রতিহতশাসনানাং, ওঁ কীলে কীলে তথাগতোহধ্যবসাস্তে বরদে উত্তমোত্তমতথাগতে ভব ক্রীং ফট্ স্বাহা"—এইটি কণ্ঠস্থ কর তাহা হইলে গণ্ডব্যূহসূত্র পাঠের ফল হইবে।

ওঁ নমঃ সমন্তবুদ্ধানাং অপ্রতিহতশাসনানাং, ওঁ ধুণু ধুণু ক্রীং ফট্ স্বাহা"—এই ধারণী পাঠ করিলে সমাধিরাজসূত্র পাঠের ফল হইবে।

ওঁ নমঃ সমন্তবুদ্ধানাং অপ্রতিহতশাসনানাং, ওঁ মনিধরি বাজ্রণি মহাপ্রতিসরে ক্রীং ক্রীং ফট্ ফট্ স্বাহা"—এই মন্ত্র পাঠ করিলে মহাপ্রতিসরা পাঠের ফল হইবে।

এইরূপ যে কত ধারণী তৈয়ার হইয়াছিল তাহার সংখ্যা করা যায় না। এক "বৃহদ্ধারণী সংগ্রহে" আমরা চারি শত এগারটি ধারণী পাইযাছি। ক্রমে ধারণী মুখস্থ করাও কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। তখন এক অক্ষর—দুই অক্ষর—মন্ত্র হইতে লাগিল। মন্ত্রপাঠ, মন্ত্রজপ, বৌদ্ধ-ধর্ম্মের শেষ অবস্থা হইয়া দাঁড়াইল। তখন 'হুং' 'ফট্' 'ক্রীং' 'স্বাহা' এই সকল শব্দের প্রচুর ব্যবহার হইতে লাগিল। বৌদ্ধেরা ইহাতেই আপনাদের কৃতার্থ মনে করিতে লাগিলেন। যে মহাযান ধর্ম্ম চিন্তাশক্তির চরম সীমায় উঠিয়াছিল মন্ত্রযানে তাহা ক্রমে 'হুং' 'ফট্' 'স্বাহায'—দাঁড়াইল। ইহা কি অধঃপাত নহে।

বৌদ্ধ-ধর্ম্মে দেবতার সংশ্রব নাই—দেবতার পূজা-অর্চ্চা হীনযানে ছিলই না। বুদ্ধদেবের মৃত্যুর কতদিন পরে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি বিহারে প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল, তাহা লইয়া ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের এখনও মতভেদ আছে—কেহ বলেন চারি শত বৎসর পরে, কেহ বলেন পাঁচ শত বৎসর পরে। ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মে গেলে গান্ধার-শিল্পের কুঠরীতে প্রথম বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। সেগুলি বুদ্ধের পাঁচ ছয় শত বৎসর পরে নির্ম্মিত হয়। মহাযানেও শাক্যসিংহের মূর্ত্তি বিহারে বিহারে থাকিত। তাঁহারা উহাকে নির্ব্বাণলাভের উপায় বলিয়া মনে করিতেন। ক্রমে একটি একটি করিয়া ধ্যানী বুদ্ধ আসিতে লাগিলেন। প্রথম 'অমিতাভ', তারপর 'অক্ষোভ্য', তারপর 'বৈরোচন', তারপর 'রত্নসম্ভব', তারপর 'অমোঘসিদ্ধি' আসিয়া জমি-

লেন। ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের মগধ-কুঠরীতে অনেকগুলি চৈত্য বা স্তূপ আছে। তাহার চারিদিকে চারিটি 'তথাগতের' মূর্ত্তি আছে। প্রথম তথাগত 'বৈরোচন' স্তূপের মধ্যেই থাকিতেন। তাহার জন্য স্তূপের গায়ে কুলুঙ্গী কাটা হইত না। ক্রমে তিনিও আসিয়া অগ্নিকোণে জমিলেন। শাক্যসিংহ তখন একেবারে উপায় হইয়া গিয়াছেন—স্তূপে তাঁহার স্থান নাই—তাঁহার স্থান বিহারের মধ্যস্থলে যে মন্দির—তাহাতে। তখনকার বৌদ্ধেরা বলিতেন, তিনি 'পঞ্চতথাগতে'র অথবা পঞ্চধ্যানী বুদ্ধের কলম মাত্র—তিনি পঞ্চধ্যানী বুদ্ধের মত কলম বন্দী করিয়া গিয়াছেন। ক্রমে এই পঞ্চতথাগতে পাঁচটি শক্তি দাঁড়াইল। শক্তিগণের নাম—'লোচনা', 'মামকী', 'তারা', 'পাস্তরা', 'আর্য্যতারিকা'। বহুকাল অবধি তাঁহারা যন্ত্রে থাকিতেন, তাঁহাদের মূর্ত্তি ছিল না—ক্রমে তাঁহাদেরও মূর্ত্তি হইল। পঞ্চধ্যানী বুদ্ধের পঞ্চশক্তিতে পাঁচজন 'বোধিসত্ত্ব' হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে 'মঞ্জুশ্রী' ও 'অবলোকিতেশ্বর' প্রধান। বর্ত্তমান কল্পে অর্থাৎ ভদ্রকল্পে 'অমিতাভ' প্রধান ধ্যানী বুদ্ধ। তাঁহার বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর —প্রধান বোধিসত্ত্ব। অবলোকিতেশ্বর করুণার মূর্ত্তি। তিনি মহোৎসাহে জীব উদ্ধার করিতেছেন, সুতরাং তাঁহার পূজা খুব আরম্ভ হইল। সেবকের উৎসাহ অনুসারে তাঁহার অনেক হস্ত হইতে লাগিল—অনেক পদ হইতে লাগিল—অনেক মস্তক হইতে লাগিল; —তাঁহার পূজা একটা প্রকাণ্ড ব্যাপার হইয়া উঠিল। তারাদেবীও নানারূপ ধারণ করিয়া বৌদ্ধদের পূজা গ্রহণ করিতে লাগিলেন। ইহার পর অনেক ডাকিনী, যোগিনী, পিশাচী, যক্ষিণী, ভৈরব, বুদ্ধগণের উপাস্য হইয়া দাঁড়াইল। এক 'অভিধানাত্তরতন্ত্রে' 'সম্বরবজ্র' 'পীঠপর্ব্ব' 'বজ্রসত্ত্ব' 'পীঠদেবতা' 'ভেরুক' 'যোগবীর' 'পীঠমালা' 'বজ্রবীর- 'ষড়্‌যোগসম্বর' 'অমৃতসঞ্জীবনী' 'যোগিনী' 'কুলডাক' 'যোগিনী যোগ-হৃদয়' 'বুদ্ধকাপালিকযোগ' 'মঞ্জুবজ্র' 'নবাঙ্করালীডাক' 'বজ্রডাক' 'চোমক' প্রভৃতি অনেক ভৈরব ও যোগিনীর পূজাপদ্ধতি আছে।

বোধিসত্ত্ব ও যোগিনীগণের ধ্যানকে সাধন বলে। যে পুস্তকে অনেক ধ্যান লেখা আছে তাহাকে সাধনমালা বলে। একখানি সাধনমালায় দুই শত ছাপ্পান্নটি সাধন আছে। 'বজ্রবারাহী', 'বজ্রযোগিনী', 'কুরুকুল্লা', 'মহাপ্রতিসরা', 'মহামায়ূরী', 'মহাসাহস্র প্রমর্দ্দিনী' প্রভৃতি অনেক যোগিনীর ধ্যান ইহাতে আছে। এই সকল সাধন লইয়া মূর্ত্তিনির্ম্মাণে বৌদ্ধকারিগরেরা এক সময়ে যথেষ্ট বাহাদুরী দেখাইয়া গিয়াছেন। কিন্তু যখন যোগিনী, ডাকিনী, ভৈরবীর পূজা লইয়া ও তাঁহাদের মূর্ত্তি লইয়া বৌদ্ধ-ধর্ম্ম চলিতে লাগিল, তখন আর অধঃপতনের বাকী কি রহিল ?

বৌদ্ধ-ধর্ম্মের মধ্যে 'গুহ্যপূজা' আরম্ভ হইল। লুকাইয়া লুকাইয়া পূজা করিব—কাহাকেও দেখিতে দিব না; এ পূজার অর্থ কি ? অর্থ এই যে, সে সকল দেবমূর্ত্তি লোকের সম্মুখে বাহির করা যায় না। ঐ সকল মূর্ত্তির নাম—উহারা বলিত শম্বর। একে ত অশ্লীল মূর্ত্তি—তাহাতে ভাল কারিগরের হাতের তৈয়ারী—তাহাতে অশ্লীলতার মাত্রা চড়িয়া গিয়াছে। সেই সকল মূর্ত্তি যখন বৌদ্ধদের প্রধান উপাস্য হইয়া দাঁড়াইল—তখন আর অধঃপাতের বাকী রহিল কি ? সে সকল উপাসনার প্রকার আরও অশ্লীল—সভ্যসমাজে বর্ণনা করা যায় না একজন ইউরোপীয় পণ্ডিত বলিয়াছেন, বৌদ্ধদের এই সকল পুঁথি 'ঘোমটা দেওয়া কামশাস্ত্র'। আমি বলি তিনি ইহা ঠিক বর্ণনা করিতে পারেন নাই। যেখানে কামশাস্ত্রের শেষ হয়, সেইখানে বৌদ্ধদিগের গুহ্যপূজা আরম্ভ। অধিক পুঁথির নাম করিব না। 'গুহ্যসমাজ' বা তথাগত গুহ্যক নামে বৌদ্ধদের একখানি পুঁথি আছে। এই পুস্তক সম্বন্ধে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলিয়াছেন,—

"But in working it out, theories are indulged in, and practices enjoined which are at once the most revolting and horrible that human depravity could think of, and compared to which the

words and specimens of Holiwell Street literature of the last Century would appear absolutely pure".

অর্থাৎ এই বড় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ইঁহারা যে সকল মত প্রকাশ করিয়াছেন এবং যে সকল ক্রিয়াকর্ম্মের উপদেশ দিয়াছেন, যত জঘন্য স্বভাবেরই মানুষ হউক না কেন, তাহা অপেক্ষা ভয়ানক ও ঘৃণিত মত বা ক্রিয়াকর্ম্মের কল্পনাও করিতে পারে না। ইহার সহিত তুলনা করিলে গত শতকে হোলিওয়েল ষ্ট্রীটে যে সকল পুঁথি-পাঁজি বাহির হইত তাহা অতি পবিত্র বলিয়া মনে হয়। বুদ্ধদেব প্রাণিহিংসার একান্ত বিরোধী ছিলেন, কিন্তু 'তথাগত গুহ্যকে' বলিতেছে—

"হস্তিমাংসং হয়মাংসং শ্বানমাংসং তথোত্তমম্।
ভক্ষয়েদাহারকৃত্যার্থন্ন চান্নন্তু বিভক্ষয়েৎ॥"
"অন্নং বা অথ বা পানং যৎকিঞ্চিৎ ভক্ষয়েৎ ব্রতী।
বিন্মূত্রমাংসযোগেন বিধিবৎ পরিকল্পয়েৎ॥"
"সময়চতুষ্টয়ং রক্ষ বুদ্ধজ্ঞানোদধিপ্রভোঃ।
বিন্মূত্রং তু সদা ভক্ষ্যমিদং গুহ্যং মহাদ্ভুতং॥"

এই ত গেল আহারের কথা। গুহ্যসিদ্ধি লাভ করিতে গেলে বিষ্ঠা, মূত্র নিশ্চয়ই খাওয়া চাই—নহিলে কিছুতেই সিদ্ধি লাভ হইবে না। অন্যকথা খুলিয়া বলিতে গেলে সভ্যতার সীমা অতিক্রম করা হয়,—হয় ত পিনাল কোডের ধারায়ও পড়িতে হয়। তবে একটা কিছু না বলিলে নয়—তাই একটি নমুনা দিতেছি—

"দ্বাদশাব্দিকাং কন্যাং চণ্ডালস্য মহাত্মনঃ।
সেবয়েৎ সাধকো নিত্যং বিজনেষু বিশেষতঃ॥"

মোটকথা এই যে,

"দুষ্করৈর্নিয়মৈস্তীব্রৈঃ সেব্যমানো ন সিদ্ধতি।
সর্ব্বকামোপভোগৈশ্চ সেবয়ংশ্চাশু সিদ্ধতি॥"

অর্থাৎ দুষ্কর কঠোর নিয়ম করিয়া সেবা করিলে কিছুতেই সিদ্ধি লাভ হয় না—সর্ব্বপ্রকার কামোপভোগ করিয়া যদি সেবা কর—তাহা হইলে নিশ্চয় শীঘ্র সিদ্ধি লাভ হইবে।

বুদ্ধদেবের শীলরক্ষা, উচ্চাসন ও মহাসন ত্যাগ, মালাগন্ধবিলেপনাদি ত্যাগ, নৃত্যগীতবাদিত্রাদি ত্যাগ, প্রভৃতি কঠোর নিয়ম কোন কাজেরই নয়, কেবল যথেচ্ছাচার কর—যথেচ্ছাচার কর—যথেচ্ছাচার কর। অধঃপাতের আর বাকা কি ?

'তথাগত গুহ্যকে'র ন্যায় আরও অনেক পুস্তক আছে। 'চণ্ডমহারোষণ তন্ত্র', 'চক্রসম্বর তন্ত্র', 'চতুষ্পীঠ তন্ত্র', 'উড্ডীষ তন্ত্র', 'সেকোদ্দেশ', 'পরমাদিবুদ্ধোদ্ধৃত কালচক্র', 'কালচক্রগর্ভতন্ত্র', 'সর্ব্ববুদ্ধসমাযোগ ডাকিনী-জাল-সম্বরতন্ত্র', 'হেবজ্রতন্ত্ররাজ', 'আর্য্যডাকিনীবজ্রপঞ্জর-মহাতন্ত্ররাজকল্প', 'মহামুদ্রাতিলক', 'জ্ঞানগর্ভ,' জ্ঞানতিলক নামে 'যোগিনীতন্ত্ররাগপরমমহাদ্ভুত', 'তত্ত্বপ্রদাপ', বজ্রডাক', 'ডাকার্ণব', 'মহাসম্বরোদয়', 'হেরুকাভ্যুদয়', 'যোগিনীসঞ্চার্য্য', 'সম্পুট-তন্ত্র', 'চতুর্যোগিনী সম্পুট', 'গুহ্যবজ্র', ইত্যাদি। আর কত নাম করিব—কত নাম করিয়া পাঠকদের ধৈর্য্যচ্যুতি করিব ? এ সকল তন্ত্র 'তথাগত গুহ্যক' হইতে একবিন্দুও ভাল নয়। যখন এইরূপ শত শত পুস্তক আছে—সে সকল পুস্তক পড়া হইত—সেইরূপ ক্রিয়াকর্ম্ম হইত—তখন আর অধঃপাতের বাকী কি ?

এ সকল গুহ্যতন্ত্র—মূলতন্ত্র—সঙ্গীতি আকারে লেখা। সঙ্গীতির গোড়াতে এইরূপ থাকে—

"এবং ময়া শ্রুতমেকস্মিন সময়ে ভগবান শ্রাবস্ত্যাং
জেতবনে বিহরতি স্ম, অথবা রাজগৃহে বেণুবন্যে, বিহরতি স্ম, অথবা
এইরূপ আর কোনও স্থানে বিহরতি স্ম"

অর্থাৎ আমি শুনিয়াছি একদিন ভগবান্ শ্রাবস্তী নগরে অথবা রাজগৃহে বেণুবনে অথবা আরও এইরূপ কোথাও বেড়াইতেছেন। এই সকল গুহ্য উপাসনার গ্রন্থগুলিও এই ভাবে লেখা, তবে শ্রাবস্ত্যাং

বিহরতি স্ম নাই—তাহার বদলে যাহা আছে তাহা কলমের মুখে আসে না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে—এই সকল গুহ্যবিদ্যার পুস্তকের আবার টীকা, টিপ্পনী, পঞ্জিকা, ব্যাখ্যা, বিবরণ, উহার প্রয়োগ পদ্ধতিপ্রকরণ আছে। মুল যদি বিশখানি থাকে—টীকা টিপ্পনাতে তাহা পাঁচশত হইয়া দাড়ায়। একজন ইউরোপীয় লেখক বলিয়া গিয়াছেন—ভারতবর্ষের অধঃপতনের কারণ খুঁজিতে গেলে এই সকল জঘন্য বই ঘাঁটিতে হইবে। ভবিষ্যতে কোন্ হতভাগ্য পণ্ডিতের অদৃষ্টে যে সে দুর্ভোগ আছে তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু সে দুর্ভোগ না ভুগিলেও এত বড় জাতিটা—এত বড় ধর্ম্মটা—কেন যে অধঃপাতে গেল, তাহা ত বুঝা যায় না। তাই কাহাকেও না কাহাকে একদিন সে দুর্ভোগ ভুগিতেই হইবে। কিন্তু যে ভুগিবে সে সত্য সত্যই ভারতের একটা মহা উপকার সাধন করিয়া যাইবে। সে অন্ততঃ বলিবে—"বাপু! এ পথে আর আসিও না—এ পথে আসিলে অধঃপতন অবধারিত।"

বুদ্ধদেব দেবতা মানিতেন না। মানুষ আপনা হইতেই চরিত্রশুদ্ধি করিয়া ক্রমে লোকে যাহাদের দেবতা বলে তাহাদের অপেক্ষাও উচ্চ যে পরমপদ—যে পদে গেলে জন্ম জরা মরণের আর ভয় থাকিবে না—যে পদে গেলে সংসারের কোন চিন্তা থাকে না—যে পদে গেলে মহাশান্তি লাভ করা যায়—সেই পদে উঠিতে পারিবে। তাঁহার শিষ্যেরা শেষ ডাক, ডাকিনী, যোগিনী, প্রেত, প্রেতিনা, পিশাচ, পিশাচিনী, কটপূতনা, কঙ্কালিনী, ভৈরব, ভৈরবী প্রভৃতির উপাসনা করিয়া আপনারাও অধঃপাতে গেল—সঙ্গে সঙ্গে দেশটাসুদ্ধ অধঃপাতে দিল।

বৌদ্ধধর্ম্মে অনেকদিন হইতেই ঘুণ ধরিয়াছিল। বুদ্ধদেব নিজে যেদিন স্ত্রীলোকদিগকে দীক্ষা দিয়া ভিক্ষুণী করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন—সেইদিন হইতেই তাঁহাকে সংঘের বিশুদ্ধি রক্ষার জন্য অনেক কঠোর নিয়ম করিতে হইয়াছিল। তিনি ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী

দের এক বিহারে থাকিতে দিতেন না। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পাঁচ ছয় শত বৎসর পর হইতে ভিক্ষুরা ক্রমে বিবাহ করিতে লাগিল—ক্রমে একদল গৃহস্থ ভিক্ষু হইল। এইখান হইতেই ঘুণ ধরা আরম্ভ হইল। সমাজে আসল ভিক্ষুদের খাতির অধিক ছিল। গৃহস্থ ভিক্ষুদের আদর তত ছিল না। কিন্তু গৃহস্থ ভিক্ষুদের নাম ছিল 'আৰ্য্য'। আসল ভিক্ষুরা আর্য্যদের নমস্কার করিতেন না, কিন্তু আৰ্য্যরা অনার্য্য হইলেও আসল ভিক্ষুদের নমস্কার করিতেন। এই গৃহস্থাশ্রমের ভিক্ষুরাই ক্রমে দলে পুরু হইতে লাগিল। কারণ তাহাদের সন্তান-সন্ততি হইত—তাহারা আপনাআপনি ভিক্ষু হইয়া যাইত। এক-জন গৃহস্থ গৃহস্থাশ্রম ছাড়িয়া যদি ভিক্ষু হইতে যাইত—তাহাকে প্রথম 'ত্রিশরণ' গ্রহণ করিতে হইত—তাহার পর 'পুণ্যানুমোদনা' শিখিতে হইত, 'পাপদেশনা' শিখিতে হইত, 'পঞ্চশীল' গ্রহণ করিতে হইত, 'অষ্টশীল' গ্রহণ করিতে হইত, দশশীল গ্রহণ করিতে হইত, 'পোষধব্রত' ধারণ করিতে হইত—আরও কত কি করিতে হইত—অনেক সময় যাইত। কিন্তু গৃহস্থ ভিক্ষুর ছেলে—সে একেবারেই ভিক্ষু হইত। যে সকল জিনিষ অন্যকে বহুকালে শিখিতে হইত, সে সেসকল বাড়ীতেই শিখিত—তবে আমাদের যেমন এখন পৈতা হয়—একটা সংস্কার মাত্র—উহাদেরও ঐ রকম 'ত্রিশরণ গমন', 'পঞ্চশীল গ্রহণ', এক একটা, সংস্কারের মত হইয়া যাইত। আমাদের দেশে যেমন "জাত বৈষ্ণব" বলিয়া একটা জাতি হইয়াছে—সেকালেও তেমনি 'জাত ভিক্ষু' বলিয়া একটি জাতির মত হইয়াছিল। উহাদের যত দলপুষ্টি হইতে লাগিল, আসল ভিক্ষুদের অবস্থা তত হীন হইতে লাগিল। গৃহস্থ ভিক্ষুরা কারিগরি করিয়া জীবন নির্ব্বাহ করিত—ভিক্ষাও করিত—কেহ বা রাজমজুর হইত, কেহ বা রাজমিস্ত্রী হইত, কেহ বা চিত্রকর হইত, কেহ বা ভাস্কর হইত, কেহ বা স্যাকরা হইত, কেহ বা ছুতার হইত—অথচ ভিক্ষাও করিত, ধর্ম্মও করিত, পূজা পাঠও করিত। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের

পৌরোহিত্যটা ক্রমে নামিয়া আসিয়া কারিগরদের হাতে পড়িল। যে কাজে পরিশ্রম কম—ঘরে বসিয়া করা যায় একটু হাত পাকিলে কাজও ভাল হয়—দু'পয়সা আসেও বেশী, গৃহস্থ ভিক্ষু সেই সকল কাজ করিত। সুতরাং তাহাদের ধর্ম্ম করিবার সময়ও থাকিত—বড় বড় উৎসবে দু'চার পয়সা খরচও করিতে পারিত। কিন্তু বেশী লেখাপড়া শেখা, ধ্যানধারণা করা, ভাবনাচিন্তা করার সময়ও থাকিত না—প্রবৃত্তিও থাকিত না। তাহা হইলেই মোট দাঁড়াইল এই যে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের পৌরোহিত্যটা মূর্খ কারিগরদের হাতে পড়িয়া গেল। আসল ভিক্ষুরা বিহারে থাকিতেন। বিহারের জমিজমার আয় হইতে কোনরূপে দিন গুজরাণ করিতেন। ক্রমে রাজারা প্রায় বিধর্ম্মী হইয়া উঠিল। বৌদ্ধ পণ্ডিত হইলে যে রাজসম্মান পাইবেন তাহার উপায় রহিল না। রাজারাও ছোট ছোট রাজা—আপনাদের পণ্ডিত পোষণ করিয়া আবার যে বিধর্ম্মী বৌদ্ধ পণ্ডিত প্রতিপালন করিবেন, তাঁহাদের সে সাধ্য ছিল না—থাকিলেও তাঁহাদের পণ্ডিতেরা তাহা করিতে দিত না। সুতরাং আসল ভিক্ষুদের এবং তাহাদের বিহারের অবস্থা ক্রমে শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইল। এমন সময়ে আফ্‌গানিস্তানের উপত্যকা হইতে পাঠানেরা মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া এবং মুসলমান ধর্ম্ম প্রচারের জন্য কোমর বাঁধিয়া অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদের কাফের বলিয়া তাহাদের উচ্ছেদ সাধনের জন্য বঙ্গদেশে আসিয়া পড়িলেন। যাঁহারা আসিয়াছিলেন তাঁহাদের বংশধরেরা এখনও আসিতেছেন। ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ইহাদের অপেক্ষা যে বেশী জ্ঞানী ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। তখন বাঙ্গলায় ত সেনবংশ রাজা—কিছু বড় রাজা মাত্র। আশে পাশে চারিদিকে অনেক ছোট ছোট রাজা ছিলেন। তাঁহাদের কেহ কেহ বৌদ্ধও ছিলেন। বল্লালের সময় ব্রাহ্মণদের একটা আদমসুমারি লওয়া হয়। সে সময়ে রাঢ়ী ও বারেন্দ্রে আট শত ঘর ব্রাহ্মণ ছিল। আট শত ঘর ব্রাহ্মণে যতটুকু হিন্দু করিয়া লইতে পারে, দেশের ততটুকু

হিন্দু ছিল—অবশিষ্ট সবই বৌদ্ধ। বৌদ্ধেরা পুতুল পূজা খুব করিত। সুতরাং মুসলমান আক্রমণের রোকটা বৌদ্ধদের উপরই পড়িয়া গেল। তাঁহারা বৌদ্ধদের বিহারগুলি সব ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। এক ওদন্ত-পুরী বিহারেই দুই হাজার আসল ভিক্ষু বধ হইল। বিহারটি ভাঙ্গিয়া ফেলা হইল; পাথরের মূর্ত্তিগুলি ভাঙ্গিয়া চূরিয়া ফেলা হইল; সোণা রূপা তামা পিতল কাঁসার মূর্ত্তিগুলি গালাইয়া ফেলা হইল; পুঁথি-গুলি পোড়াইয়া দেওয়া হইল। বিক্রমশীল বিহারেরও এই দশাই হইয়াছিল। নালন্দা জগদ্দল প্রভৃতি বড় বড় বিহারের এই দশা হইল। ওদন্তপুরী বিহারের ঢিবি খুঁজিয়া পাওয়া গিয়াছে—নালন্দা বিহারে-রও ঢিবি খুঁজিয়া পাওয়া গিয়াছে। বিক্রমশীল ও জগদ্দলের এখনও কোন খোঁজ হয় নাই। আসল ভিক্ষু এই সময় হইতেই একরূপ লোপ হইয়াছে। যাহারা পলাইয়াছিল তাহারা নেপাল, তিব্বত, মঙ্গো-লিয়ায় চলিয়া গিয়াছিল, কতক বর্ম্মায় ও সিংহলে গিয়াছিল। সুতরাং বাঙ্গলায় বৌদ্ধদের বিদ্যাবুদ্ধি, পুঁথি-পাঁজির এই পর্য্যন্ত শেষ।

এক একবার মনে হয় তিন চারি শত বৎসর ধরিয়া বৌদ্ধেরা ইন্দ্রিয়াসক্ত, কুকর্ম্মান্বিত ও ভূতপ্রেতের উপাসক হইয়া যে নিজেও অধঃপাতে গিয়াছিল এবং দেশটাকে সুদ্ধ অধঃপাতে দিয়াছিল, মুসল-মানদের আক্রমণ তাহারই প্রায়শ্চিত্ত। বিধাতা যেন তাহাদের পাপের ভরা সহ্য করিতে না পারিয়া তাহাদিগকে সমূলে উচ্ছেদ করিবার জন্য মুসলমানদের এদেশে পাঠাইয়াছিলেন। তাহাদের সেই ঘৃণিত উপাসনা, বিষ্ঠামূত্র ভক্ষণ করিয়া সিদ্ধিলাভের চেষ্টা, ভূতপ্রেত পূজা করিয়া বুজরুক হইবার চেষ্টা এবং উৎকট ইন্দ্রিয়াসক্তিকেই ধর্ম্ম বলিয়া মনে করা ও তাহাই শিখান—এই সকলের পরিণামে তাহা-দিগকে বঙ্গদেশ চিরকালের জন্য ছাড়িতে হইল। দেশে রহিল—কারিগর পুরোহিত ও তাহাদেরই যজমান। লেখাপড়া বুদ্ধিবিদ্যার নামগন্ধ পর্য্যন্ত বৌদ্ধদের মধ্যে লোপ পাইল। ইহার পর কি হইল পরে বলা যাইবে। শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

শর্ম্মার ঝুলি।

[১]

ঝুলির ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত।

শর্ম্মার প্রকৃত নাম সাতকড়ি সরকার; লোকে ডাকিত সাতু-রাম শর্ম্মা। সাতুরাম নদীয়া জেলায় মোক্তারি করিত। একদা তথাকার একটি বাঙ্গালী বিচারপতির সহিত তাঁহার ঝগড়া হয়, এবং তাহারই ফলে তিনি উক্ত কার্য্য হইতে খারিজ হন। সাতু-রামের অন্য কোনও আয় ছিল না। মোক্তারি করিয়া খরচ বাদে তাহার মাসিক আট দশ টাকা বাঁচিত এবং তদ্দ্বারা কোনও মতে তাহার পরিবার প্রতিপালিত হইত। এক্ষণে সেই কার্য্যের বহালীশোনদ বাজেয়াপ্ত হওয়ায় দারিদ্র্য আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করিল এবং বহুদিন উভয়ের মধ্যে মল্লযুদ্ধ চলিতে লাগিল। অবশেষে ঠাকুরজা পরাস্ত হইয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক দারিদ্র্যের এলাকায়ভুক্ত হইলেন—গোল মিটিয়া গেল।

সাতুরাম মোক্তারি হইতে বরতরফ হইয়া, অন্যান্য অনেক কার্য্যের উমেদার হইয়াছিলেন এবং কোন কোন কার্য্যে বহালও হইয়াছিলেন। কিন্তু কোথাও তিষ্ঠিতে পারেন নাই। কোনও স্থানে পাঁচ দিন, কোনও স্থানে দশ দিন, কোথাও বা একমাস—ঐ পর্য্যন্ত। ইহার কারণ এই যে, লোকটা কিছু তেজস্বী ও উচিতবক্তা ছিল—ধামা ধরিতে পারিত না। এই দোষে তাহার কপালে যত দুঃখ। এই শ্রেণীর দুরবস্থাপন্ন লোককে এখনকার সভ্য মহোদয়েরা 'মাথা পাগ্‌লা' বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকেন।

বিক্রমপুর পরগণায়, বিশালোরসী পদ্মার সন্নিকটে কৃষ্ণ-পুর গ্রামে সাতুরামের বাড়ী। সাতুরামের পরিবারে বেশী লোক

ছিল না—তাহার ব্রাহ্মণী, বিধবা পুত্রবধূ, আর একটি অনূঢ়া কন্যা মাত্র।

সাতুরাম ভিক্ষা করিয়া যে তণ্ডুলাদি সংগ্রহ করিতে পারিত, তাহাতে প্রায়ই সকলের কুলাইয়া উঠিত না। সুতরাং ব্রাহ্মণীকে প্রায়ই উপবাস থাকিতে হইত; কেন না তিনি গৃহিণী, স্বামী ও সন্তানকে আহার না করাইয়া কেমন করিয়া আহার করেন? বিশেষতঃ বিধবা পুত্রবধূটি একরূপ বালিকা এবং তাহার এক বেলা আহার। আরও মেয়েটির প্রাতর্ভোজনের জন্যও কিছু অন্ন হাঁড়ীতে জমা থাকা চাই। সুতরাং সকলকে যথাসম্ভব প্রবোধ দিয়া, তিনি দিনের দিন অনাহারে পীড়িতা হইতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে একদিন ঠাকুর বলিলেন—

"সে কি কথা, উপবাস করিতে হয়, দুইজনেই করিব। তুমি একা করবে কেন? তোমার যেরূপ অবস্থা দেখিতেছি, তাহাতে আর তুমি অধিক দিন জীবিতা থাকিবে বলিয়া আমার বোধ হয় না। রন্ধন করিয়া সকলকেই সমান ভাগে দিও। কেবল মেয়েটির সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনা করিও। চারিজনের এক গ্রাস করিয়া কম পড়িলে বড় বেশী আসে যায় না। কিন্তু একজনের চারি গ্রাস কম হইলে তাহার কষ্ট হয়। আমার মাথা খাও, আমার এই উপরোধ উপেক্ষা করিও না।"

ব্রাহ্মণী ঈষদ্‌হাস্যে বলিলেন,—"তোমাদের কাছে অন্ন দিয়া উপবাসেও আমার কোনও কষ্ট হয় না। অন্য কোনও ব্যারামের দরুণ বোধ হয় আমার শরীর শুকাইয়া যাইতেছে। তা একটা মানুষ ত আর চিরদিন বাঁচিয়া থাকিবে না? এক্ষণে তোমাদের কাছে আমার মৃত্যু হইলেই ভাল হয়—শরীর জুড়ায়। তোমাদের কষ্ট আর দেখিতে ইচ্ছা করে না।"

ঠাকুর তখন দুঃখব্যঞ্জক স্বরে বলিল,—"শোন ব্রাহ্মণি, বিধিলিপি কখনও খণ্ডন হয় না। তাঁহার বিধানোচিত অবস্থায় সন্তুষ্ট

থাকাই মানুষের কর্ত্তব্য। মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা মহাপাপের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট। সেজন্য মানুষকে মৃত্যুর জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিতে হইবে।”

ব্রাহ্মণী বলিলেন,—“পাপ পুণ্য বুঝি না প্রভো! যেদিন শ্রীমান আমার চলিয়া গিয়াছে, সেইদিন হইতেই আমার মৃত্যুর ইচ্ছা বলবতী। কেবল তোমাদের মায়া এড়াইতে পারিতেছি না। তাই এতদিন বাঁচিয়া আছি, নচেৎ এতদিনে আত্মঘাতিনী হইতাম।”

ব্রাহ্মণ। ছিঃ। ওরূপ কথা মুখে আনিও না ব্রাহ্মণি; ইহকাল ত এইরূপ ভাবেই গেল। পরকালের জন্যও কি একবার চিন্তা কর না?

ব্রাহ্মণী। আমার চিন্তা করা না করার কোন ত অধিকার নাই। সেই চিন্তামণিই এই চিন্তা আমার মনে যোগাইতেছেন।

সাতুরাম বুঝিলেন, মতান্তরে ব্রাহ্মণীর কথা সত্য। সুতরাং তিনি আর কোন বাক্যব্যয় করিলেন না।

কিছুদিন পরেই ব্রাহ্মণীর সেই চিন্তার চিরাবসান হইল—তিনি এই জ্বালাময় সংসার পরিত্যাগ করিয়া চিতা-শয্যায় শয়ন করিলেন। বিধবা পুত্রবধূটিও তদনতিবিলম্বে শ্বশ্রূমাতার ক্রোড়ে যাইয়া শরীর জুড়াইল। রহিবার মধ্যে রহিল, সাতুরামের এক কন্যা। তৎপক্ষেও অতি শীঘ্র তিনি প্রতিবিধান করিলেন—কন্যাটি পাত্রস্থা করিলেন। সচরাচর যেরূপ বিবাহ হইয়া থাকে, সাতুরাম সেরূপ ভাবে কন্যার বিবাহ দিলেন না—পাঁচটি হরিতকী দ্বারা সাত্বিক ভাবে কন্যা সম্প্রদান করিলেন। এইরূপ শাস্ত্রসঙ্গত অভিনব ভাবের উদ্বাহক্রিয়া বর্ত্তমানযুগে এদেশে এই প্রথম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এইজন্য সাতুরামের পাগ্‌লামীর উপর কোনও কোনও গ্রাম্য সামাজিক ব্যক্তি মন্তব্যের মাত্রা চড়াইয়া দিলেন। কিন্তু ঠাকুর তাহা বড় একটা গ্রাহ্য করিলেন না। ঐ এক রকমের লোক, যাহা মনে আসে তাহা করে, যাহা মুখে আসে তাহা বলে।

যাহা হউক, সাতুরামের এক্ষণে সংসারে অনেকটা অবসর হইয়াছে, কেননা ব্রাহ্মণ এখন একা।

এই সময়ে তাঁহার যেরূপ অবস্থা, তদ্রূপ যদি অন্যের ঘটিত, তবে সে শোকে দুঃখে অনাহারে নিতান্তই অভিভূত হইয়া পড়িত সন্দেহ নাই। কিন্তু সাতুরামকে কেহ কখনও শোকদুঃখ-প্রপীড়িত বলিয়া বুঝিতে পারে নাই। বরং তাঁহার চিত্তপ্রসন্নতা যেন পূর্ব্বাপেক্ষা বর্দ্ধিত হইয়াছে, মনোযোগপূর্ব্বক নিরীক্ষণ করিলে তাহাই উপলব্ধি হইত। এইরূপ ভাব সংসারের চক্ষে পাগ্‌লামীর একটা প্রধান উপসর্গ। এখন থেকে ঠাকুরকে লোকে "পাগ্‌লা সাতুরাম" বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিল।

কৃষ্ণপুরে আমার কোনও আত্মীয়ের বাড়া। তথায় যাতায়াতো-পলক্ষে ঠাকুরের সহিত আমার আলাপ। গ্রাম্য সুবাদে আমি তাঁহাকে ঠাকুরদাদা বলিয়া ডাকিতাম, তিনিও আমাকে স্নেহ করিতেন ঠাকুরজীর সহিত সময়ে সময়ে আমার নানা বিষয়ে বিতর্ক হইত। এই বিশাল হিন্দুসমাজের উপর তাহার বিজাতীয় ক্রোধ ছিল—তিনি অনেক সময়ে স্বদেশের নিন্দাচর্চ্চা করিতেন।

সাতুরামের বড় একটা ভিক্ষার ঝুলি ছিল। একদা আমি কৌতূহল-পরবশ হইয়া উহা পরীক্ষার্থ প্রস্তুত হইলাম। কেননা ঝুলিটা একেবারে পূর্ণ বোঝাই করা ছিল।

যখন আমি ঝুলির নিকটবর্ত্তী হইলাম, তখন আমার অভিপ্রায় বুঝিয়া ঠাকুর বলিলেন, "এখন ধরিও না। উহা আমি তোমাকেই দিয়া যাইব।"

আমি তখন ঈষদ্‌হাস্যে বলিলাম—"আপনি উহা ব্যবহার জন্য আমাকে অনুমতি করিবেন না ত?" সাতুরাম তখন উচ্চ হাস্য-পূর্ব্বক বলিলেন—"তুমি ধনে জনে সুসম্পন্ন হও। আমি অন্যরূপ উদ্দেশ্য সাধনার্থ ঝুলি তোমাকেই দিয়া যাইব।"

আমি 'যে আজ্ঞে' বলিয়া তখন তাহার নিকট বিদায় হইলাম

এবং আত্মীয়ের বাড়ী আসিয়া অপরিহার্য্য কারণ বশতঃ স্থানান্তরে যাত্রা করিলাম।

কিছু দিবস পরে আবার আমাকে কৃষ্ণপুর যাইতে হইল। তথায় যাইয়া শুনিলাম, সাতুঠাকুর মুমূর্ষু। আমি অবিলম্বে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলাম। তিনি আমাকে দেখিয়া সেই মৃত্যু সময়েও প্রসন্ন ভাব প্রকাশিত করিলেন, এবং ইঙ্গিত করিয়া সেই ঝুলিটি আমাকে দেখাইয়া দিলেন—বাক্যব্যয় করিতে পারিলেন না। কিছু ক্ষণ পরেই মৃত্যু তাঁহাকে অধিকার করিল। অমনি পাঁচ সাত জনে তাঁহাকে ভাবোচিত বন্ধনপূর্ব্বক হরিধ্বনি করিতে করিতে শ্মশান ক্ষেত্রে লইয়া চলিল। কেহ কেহ এই ঝুলিটি ঠাকুরের সঙ্গে দিবে বলিয়া উহা লইতে আসিল—টানাটানি করিল। আমি অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া তাহা রক্ষা করিলাম। তজ্জন্য অনেকে আমাকে কটুবাক্য বলিল, কুৎসিত ভাষায় গালাগালি দিল। কিন্তু কি করি, কর্ত্তব্য ও কৌতূহলের অনুরোধে তাহা নীরবে সহ্য করিলাম; এবং সুযোগ বুঝিয়া, ঝুলিটি লইয়া সরিয়া পড়িলাম। আমি শবানুগমন করিলাম না; অবশ্য তাহার একটা শাস্ত্রসঙ্গত কারণ ছিল।

রাত্রিযোগে যখন সকলে নিদ্রিত হইল, তখন আমি ঝুলিটি লইয়া বসিয়া গেলাম। দিবাভাগে উহা খুলিলে নানারূপ জটলা হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। সচরাচর আমরা ভিখারীদের যেরূপ ঝুলি দেখিতে পাই, এটি সেরূপ নহে। একখানি অত্যুৎকৃষ্ট কাঁথাদ্বারা বিশেষ নিপুণতার সহিত ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। ঝুলির অভ্যন্তর ভাগ পাঁচ অংশে বিভক্ত। অভ্যন্তরস্থ সামগ্রী সহজে পড়িয়া যাইতে না পারে, এজন্য প্রত্যেক অংশেই কাপড়ের কবাট ছিল, এবং তাহাতে বোতাম আঁটিয়া অর্গলের উদ্দেশ্য সাধিত হইত।

আমি ঝুলির এক অংশ মুক্ত করিয়া পাইলাম বহুজীর্ণ ক্ষুদ্রাকারের একখানি ভগবদ্গীতা আর একখানি নিত্যকর্ম্ম পদ্ধতির অর্দ্ধাংশ। তাহা যত্নপূর্ব্বক রাখিয়া দিয়া ঝুলির অন্য ভাগ মুক্ত

করিলাম। তদভ্যন্তরে পাওয়া গেল একটি নস্যাধার। নস্যাধারটি শিল্প-প্রদর্শনীতে উপস্থিত করিবার উপযুক্ত, কারণ তাহাতে বহুতর কারুকার্য্য বিদ্যমান। বাঁশের একটুকু অংশ। তাহার দুই প্রান্ত সূক্ষ্ম বেত্রে চেলা মোড়াই করা। মধ্যভাগে নানারূপ লতা-রেখা খোদিত। একটি রন্ধ্রপথে নস্য বাহির হয়। এই নস্যাধারটি আমি স্বীয় পকেটে রাখিয়া দিলাম। ঝুলির আর এক অংশ খুলিয়া পাইলাম কতকগুলি বিল্বপত্র—পত্রগুলি অসংখ্য দুর্গানাম বক্ষে করিয়া শুকাইয়া আছে। উহা আগামী কল্য জলে ফেলিয়া দিবার জন্য সযত্নে স্থানান্তরে রাখিলাম। অতঃপর আমি ঝুলির চতুর্থ ভাগ মুক্ত করিলাম। কিন্তু তন্মধ্যে বেশী কিছুই মিলিল না—বহু অনুসন্ধানে দুই একটি তণ্ডুলকণা পাওয়া গেল। বোধ হয় ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুলাদি রাখিবার জন্য ঝুলির এই ভাগ নির্দ্দিষ্ট ছিল। এই ভাগের আয়তনও কিছু বেশী। তদনন্তর ঝুলির অবশিষ্ট ভাগ মুক্ত করিয়া, হস্ত দ্বারা জানিলাম শুধুই গাছের পাতা। এজন্য ঠাকুর যে কত বৃক্ষ নিষ্পত্র করিয়াছেন, তাহা বলা যায় না। কিন্তু পত্রগুলি এলোমেলো নহে—তাম্বূলাকারে বিন্যস্ত হইয়া, ঝুলির অর্দ্ধাংশ অধিকার পূর্ব্বক অবস্থিতি করিতেছে। মনে করিলাম, বুঝি এই ভাগ দুর্গানামের মূল দপ্তরখানা। পত্রগুলি বাহির করিয়া নিরীক্ষণে জানিলাম, দুর্গানাম নহে। তবে কি? তখন ধীরভাবে পরীক্ষা দ্বারা বুঝিতে পারিলাম—নানাবিষয়িনী রচনা। সাতুরাম এ সংসারে কিছুই বাকী রাখে নাই, সমস্তই লিখিয়া ফেলিয়াছে।—সামাজিক, ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক, পৌরাণিকাদি প্রবন্ধ, উপন্যাস নবন্যাস, কথা উপকথা, গল্প উপগল্প শাখাগল্প, চুট্‌কি ও বৈঠকী সমালোচনা, যাত্রা নাটক ইত্যাদি, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

প্রত্যেক রচনা যে কয়েকটি পত্রে শেষ হইয়াছে, সে কয়েকটি পত্র একত্র গ্রথিত হইয়াছে এবং তাহাতে পৃষ্ঠার পত্রাঙ্ক নির্দ্দিষ্ট আছে। সাতুরাম অসামাজিক নহেন। কেননা, প্রবন্ধাদিতে

তিনি বৃক্ষপর্ণের দুই পৃষ্ঠা ব্যবহার করেন নাই। বনজাত নানা রূপ বৃক্ষপত্র তিনি স্বীয় রচনায় ব্যবহার করিয়াছেন। কালি—তাহাও বনলতার ফল-নির্য্যাস—লাল, নীল, কাল, তিন চারি রকমের। লেখা ক্ষুদ্র, স্থানে স্থানে পাঠ-কৃচ্ছ্রতা দোষ আছে; এবং ভ্রম প্রমাদাদি যথেষ্টই আছে। বিশ্রাম-যতি কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। বর্ণাশুদ্ধি—তাহাও অপ্রচুর নহে। এই সকল দোষ লেখক মাত্রেরই আছে, তবে কাহারও কম, কাহারও বেশী। সাতুরামের অনেক বেশী। তথাপি তাহা ক্ষমার যোগ্য। কেননা, সাতুরাম অন্নচিন্তাগ্রস্ত লেখক—বিশেষতঃ এই কার্য্যে তিনি অভিধানাদি কোনও পুস্তকেরই সাহায্য প্রাপ্ত হন নাই। মনে যাহা উদয় হইয়াছে, বৃক্ষপর্ণে তাহা লিখিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু ভাষা প্রাঞ্জল, তেজস্বিনা এবং মনোমুগ্ধকারিণী আমরা যতদূর পারি সংশোধন করিয়া, সাতুরামের ঐ ঝুলির বৃক্ষপর্ণপৃষ্ঠস্থ প্রবন্ধগুলি পাঠকবর্গকে উপহার প্রদান করিব।

গুরুদেবের আজ্ঞা।

[ঝুলির এই প্রবন্ধটি বিল্বপত্রে লিখিত। প্রথম প্রবন্ধ বলিয়া কিঞ্চিৎ কষ্টস্বীকার করিয়াও বোধ হয় ঠাকুর ইহা পবিত্র দেবভোগ্য বিল্বপত্রে লিখিয়া থাকিবেন। ত্রিপল্লব নিবন্ধন প্রতি সংখ্যাকে তিন পৃষ্ঠা করিয়া, এরূপ চতুঃষষ্টি সংখ্যক পত্রে প্রবন্ধ শেষ করতঃ, বৃন্ত-সমষ্টি বন্ধন করিয়া রাখিয়াছেন। লেখা বড় ক্ষুদ্র। তবে সুবিধা এই যে লালকালি। পাঠ-কৃচ্ছ্রতা না আছে এমন নহে। আবার বুঝা যায় না, এমনও আছে।]

চৈত্রমাস শুক্লা-সপ্তমীর নিশি। রাত্রি এক প্রহর অতীত হইয়াছে। আমরা সকলেই শয়ন করিয়াছি। আমাদের কাহারও আজ আহার হয় নাই। একজন লোকের একটি ভোজ্য—তণ্ডুলাদি আহার্য্য সামগ্রী—লইয়া সকালে আসিবার কথা ছিল। তাই আজ ভিক্ষায় বাহির হই নাই। তাহার আসাপথে চাহিয়া চাহিয়া, বেলা যখন

আড়াই প্রহর উত্তীর্ণ হইল, তখন ব্রাহ্মণীকে বলিলাম—"কাজ ভাল করি নাই। আজও বোধ হয় আমাদের কপালে উপবাস লেখা আছে।" তখনও যদি বাহির হই, তবে অন্ততঃ মেয়েটির অন্নের উপযোগী তণ্ডুল সংগ্রহ করিতে পারি। কিন্তু তাহা হইলাম না। পূর্ব্বকথিত ব্যক্তির আসার আশায় মুহুর্মুহুঃ পথ পানে চাহিতে লাগিলাম। সন্ধ্যা হইল, তথাপি সে আসিল না। কাজে কাজেই যেই কথা সেই কাজ—একেবারে উপবাস। পর্য্যুষিত অন্ন হাঁড়ীতে যাহা কিঞ্চিৎ ছিল, তাহা কন্যাটিকে পূর্ব্বাহ্নেই দেওয়া হইয়াছে। শ্রীমতীর জন্য প্রায় প্রত্যহই এইরূপ কিছু অন্ন ব্রাহ্মণী সযত্নে সঞ্চয় করিয়া রাখেন।

কিন্তু সে বালিকা—এই মাত্র-আট বৎসর বয়স। সুতরাং অনাহারে বড়ই অধীর হইয়া পড়িয়াছিল। শ্রীমতী আমারই কাছে শুইয়াছিল -বরাবর এইরূপ শোয়। ব্রাহ্মণী পৃথক শয্যায়, বধূমাতাকে লইয়া শয়ন করিয়াছিলেন। বধূমাতা বৈধব্য-ব্রতে অনশনে অভ্যস্তা। সুতরাং তাহার পক্ষে বেশী চিন্তার কারণ নাই। কিন্তু শ্রীমতীর অবস্থা দেখিয়াই চিত্ত বড় চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাহার অনশনক্লিষ্ট মুখখানির দিকে চাহিয়া হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু কি করি, তখন নিরুপায়। আজ অন্নদাত্রী অপরাজিতার প্রথম পূজা, কিন্তু আমার ঘরের কেহই আজ অন্ন পাইল না। আমি ব্যাকুলিত চিত্তে দয়াময়ীর করুণা-কার্পণ্যের বিষয় চিন্তা করিতেছিলাম। মহিষমর্দ্দিনী দশভুজার আরতি-নিনাদ সময়ে সময়ে শ্রুতিগোচর হইতেছিল। কৃষ্ণপুরের কেহই বাসন্তী পূজা করে না—পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে করে।

রাত্রি তখন দুই প্রহর। কন্যাটি একরূপ আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। ব্রাহ্মণী অমনি প্রদীপ জ্বালিয়া কন্যার কাছে আসিলেন। আমরা তখন দেখিলাম, শ্রীমতীর মুখখানি একেবারে বিকৃত হইয়া উঠিয়াছে, যেন মুমূর্ষাবস্থা। দেখিয়া ভয় হইল, ব্রাহ্মণী কাঁদিয়া উঠিলেন। তখন আমি কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া ক্ষণকাল চিন্তা করিলাম। তৎপর

ব্রাহ্মণীকে বলিলাম,—“কাঁদিও না, তুমি ইহার কাছে বস, আমি একবার আসি।”

ব্রাহ্মণী বলিলেন—“এত রাত্রে তুমি আবার কোথা যাবে?”

“ভয় নাই, আমি এক্ষণই আসিতেছি”—এই বলিয়া আমি বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম। তখন আমার মনে যে কি ভাব, তাহা আমি বর্ণনা করিতে পারিতেছি না। যদি কেহ ভুক্তভোগী থাকেন, তিনিই একমাত্র উপলব্ধি করিতে পারিবেন—অন্যে পারিবে না।

কৃষ্ণপুরে হরিদাস ঘোষাল নামে একব্যক্তি বাস করিতেন। ঘোষাল মহাশয় সে-কালের লোক—প্রাচীন, কিন্তু বলিষ্ঠ ও কার্যক্ষম। পৌরোহিত্যই তাঁহার জীবনোপায় ছিল। হরিদাস নিঃসন্তান। পরিবারে অন্য কোনও লোক নাই—তিনি আর তাঁহার ব্রাহ্মণী। ব্রাহ্মণীর নাম বিদ্যা—লোকে ডাকিত ‘বিদ্যা ঠাক্‌রুণ’। এক-গ্রামের মেয়ে বলিয়া লোকে তাহার নাম ধরিয়া ডাকিত। আমার ৺মাতা ঠাকুরাণী এই বিদ্যা ঠাকুরাণীকে ভগ্নী বলিয়া সম্বোধন করিতেন। দুইজনের মধ্যে বেশ সদ্ভাব ছিল। আমিও মাসী-মা বলিয়া তাঁহাকে বিশেষ ভক্তিশ্রদ্ধা করিয়া থাকি, এবং তিনিও আমাকে বিশেষ স্নেহ করিয়া থাকেন। আজ, এই রাত্রে আর কোথায় যাইব? একেবারে ঘোষাল বাড়ী যাইয়া উপস্থিত হইলাম। ঘোষাল মহাশয় আহারান্তে শয়ন করিয়াছেন। বিদ্যা ঠাক্‌রুণ শয়নের প্রাক্কালিক ক্রিয়া সম্পাদনে ব্যস্ত আছেন। আমার পদশব্দ পাইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—“কে গা?”

আমি বলিলাম—“আমি”।

“আমি, কে? সাতকড়ী নাকি, দেখি দেখি”—এই বলিয়া তিনি প্রদীপ হস্তে আমার নিকট আসিয়া আগে আমাকে নিরীক্ষণ করিলেন; তৎপর বলিলেন—“তাই ত বটে; তা এত রাত্রে এসেছিস্ কেন বাবা? বড় কাতর যে, তোদের বুঝি আজ খাওয়া হয় নাই রে।

তোর আকার প্রকার দেখিয়া আমার তাই বোধ হয়। আমার মাথার দিব্বি, মিথ্যা বলিস্ না।"

আমি কোনও বাক্যব্যয় করিলাম না—অধোবদনে দরজার সোপানে বসিয়া পড়িলাম।

বিদ্যা ঠাক্‌রুণ বলিলেন—"তা কি চাই বাবা, বলনা, লজ্জা কি?" আমি তখন কন্যাটির অবস্থা বিবৃত করিয়া, মাত্র তাহার জন্য কিঞ্চিৎ আহার্য্য সামগ্রী প্রার্থনা করিলাম। ঘোষাল পত্নী প্রথমতঃ আত্মীয়ের যেরূপ দস্তুর—আমাকে কিছু মন্দ বলিলেন। তৎপর পরমেশ্বরের সুবিচারের প্রতিকূলে তীব্র সমালোচনা করিলেন। অতঃপর শীঘ্র আমাকে কন্যা সম্প্রদানান্তে চাকুরির জন্য বাহির হইবার অনুজ্ঞা করিয়া বলিলেন,—"আমার সঙ্গে এস।"

আমি তাঁহার অনুগমন করিলাম। তিনি বরাবর যাইয়া রশুই-ঘরের দ্বার মুক্ত করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং আমাকেও প্রবেশ করিবার জন্য অনুমতি করিলেন। আমি তাহা করিলাম। তৎপর তিনি আমাকে বলিলেন—"ঐ যে ঢাকা রহিয়াছে, উহা মহামায়ার ভোগের প্রসাদ, উনি এনেছেন। আমরা উহা স্পর্শ মাত্র করি নাই। কারণ বৈকালিকের দ্বারাই আমাদের যথেষ্ট হইয়াছে। তোমরা সকলেই আজ মায়ের প্রসাদ পাইও।"

আমি বলিলাম—"ঘোষাল মহাশয় নিজে বহিয়া প্রসাদ আনিয়াছেন অথচ—

আমার কথায় বাধা দিয়া তিনি সক্রোধে বলিলেন—"তোমার 'অথচ' রাখ। আমরা যাহা খাইয়াছি, তাহাও মায়ের প্রসাদ বটে। উহা আর আমরা খাইব না। তুমি যদি আজ না আসিতে, তবে এই অন্নব্যঞ্জনাদি সমস্তই কাল সকালে, দীনার মাকে দিতাম। দীনাই পোদ্দারের মা আমাদের কাজকর্ম্মটুকু করে—পেটে দুটি খায়। তা বাবা পেটে না দিয়া ত কাহাকে খাটান যায় না? তার জন্য কাল অন্য ব্যবস্থা করা যাইবে। আমি নিজে বাসী অন্ন খাইব না, কেননা

আমার ব্যারাম। আর উনি যে ইহা খাইবেন না, তাহা তোমাকে বলাই বাহুল্য। আমার স্মরণ হয় না যে, আর কোনও দিন, অন্ন-প্রসাদ বহিয়া এইরূপ বাড়ীতে আনিয়াছেন। এবার যে কেন আনিয়াছেন তাহা বলিতে পারিনা। আমার বোধ হয়, দয়াময়ী ইচ্ছা করিয়া তোমাদেরই জন্য আজ অন্ন পাঠাইয়া দিয়াছেন। সুতরাং লইতে আর আপত্তি করিও না।"

আমি আর কোনও কথা বলিলাম না। অন্নপাত্র হাতে করিয়া একেবারে বাড়ীর দিকে যাত্রা করিলাম। বিদ্যা ঠাকুরাণী বহির্দ্দরজা পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিলেন এবং অন্ধকারে সাবধানে হাঁটি-বার জন্য আমাকে সনির্ব্বন্ধ উপদেশ দিয়া দ্বার যোজনা করিলেন। আমি অন্নপাত্র লইয়া যথাসময়ে বাড়ী পঁহুছিলাম। আমার কিঞ্চিৎ বিলম্ব হেতু ব্রাহ্মণী চিন্তান্বিতা হইয়াছিলেন—হইবারও কথা বটে। এক্ষণে আমার পায়ের শব্দ পাইয়া অপেক্ষাকৃত আশ্বস্ত চিত্তে বলিলেন,—"তুমি কোথা গিয়েছিলে? মেয়ে যে তোমাকে বার বার ডাকিতেছে।"

"এই যে আমি এসেছি"—এই বলিয়া আমি অন্নপাত্রসহ ঘরে প্রবেশ করিলাম এবং পাত্র যথাস্থানে রাখিয়া বলিলাম,—"ইহাতে মহামায়ার প্রসাদ আছে। আগে মেয়েটাকে দাও। তৎপরে আমাকে দিয়া, তোমরা প্রসাদ পাও।"

খাবার সামগ্রী আসিয়াছে শুনিয়া শ্রীমতী অমনি যাইয়া যথাস্থানে বসিয়া গেল। তখন তাহার মুখে পূর্ব্ববিকৃতিভাব কিছুমাত্র নাই দেখিয়া আমরা আহ্লাদিত হইলাম। আনন্দময়ী আজ আমাদের ঘরে যথেষ্ট আনন্দ বিস্তার করিয়াছেন। মানুষ নিতান্ত ভ্রান্ত জীব, তাই অবস্থান্তর ঘটিলেই ঐশী-শক্তির বিরূপ সমালোচনা করে।

ব্রাহ্মণী ক্ষিপ্রহস্তে কন্যাটিকে অন্নব্যঞ্জনাদি দিয়া, আমার জন্য আসন করিলেন। সুতরাং আমিও যথাবিহিত কার্য্যে যোগদান করি-লাম। অন্ন ব্যঞ্জন ডাল তরকারী, মিষ্টান্ন পরমান্ন আমাদের

কয়েক জনের পক্ষে যথেষ্ট। ইদানীং আমাদের এরূপ উপাদেয় আহার্য্যসামগ্রী অদৃষ্টে ঘটিয়াছে বলিয়া স্মরণ হয় না। আমাদের উভয়ের আহার সম্পন্ন হইলে, আমরা আচমনপূর্ব্বক আসিয়া শয়ন করিলাম। ব্রাহ্মণী তখন কোথা হইতে কিছু তণ্ডুল ও নারিকেলের অর্দ্ধভাগ আনিয়া বধূমাতার সম্মুখে রাখিলেন। এবং আমাকে পশ্চাৎ করিয়া প্রসাদ পাইতে বসিলেন। বধূমাতা আমার আদেশেও রাত্রে অন্নাহার করিলেন না।

আমি কিঞ্চিৎ বিস্মিতভাবে বলিলাম—"এই তণ্ডুলাদি কোথায় ছিল ?"

ব্রাহ্মণী বলিলেন—"ঘরেই ছিল, কিন্তু আমার তাহা স্মরণ ছিল না।"

আমি তখন সানন্দিত চিত্তে বলিলাম, "উত্তম, দয়াময়ীরই এ সব ব্যবস্থা।" বাস্তবিক বধূমাতারও আহারের যোগাড় হইল দেখিয়া আমি যে কি পর্য্যন্ত সুখী হইলাম, তাহা আর বলিতে পারিতেছি না। তখন আমার মনে হইল, "যাহার ঘরে দুঃখ নাই, তাহার ঘরে সুখও নাই।"

কন্যাটি এইবার সময় পাইয়া কাচের চুড়ীর জন্য বায়না ধরিল—"বাবা আমাকে চুড়ী আনিয়া দিবে না ?"

আমি তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলাম—"মা আমরা ভিখারী। পয়সা কোথা পাব যে তোমাকে চুড়ী কিনিয়া দিব ?"

কন্যা বলিল,—"তোমার এই ঝুলির ভিতর পয়সা আছে।"

আমি তখন স্নেহ ও ক্রোধমিশ্রিতভাবে বলিলাম,—"দূর বেটী ভিখারীর মেয়ে। পয়সা থাকিলে কি আমরা এইরূপ উপবাস করি ?"

কন্যা। কাল আমি তোমার এই ঝুলি খুঁজিয়া দেখিব।

আমি। দেখিস্।

শ্রীমতি আর কোন কথা বলিল না। সে অবিলম্বেই নিদ্রিতা হইয়া পড়িল। এই সময়ে ব্রাহ্মণী ও বধূমাতা আসিয়া শয্যাগতা

হইলেন, এবং অনতি বিলম্বে তাহারাও শ্রীমতীর দশা প্রাপ্ত হইলেন। কেবল আমি শুইয়া শুইয়া ভগবানের লীলা-বৈচিত্র্যের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলাম। বহুক্ষণ পরে একটু তন্দ্রা আসিল, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গেই স্বপ্নের আবির্ভাব হইল। স্বপ্ন অপূর্ব্ব।

এক অতি প্রাচীন পুরুষ আসিয়া আমার শিয়রে উপবেশন পূর্ব্বক সস্নেহে ডাকিলেন—"সাতুরাম!"

আমি বিস্মিতভাবে বলিলাম—"আপনি কে?"

প্রাচীন পুরুষ উত্তর করিলেন,—"আমি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।"

তখন আমি ধীরভাবে নিরীক্ষণ করিয়া চিনিলাম—তিনিই বটেন। তখন বিনীতভাবে বলিলাম,—"মহাশয়, আপনার সহিত আমার কখনও দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই। আপনার গ্রন্থাদিতে আপনার দৈহিক-চিত্র দেখিয়াছি এবং তাহাতেই আপনাকে চিনিতে পারিতেছি। আপনি আমার আরাধ্য দেবতা। অতএব ভক্তিভাবে আপনাকে নমস্কার করিতেছি।"

তিনি আমাকে আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক সস্নেহে বলিলেন,—"বৎস, একেবারে বসিয়া আছ?"

আমি একটু রাগতভাবে বলিলাম,—"বলেন কি মহাশয়? ব্রহ্মমুহূর্ত্তে বাহির হই, আড়াই প্রহরে ফিরি। পুনঃ অপরাহ্ণে বাহির হই, ফিরিতে রাত্রি এক প্রহর। এতখানি সময় আমি দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াই। আমি বসিয়া আছি?"

প্রা-পুরুষ। সে ত তোমার নিজের কাজ। দেশের কাজ কি করিতেছ?

আমি। আমি ভিখারী। আমাদ্বারা দেশের কোন্ কার্য্য সম্ভবে?

প্রা-পু। তোমা দ্বারা দেশের একটি গুরুতর কার্য্য সিদ্ধি হইবার সম্ভাবনা আছে।

আমি। আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।

প্রা-পু। বলিতেছি এই যে, তুমি লিখিতে আরম্ভ কর। তোমার

উত্তম হাত, এবং দিব্য কল্পনা শক্তি। তোমা দ্বারা বঙ্গ-সাহিত্যের অনেক উপকার হইবে।

আমি। ওঃ হরি! এই কথা! মাপ করিবেন মহাশয়! আমি কখনও লেখালেখির মধ্যে যাইব না।

প্রা-পু। কেন বৎস?

আমি। আমি যখন মোক্তারি করিতাম, তখন দুইটি প্রবন্ধ লিখিয়া মুদ্রিত হওয়ার জন্য কোনও পত্রিকা আফিসে পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। আমার প্রেরিত প্রবন্ধ মুদ্রিত হয় নাই।

প্রা-পু। হইতে পারে তোমার প্রবন্ধের বাহ্যিক ভাব দেখিয়া সম্পাদক উহা উপেক্ষা করিয়াছেন। অথবা তোমার নাম দেখিয়াও সেরূপ করিতে পারেন।

আমি। তবে আর আমাকে লিখিতে আজ্ঞা করিতেছেন কেন? যাহা সাধারণের পড়িবার সুযোগ হইবে না, তাহা লিখিবার প্রয়োজন কি? আর তদ্দ্বারা দেশের কোন্ কার্য্য সাধিত হইতে পারে?

প্রা-পু তোমার লিখিত প্রবন্ধ একদিন সাধারণের পড়িবার সুযোগ হইবে এবং তদ্দ্বারা দেশের অনেক উপকার সাধিত হইবে।

আমি। গুরুদেব! আপনার আজ্ঞা গ্রহণ করিলাম। কিন্তু এক কথা—লিখিবার উপকরণাদি আমার কিছুই নাই—বহুদিন সে সকলের সহিত সম্পর্করহিত হইয়াছি। অর্থ না হইলে ত সে সকল সংগ্রহ করা যাইবে না?

প্রা-পু। বৎস সাতুরাম! এজন্য তোমার কোনও অর্থব্যয়ের প্রয়োজন নাই। তুমি গাছের পাতায় রচনা লিখিয়া রাখিও। অনেক বনলতার একরূপ ফল জন্মে যে তাহার কাথ দ্বারা উত্তম কালি প্রস্তুত করা যায়। বংশদণ্ড দ্বারা লেখনী প্রস্তুত করিয়া লইবে।

আমি। গুরুদেব! এরূপ আজ্ঞা যদি আর কিছুদিন পূর্ব্বে করিতেন, তবে এতদিনে কতকগুলি বিষয় লিখিয়া রাখিতে পারিতাম। এক্ষণে আমার যেরূপ অবস্থা তাহা আপনি অন্তর্যামী সমস্তই অবগত আছেন। কত দূর যে কি করিয়া উঠিতে পারিব, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।

প্রা-পু। বৎস! আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি যে, তোমার প্রনষ্ট প্রবৃত্তি পুনরুদ্দীপিত হউক। এই সময়ে 'বাবা' সম্বোধনে আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। সুতরাং স্বপ্নেরও অবসান হইল। চাহিয়া দেখিলাম সূর্য্যোদয়ের অধিক বিলম্ব নাই। ঈশ্বরেচ্ছায় শয্যায় থাকিয়াই আমাদের আকাশ দেখার সুযোগ ছিল। আমি আর বিলম্ব করিলাম না। 'দুর্গে দুর্গে' বলিযা গাত্রোত্থান করিলাম এবং প্রাতঃকৃত্যাদি সম্পাদন পূর্ব্বক ঝুলিটি স্কন্ধে করিয়া ভিক্ষায় বাহির হইলাম।

শ্রীগঙ্গাচরণ নাগ।
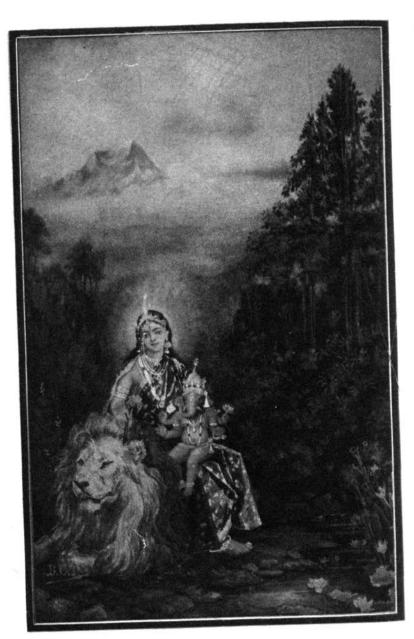
গণেশ জননী

চিত্রকর শ্রীযুক্ত ভবাণীচরণ লাহার অনুমতি অনুসারে

নারায়ণ

২য় খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা] [কার্ত্তিক, ১৩২২

আগমনী

যে দিন অভয়ে সাগর বেলায় পূজিল তোমায় শ্রীরামচন্দ্র,
মন্ত্রমুগ্ধ সকল আনন ধ্বনিল হর্ষে জলদমন্দ্র,
সেদিন তোমার প্রভায় ধরার প্রভাত হইল অশুভ রাত্রি,
বন্দিল সবে "জয় মা জননি জগত্তারিণি জগদ্ধাত্রি!"
ধন্য হইবে সন্তান সবে নিরখি তোমায় তিনটি রাত্রি,
জয় শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি মা মঙ্গল-দাত্রি!

নয়নত্রয়ে ব্যক্ত করুণা, রসনা স্বস্তি বচনে লিপ্ত,
ললাটে গরিমা, বিমল হাস্যে অমল-কমল-আনন দীপ্ত;
দশ প্রহরণ শোভিছে নিত্য, জননি তোমার দশটি হস্তে
ভক্তিপূর্ণ, চরণ তোমার ধরিছে কেশরী আপন মস্তে।
ধন্য হইবে সন্তান সবে নিরখি তোমায় তিনটি রাত্রি,
জয় শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি মা মঙ্গল-দাত্রি!

নিন্দা কুচ্ছ শুনিয়া পতির পাইলে মর্ম্মে অশেষ কষ্ট,
তখনি ত্যজিলে দেহের ভার, দক্ষযজ্ঞ হইল নষ্ট;

কখন মা তুমি ভীষণ দীপ্ত, দৈত্য-অসুর-নাশিনী দৃপ্তে,
হাসিয়া কখন তুষিছ ভক্তে, শান্তি ঢালিছ নিখিল বিশ্বে ;
ধন্য হইবে সন্তান সবে নিরখি তোমায় তিনটি রাত্রি,
জয় শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি মা মঙ্গল-দাত্রি !

সব্যেতোমার হেরম্ব-কণ্ঠ ঘোষিছে সতত সর্ব্ব সিদ্ধি,
কমলা চাহিয়া কমল নেত্রে, করিছে সকল শোভার বৃদ্ধি,
বামে ষড়ানন ধরিয়া অস্ত্র নাশিছে যতেক অশুভ রিষ্টি,
বাজায়ে বীণায় শ্বেতবরণা করিছে দিব্য জ্ঞানের সৃষ্টি।
ধন্য হইবে সন্তান সবে নিরখি তোমায় তিনটি রাত্রি,
জয় শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি মা মঙ্গল-দাত্রি !

জননি তোমার পূজার তরে আজি গো জুড়িয়া ভারতবর্ষ,
উঠিছে উচ্চে সে কি কলরব, সে কি মা ভক্তি, সে কি মা হর্ষ,
জয় মা দুর্গে দুঃখহারিণি ললিত চরণে চাহি মা মুক্তি,
জানি মা কেবল করুণা তোমার, জানিনা কিছুই শাস্ত্র যুক্তি।
ধন্য হইবে সন্তান সবে নিরখি তোমায় তিনটি রাত্রি,
জয় শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি মা মঙ্গল-দাত্রি !

শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র।

বাঙ্গালীর প্রতিমা-পূজা ও দুর্গোৎসব

প্রাচীনেরা দুর্গাকে যে-চক্ষে দেখিতেন, সে-চক্ষু আমরা হারাইয়াছি। "দুর্গা! দুর্গা!" বলিতে তাঁদের চক্ষে জল, শরীরে পুলক, হৃদয়ে ভক্তি, প্রাণে বল, আত্মাতে আরাম আসিত। দুর্গা-নামের সে শক্তি আমাদের নিকটে আর নাই। তাঁরা যে-ভাবে দুর্গাপূজা করিতেন, আমাদের পক্ষে তাহা সম্ভব নহে। অথচ এই পূজার সময়ে আমাদের মনটাও কেমন কেমন করিয়া উঠে!

জানি না কেন, শরতের প্রাতঃকাল বড় মিষ্টি লাগে। শরতের বাল-সূর্য্য প্রাণের প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া কত সুপ্ত স্মৃতিকে জাগাইয়া তোলে। শরতের বায়ু কাণে কাণে কি কথা কহিয়া যায়, বুঝি না; কিন্তু তাহাতে হৃদয়ে কি যেন একটা সাড়া পড়ে। আমরা পূজা ছাড়িয়াছি। আমরা পূর্ব্বপুরুষদিগের বিশ্বাস হারাইয়াছি। মনকে যত কেন চোক ঠার দেই না, প্রতিমায় সত্য সরল ঈশ্বরবুদ্ধি আমাদের হয় না। তবুও কেন, পূজার সময়ে চারিদিকে যখন পূজার বাদ্য বাজিয়া উঠে, তখন তার সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞাতে অলক্ষিতে আমাদের সকল জ্ঞানবিজ্ঞান এবং যুক্তিতর্ক সত্বেও, প্রাণ নাচিয়া উঠে!

সকলের হয় ত এমনটি হয় না। আমাদের সন্তানদিগের এটি না হইবার কথা। কিন্তু এটি যার হয় না, তার বড় দুর্ভাগ্য নয় কি? আমাদের ছেলেপিলেরা এ বস্তু নিঃশেষে হারাইতেছে বলিয়া, তাদেরে কৃপাপাত্র বলিয়া মনে হয়। তাদের মতবাদ হয় ত আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের মতবাদ অপেক্ষা বিশুদ্ধতর হইবে। তাদের

তত্ত্বসিদ্ধান্ত হয় ত তাহাদের পিতামহদিগের তত্ত্বসিদ্ধান্ত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ও সমধিক সত্যোপেত হইবে। তারা হয় ত বিশুদ্ধতর ঈশ্বর-সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করিবে। কিন্তু কেবল মতে বা সিদ্ধান্তে ধর্ম্ম-জীবনের বুনিয়াদ গড়ে কি?

ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা অতিপ্রাকৃতে। যাহা চক্ষে দেখি, কাণে শুনি, হাত দিয়া ধরি,—যাহা এসকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রহণ করি, যাহা এই মনের দ্বারা চিন্তা করি, যাহা লইয়া আমাদের প্রতিদিনের আহার-বিহারাদি সম্পাদন করি, তাহার অতীতে, আপাতত তাহা হইতে পৃথক্, আর একটা কিছু আছে, তাহার কিছুই দেখি শুনি না, অথচ তাহা আছে অনুভব করি; তাহার কিছুই ধারণা হয় না, অথচ তাহা যে নাই এমন ভাবিতে পারি না; তাহা ইন্দ্রিয়াতীত হইয়াও ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ যাবতীয় বস্তুকে আচ্ছন্ন করিয়া আছে;—এই যে বিশ্বাস, এই যে ধারণা, এই যে ভাব, ইহাই মানুষের ধর্ম্মের মূল বুনিয়াদ। এটি যে হারাইল, তার সব গেল। তার কেবল ধর্ম্ম গেল যে তাহা নয়, তার সর্ব্বস্ব গেল। সে মনুষ্যত্বের অধিকার নিজের হাতে ঠেলিয়া ফেলিয়া, সাধারণ পশুত্বের ভূমিতে যাইয়া দাঁড়াইল। আর দুর্গোৎসব যেমন করিয়া বাঙ্গালীর প্রাণে এই অতিপ্রাকৃতের ভাবটি জাগাইত, এমন আর কিছুতে করিত না। তারই আমেজ এখনও প্রাণের মধ্যে লাগিয়া আছে বলিয়া এই পূজার সময় প্রাণের ভিতরটা অমন করিয়া নড়িয়া চড়িয়া উঠে।

বাঙ্গালীর প্রতিমা পূজা।

প্রতিমা-পূজা বাঙ্গলার বিশেষত্ব। ভারতবর্ষের আর কোথাও এভাবের মূর্ত্তিপূজা নাই। অন্যত্র দেবতার মূর্ত্তি আছে, কিন্তু সে-সকল মূর্ত্তি মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত। সে-সকল মূর্ত্তি সর্ব্বদা রহিয়াছে। যজমানেরা পর্ব্বাহে কিম্বা গার্হস্থ্য অনুষ্ঠানাদি উপলক্ষে দেউলে যাইয়া দেবতার পূজা করিয়া আসে। তাদের ঘরে ঠাকুরের প্রতিমা-প্রতিষ্ঠা হয় না। বাঙ্গলায়ও দেউল আছে, পীঠস্থান আছে। সেখানে

দেবতার মূর্ত্তিও প্রতিষ্ঠিত আছে। প্রতিদিন সে-মূর্ত্তির পূজা হইয়া থাকে। কিন্তু এসকল বাঙ্গালী হিন্দুর ধর্ম্মজীবনের মূল প্রস্রবণ নহে। এগুলির দ্বারা বাঙ্গালী-চরিত্র গড়িয়া উঠে নাই। বাঙ্গালীর ধর্ম্ম, বাঙ্গালীর চরিত্র, বাঙ্গালীর সংসার ও পরমার্থ গড়িয়া উঠিয়াছে তার নিত্য সন্ধ্যাবন্দনা ও নৈমিত্তিক পূজাদির দ্বারা। আধুনিক জ্ঞানের চক্ষে এই প্রতিমা-পূজা হীন এবং হেয় হইলেও, ভাবের রাজ্যে ও রসের রাজ্যে এসকলের একটা বিশেষ মূল্য আছে।

ত্রিবিধ বৈদান্তিক উপাসনা।

প্রাচীন বেদান্তে তিন প্রকারের উপাসনার বিধান আছে। প্রথম স্বরূপ উপাসনা, দ্বিতীয় সম্পদুপাসনা, তৃতীয় প্রতীকোপাসনা। আত্মার উপাসনা স্বরূপ-উপাসনা। আত্মার মধ্যে পরমাত্মার উপলব্ধি, নিজের স্বরূপেতে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারলাভ, অদ্বৈতব্রহ্মজ্ঞানের অনুশীলন, ধ্যান-যোগে ব্রহ্মাত্মৈকত্ব অনুভব করা, ইহাই স্বরূপ-উপাসনা। এই উপাসনা কেবল সমাধির অবস্থাতেই সম্ভব হয়। এই উপাসনার জন্য সকল ইন্দ্রিয়ের একান্ত নিরোধ আবশ্যক। সর্ব্বেন্দ্রিয়-চেষ্টার নিঃশেষ নিবৃত্তি না হইলে এ উপাসনা সম্ভব হয় না। ইহা যোগের পথ। যতক্ষণ না সাধকের এই অবস্থালাভ হইয়াছে, যতক্ষণ না তার ইন্দ্রিয় সকল নিবৃত্ত ও নিশ্চেষ্ট হইয়াছে, ততক্ষণ তাঁহাকে উচ্চৈঃস্বরে স্তবস্তুতি প্রভৃতির আবৃত্তি করিতে হয়। বেদান্তে এ পথও প্রদর্শিত হইয়াছে। তন্ত্রেতেও এই সকল স্তুতিবন্দনার উপদেশ আছে। মহানির্ব্বাণতন্ত্রের ব্রহ্ম-স্তব এই স্বরূপ-উপাসনার দ্বার-স্বরূপ। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর দেবীস্তবও তাহাই। সে কথা পরে বলিব। কিন্তু এই স্বরূপ-উপাসনা উচ্চ অধিকারীর পক্ষেই সম্ভব। নিম্নতর অধিকারীর পক্ষে ইহা অসাধ্য। যাঁরা এই স্বরূপ-উপাসনার অধিকার লাভ করেন নাই, অর্থাৎ যাঁহাদের চিত্তবৃত্তির নিরোধ করিবার শক্তি জন্মে নাই, যাঁহারা এখনও গভীর ধ্যান সাধন করেন নাই, তাঁহাদের জন্য সম্পদুপাসনার ব্যবস্থা হইয়াছে। দুইটি বস্তুর মধ্যে

কোনও সামান্য ধর্ম্ম থাকিলে, সেই ধর্ম্মকে লক্ষ্য করিয়া, তাহাদের মধ্যে ক্ষুদ্রতর বস্তুর চিন্তা ও ধ্যানের দ্বারা বৃহত্তর বস্তুর জ্ঞান-লাভ ও ধ্যানধারণার চেষ্টা করাই সম্পদুপাসনা। স্বরূপ-জ্ঞানের উপরে স্বরূপ-উপাসনার প্রতিষ্ঠা। আর সম্পদ্-জ্ঞানের উপরে এই সম্পদুপাসনার প্রতিষ্ঠা। বালকেরা ভূগোল পড়িবার সময় পৃথিবীর আকারকে কমলালেবুর আকারের মতন ভাবিতে শিখে। পৃথিবীর সঙ্গে কমলালেবুর আকার-সামান্য আছে। পৃথিবীর আকার আমাদের চক্ষুগ্রাহ্য নহে। জ্যোতির্ব্বিদেরা গণিতের দ্বারা এই অদৃশ্য ও অদৃষ্ট পৃথিবীর আকার-আয়তনাদির প্রতিষ্ঠা করেন। এই গণনার দ্বারা তাঁরা ঠিক করিয়াছেন যে, পৃথিবী পূর্ব্বপশ্চিমে গোল বা বৃত্তাকার, কিন্তু তার উত্তরদক্ষিণ একটু চাপা। এইটি স্থির করিয়া তাঁরা তাঁহাদের পরিচিত কমলা-লেবুর আকারের সঙ্গে পৃথিবীর আকারের সাদৃশ্য রহিয়াছে বুঝিলেন। তখন জনসাধরণকে পৃথিবীর আকার কিরূপ, ইহা বুঝাইতে যাইয়া, কমলালেবুর সাহায্য লইলেন। এই-ভাবে, কমলালেবুর আকার দেখাইয়া পৃথিবীর আকারের যে জ্ঞানলাভ হয়, তাহাকে বেদান্তে সম্পদ-জ্ঞান কহে। ব্রহ্ম সম্বন্ধে সূর্য্য, মন, প্রাণ প্রভৃতির সাহায্যে এই সম্পদজ্ঞানলাভ হইতে পারে। ব্রহ্ম চিদ্বস্তু। ব্রহ্ম সর্ব্বেন্দ্রিয়াতীত। ব্রহ্ম অবাঙ্মনসোগোচর। বাক্য, মনের সহিত তাহাকে খুঁজিতে যাইয়া, না পাইয়া প্রত্যাবৃত্ত হয়। এই ব্রহ্মের সঙ্গে কিন্তু এই যে দৃশ্যমান সূর্য্য, তাহার একটা সামান্য-ধর্ম্ম আছে। পরম-চৈতন্যরূপে ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ এবং বিশ্ব-প্রকাশক। সূর্য্যও জ্যোতিষ্করূপে স্বপ্রকাশ, আপনি উদিত না হইলে, কেহ কোনও কিছুর দ্বারা সূর্য্যকে দেখিতে পায় না। আর সূর্য্যও জগৎ-প্রকাশক। সূর্য্য উদিত হইয়া একই সঙ্গে আপনাকেও প্রকাশিত করেন এবং চক্ষুগ্রাহ্য জগতকেও প্রকাশিত করেন। এইজন্য স্বপ্রকাশত্ব ও জগৎ-প্রকাশত্ব সম্বন্ধে ব্রহ্মের সঙ্গে সূর্য্যের একটা গুণ-সামান্য বা ক্রিয়াসামান্য আছে। এই গুণ-সামান্যকে আশ্রয় করিয়া, সূর্য্যের এই স্বপ্রকাশত্ব ও জগৎ-প্রকাশত্ব

ধর্ম্মকে লক্ষ্য করিয়া, সূর্য্যের ধ্যান-সহায়ে ব্রহ্মের ধ্যান করা, সূর্য্যকে অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মের চিন্তা করা, সম্পদুপাসনা। এইরূপে মনের উপাসনা, প্রাণের উপাসনাও সম্পদুপাসনা। যে বস্তুর সঙ্গে ব্রহ্মের যত অধিক গুণসামান্য থাকে, তাহার আশ্রয়ে ব্রহ্মোপাসনা শ্রেষ্ঠতর সম্পদুপাসনা বলিয়া গণ্য হইবে। এইজন্য সূর্য্যোপাসনা অপেক্ষা মনোপাসনা, মনোপাসনা অপেক্ষা প্রাণোপাসনা, প্রাণোপাসনা অপেক্ষা আত্মবান সদ্‌গুরুর উপাসনা উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠতর উপাসনা বলিয়া গণ্য হয়। সূর্য্যাদির উপাসনা অপেক্ষা এই জন্য অবতারাদির ভজনা অশেষগুণে শ্রেষ্ঠ। কারণ ইহাঁদের সঙ্গে ব্রহ্মের স্বরূপের সাদৃশ্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। বেদান্তমতে অবতারপূজা ও তান্ত্রিকমতে গুরুপূজা উভয়ই সম্পদুপাসনার অন্তর্গত। আর এই অবতারপূজা এবং গুরুপূজাই শ্রেষ্ঠতম সম্পদুপাসনা।

প্রতিকোপাসনা।

নিম্নতম অধিকারীর জন্য প্রতীকোপাসনার ব্যবস্থা। বেদান্ত এই প্রতীকোপাসনাকে অধ্যাসজনিত উপাসনা বলিয়াছেন। অধ্যাস অর্থ—অন্যত্রদৃষ্টঃ পরত্রাবভাসঃ। একস্থানে যে বস্তু দৃষ্ট হইয়াছে, অন্যত্র—যেখানে প্রকৃতপক্ষে তাহা নাই সেখানে—তাহার সত্বার আরোপ করার নাম অধ্যাস। জঙ্গলে সাপ দেখা গিয়াছে, ঘরের পৈঠায় দড়ী পড়িয়া আছে, এই দড়ীতে ঐ পূর্ব্বদৃষ্ট সর্পের সত্বা আরোপ করা বা কল্পনা করার নাম অধ্যাস। এই অধ্যাস প্রতীকোপাসনার প্রাণ। যে ঈশ্বরতত্বের বা ব্রহ্মতত্বের জ্ঞান পূর্ব্বে অন্যসূত্রে লাভ হইয়াছে, তাহাকে সম্মুখের ঘটপটাদিতে কল্পনা করিয়া, সেই ঘটপটাদির পূজাই প্রতীকপূজা। ঈশ্বর-তত্বের বা ব্রহ্মতত্বের যে পূর্ব্বজ্ঞানের উপরে এই প্রতীকপূজার প্রতিষ্ঠা হয়, এই জ্ঞান নিতান্ত অপরোক্ষজ্ঞান। প্রকৃতপক্ষে এক্ষেত্রে সাধকের অন্তরে ঈশ্বরের বা ব্রহ্মের কোনওরূপ সাক্ষাৎজ্ঞান জন্মে নাই, ইহাই বুঝিতে হইবে। এ জ্ঞান শোনা-জ্ঞান মাত্র; এ জ্ঞান শব্দ-

জ্ঞান, বস্তু-জ্ঞান নহে। এই শ্রুত-জ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া প্রতীকো পাসনা হইয়া থাকে। এই প্রতীকোপাসনাতে কেবল অতি-প্রাকৃতের অনুভূতির অনুশীলন হয় মাত্র। কোনওরূপ সত্য ঈশ্বরজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান ইহা হইতে জন্মে না।

প্রতীকোপাসনা ও তত্ত্বস্ফূর্ত্তি।

ফলতঃ কেবলমাত্র প্রতীকোপাসনার দ্বারা তত্ত্বস্ফূর্ত্তি হইতেই পারে না। যাঁরা হয় মনে করেন এবং কোনও কোনও সর্ব্বজনপূজনীয় সাধকেরা এপথে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন বলেন, তাঁরা প্রতীকোপাসনার সঙ্গে অন্য যেসকল সাধন-ভজন অবলম্বিত হয়, তাহার কথা তলাইয়া দেখেন না। এদেশে কেবল প্রতীকের পূজা কেউ করে না। দিনে প্রতীকের পূজা একবার মাত্র হয়। কিন্তু সন্ধ্যাবন্দনা তিনবার করিতে হয়। সন্ধ্যাবন্দনার মন্ত্রও স্বতন্ত্র। ব্রাহ্মণেরা গায়ত্রী জপ করেন। অন্যেরা গুরুদত্ত মন্ত্র জপ করেন। এসকল মন্ত্র ঈশ্বর-প্রতিপাদক বা ব্রহ্মপ্রতিপাদক। এই সকল ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে করিতে তাঁহাদের চিত্তশুদ্ধি হয়, মন্ত্রে তাঁরা তন্ময়ত্ব লাভ করেন। মন্ত্র তাঁহাদের সর্ব্বময় হইয়া উঠে। এইভাবে এই নাম বা জপমন্ত্র যখন তাঁহাদিগকে নিঃশেষে আচ্ছন্ন ও একান্তভাবে অধিকার করে, যখন তাঁহাদের দেহমনপ্রাণ এই অজপার প্রভাবে মন্ত্রময় ও নামময় হইয়া উঠে, তখন তাঁহারা যোগ-সমাধির অবস্থা লাভ করেন। এইভাবে এই পথেই তাঁরা সিদ্ধিলাভ করেন, প্রতীকোপাসনার দ্বারা নহে। তাঁদের অন্তরঙ্গ সাধনের কথা বাহিরের লোকে জানে না। বহির্মুখ লোকে সে খবর রাখে না। সুতরাং কেবল তাঁদের ক্ষণকালের বাহিরের সাধন-ভজন দেখিয়া, তাহারই ফলে সিদ্ধিলাভ হয়, এরূপ মনে করে।

বাঙ্গালীর প্রতিমা-পূজা।

বাঙ্গালীর প্রতিমা-পূজাকে কিন্তু ঠিক প্রতীকোপাসনার শ্রেণীভুক্ত

করা যায় না। কালী, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, প্রভৃতি দেবতার মূর্ত্তিকে প্রতীক বলা যায় না। অন্যদিকে এগুলিকে বেদান্তোক্ত সম্পদুপাসনার অবলম্বনরূপেও গ্রহণ করা অসম্ভব। সম্পদুপাসনার গুণসামান্যটা প্রত্যক্ষ ও বাস্তব হওয়া চাই। কালী, দুর্গা, প্রভৃতির সঙ্গে ঈশ্বরের বা ব্রহ্মের সেরূপ কোনও প্রত্যক্ষ এবং বাস্তব গুণ-সামান্য আছে, একথা ত বলা যায় না। আমাদের এসকল প্রতিমা-পূজাকে ফলতঃ বেদান্তের সম্পদুপাসনা বা প্রতীকোপাসনা, কোনও শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। এগুলি খাঁটি প্রতীকোপাসনাও নহে, খাঁটি সম্পদুপাসনাও নহে। এগুলি একটা মিশ্র বস্তু। এখানে প্রতীকে সম্পদে অদ্ভুত রকমে মাখামাখি হইয়া গিয়াছে। আর এই মাখামাখিটা বাঙ্গালীর ভাবুকতার বিশেষ ফল। এসকল প্রতিমা-পূজার মধ্যে বাঙ্গালী চরিত্রের বিশেষত্বটি অপূর্ব্বভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

এসকল প্রতিমা-পূজার ঐতিহাসিক তত্ত্ব পণ্ডিতেরা অনুসন্ধান করুন। এগুলি চীন হইতে আসিয়াছে, না তিব্বত হইতে আসিযাছে, না আমাদের মাটি হইতেই জন্মিয়াছে; এগুলির সঙ্গে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের ও ভিন্ন ভিন্ন শাখার বৌদ্ধ-সাধনার সম্পর্ক কি ও কতটা; এগুলি প্রাচীন না অর্ব্বাচীন; এসকল কথার বিচার প্রত্নতত্ত্ববিদেরা করিতেছেন। সেসকল কথা আমি সাক্ষাৎভাবে বেশী জানি না। তার আলোচনা আমার সাধ্যাতীত এবং বর্ত্তমান প্রসঙ্গে নিষ্প্রয়োজন। যেখান হইতেই আদিতে এই প্রতিমা-পূজা বাঙ্গলাদেশে আসুক না কেন, এখন যে আকারে এসকল আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে, তাহা বাঙ্গালীর হাতে গড়া বস্তু। এই প্রতিমা-পূজার মধ্যে বাঙ্গালী আপনার রস ও ভক্তি সঞ্চার করিয়া, তাহাকে নিজস্ব করিয়া লইয়াছে। আর এখানেই বাঙ্গালীর বাঙ্গালীত্ব ফুটিয়াছে। এগুলির মূল ও পূর্ব্ব-ইতিহাস যাহাই হউক না কেন, বর্ত্তমান আকার ও উদ্দীপনা বাঙ্গালীর দেওয়া। পরের ঘর হইতে আসিলেও, বাঙ্গালী

এগুলিকে নিঃশেষে আত্মসাৎ করিয়া বসিয়াছে। না করিলে, এ-গুলির এই মর্ম্ম ও মর্য্যাদা থাকিত না।

বাঙ্গালী কবি। আমরা কবির জাত। কবি-কল্পনা বস্তুটি আমাদের অস্তিমজ্জাগত। ইহাতে বাঙ্গালীর ভাল হইয়াছে, কি মন্দ হইয়াছে, সে বিচার যে করিতে চাহে করুক। কেহ কেহ ভাবেন, জানি, যে বাঙ্গালী অমন ভাবপ্রবণ না হইলেই তার পক্ষে ভাল ছিল। তাহা হইলে সে শিখ বা মারাঠার মতন একটা ঐতিহাসিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিত। ইহাঁরা শিখের বা মারাঠার জাতীয় চরিত্রের দাঁড়িপাল্লায় বাঙ্গালীকে চড়াইয়া তার ভাল-মন্দের ওজন করেন। এরূপ ওজন আমি করি না। বাঙ্গালীর বাঙ্গালীত্ব নষ্ট করিয়া আমি তাহাকে বড় করিতে চাই না। কেউ আপনার বৈশিষ্ট্য নষ্ট করিয়া এ জগতে বড় হইতে পারে বলিয়া আমি বিশ্বাস করি না। এজন্য বাঙ্গালীর ভাবুকতা, অপরের অপর গুণের তুলনায়, ভালই হউক আর মন্দই হউক, অতি মহার্ঘ বস্তু বলিয়া মনে করি। এটি গেলে বাঙ্গালীর সব গেল। আর বাঙ্গালী ভাবুকের জাত, কবির জাত বলিয়াই বাঙ্গালীর ধর্ম্ম অমন মিষ্ট। এই জন্য বাঙ্গলার শাক্তও ভক্তির হিসাবে বৈষ্ণবের চাইতে কোনও দিন ছোট হল নাই। এইজন্য বাঙ্গলার প্রতিমা–পূজা বেদান্তের পুরাতন উপাসনার সকল শ্রেণীবিভাগকে ছাড়াইয়া গিযাছে।

প্রতিমা-পূজার মর্ম্ম।

মধ্যযুগের বৈদান্তিক মায়াবাদী বাঙ্গালা নিজেও এই প্রতিমা-পূজার নিগূঢ় মর্ম্ম ভাল করিয়া ধরিতে পারে নাই। এই জন্যই নিম্ন অধিকারীর জন্য বিহিত বলিয়া, এগুলির পক্ষ সমর্থন করিতে চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু সত্যভাবে যে প্রতিমা-পূজা করিতে পারে, সে ত নিম্ন অধিকারী নয়, সে যে শ্রেষ্ঠতম অধিকারী।

"সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা"

সাধকদিগের হিতার্থে ব্রহ্মের রূপ কল্পিত হইয়া এসকল প্রতি-

ষার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে,—সকলেই একথা বলেন। কিন্তু এই পুরাতন শ্লোকের মর্ম্ম যে কি, ইহা অতি অল্পলোকেই তলাইয়া দেখেন। প্রথমতঃ ব্রহ্মের রূপ কল্পিত হয়,—"সাধকানাং হিতার্থায়"—সাধকদিগের হিতের নিমিত্ত। কিন্তু "সাধক" কাহারা? মানুষমাত্রেই ত সাধক নয়। সাধক হইবার আগে, "সাধ্য" নির্ণয় আবশ্যক। যার সাধ্য নির্ণয় হয় নাই, তাহাকে সাধক বলা যায় কি? সাধকাবস্থা ধর্ম্মজীবনের প্রথমাবস্থা নহে, দ্বিতীয় অবস্থা। ধর্ম্মের প্রথম অবস্থাকে সাধুরা প্রবর্ত্তাবস্থা বলিয়াছেন। এই প্রবর্ত্ত-অবস্থা অতিক্রম করিলে পরে, সাধকের অবস্থা লাভ হয়। এই প্রবর্ত্তাবস্থাতেই সাধ্য নির্ণয় হইয়া থাকে। সুতরাং ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপিত হইবার পূর্ব্বে সাধনারম্ভ হয় না, হইতেই পারে না। সাধন আরম্ভ না হইলে, কেহ সাধক হয় না, হইতেই পারে না। অতএব সাধকের অবস্থা ধর্ম্মের নিম্নতম অবস্থা নহে। সাধক নিম্ন অধিকারী নহেন। তাঁর চাইতে নিম্ন অধিকারী প্রবর্ত্তাবস্থায় যে আছে সে। আর যে প্রবর্ত্তাবস্থা পর্য্যন্ত লাভ করে নাই, অর্থাৎ যার কোনও ধর্ম্মজিজ্ঞাসার পর্য্যন্ত উদয় হয় নাই, সে নিম্ন অধিকারীও নহে; একান্ত অনধিকারী। এ সংসারে জিজ্ঞাসুর সংখ্যা অতি কম, হাজারে একজনও মিলে কি না সন্দেহ। সাধন-ধর্ম্মে সাধারণলোকের কোনই অধিকার জন্মে না। তারা নিম্ন অধিকারী নহে, অনধিকারী।

"সাধকদিগের" হিতার্থে ব্রহ্মের রূপ কল্পিত হয়, এ যদি সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে এই রূপ-কল্পনা সাধারণ লোকের জন্য নয়, ইহা মানিতেই হইবে। তারপর, এ কল্পনা করে বা করিবে বা করিতে পারে কে? ব্রহ্মের এসকল রূপ কাহার দ্বারা কল্পিত হয়, এ প্রশ্নটা কেউ তোলে না। এই প্রশ্নটা তুলিলেই এসকল প্রতিমা-পূজার মূল মর্ম্মটা খুলিয়া যায়। কারণ ব্রহ্মের স্বরূপ যে জানে, যে সে-স্বরূপের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছে, সে'ই কেবল ব্রহ্মের রূপ কল্পনা করিতে পারে, অন্যে পারে কি? রূপ বলিলেই

যে স্বরূপ আসে। বস্তুর স্বরূপের জ্ঞান যার নাই, সে কি কখনও তার রূপ আঁকিতে পারে? অতএব ব্রহ্মের রূপ কল্পনা করিতে গেলে, তাঁর স্বরূপের প্রত্যক্ষ লাভ প্রয়োজন। যিনি রূপ-কল্পনা করিয়াছেন বা করেন, তিনি ব্রহ্ম কি তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। যে সাধকের হিতার্থে এই রূপের কল্পনা হইল বা হইয়াছে, সে সাধক সেই ব্রহ্ম স্বরূপতঃ কি ইহা শুনিয়াছেন, কিন্তু দেখেন নাই। এই যোগাযোগ হইলে পরে তবে

সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা

সম্ভব এবং সার্থক হয়।

প্রেম-ধর্ম্ম ও প্রতিমা-পূজা।

"সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপ-কল্পনা"—বলিয়া যাঁরা প্রথমে প্রতিমার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাঁরা নিজেরা কেবল সাধক নহেন, কিন্তু সিদ্ধ মহাপুরুষ ছিলেন। তাঁরা অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে যে তত্ত্বের প্রত্যক্ষ ও রসের উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহাকেই বাহিরে ফুটাইতে যাইয়া এই সকল প্রতিমার প্রকাশ করিয়াছিলেন। কেবল ভিতরে, কেবল সমাধিতে সে বস্তুকে দেখিয়া তাঁদের তৃপ্তি হয় নাই। সমাধি ত দেহীর নিত্য অবস্থা নহে। সমাধি ভাঙ্গিলেই ইষ্ট-দেবতার সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়। এই বিচ্ছেদের কালে তাঁহাকে ইন্দ্রিয় সমক্ষে জাগাইয়া রাখিবার জন্যই এই সকল রূপ-কল্পনা হইতে লাগিল। যাঁরা রূপ-কল্পনা করিলেন তাঁরা প্রথমে নিজের সাধনের জন্যই ইহা করেন, অপরের জন্য নহে। এই কল্পিত রূপ তাঁহাদের সম্ভোগের বস্তু হয়। ভক্ত আপনার ইষ্টদেবতাকে কেবল প্রাণের ভিতরে দেখিয়াই পরিপূর্ণ তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন না। আপনার সাধনের ধনকে কেবল ধ্যান ও সমাধিতে পাইয়াই তাঁর সাধ মিটে না। সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তিনি তাঁহাকে ভোগ করিবার জন্য ব্যাকুল হন। যে ইন্দ্রিয়-চেষ্টার একান্ত নিবৃত্তি করিয়া প্রথমে

তিনি আপনার ইষ্টদেবতার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন, পরে অন্তরে অন্তরে তাঁর সঙ্গে নিগূঢ় আলাপ পরিচয় হইলে, বাহিরেও, সেই সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই তাঁহাকে ধরিতে ছুঁইতে না পারিলে তাঁর আনন্দ ও তৃপ্তি যেন পরিপূর্ণ হয় না। সকল প্রেমের সম্বন্ধে-তেই এটি হইয়া থাকে। প্রণয়যুগল প্রথমে নিভৃতে, দু'জনার একাকিত্বের মধ্যে, একান্ত অব্যবহিতভাবে পরস্পরকে পাইতে চাহে। তখন বাহিরের সম্বন্ধ সকল প্রেম-সম্ভোগের অন্তরায় বলিয়া মনে হয়। তখন অপর কাহারও দৃষ্টি তাঁহাদের সহ্য হয় না। কিন্তু ক্রমে এমন সময় আইসে যখন বিশ্বের মাঝে, বিশ্বের জনসঙ্ঘের সঙ্গে একাত্ম হইয়া, তাঁরা নিজেদের প্রিয়তমকে দেখিতে চাহে। নিভৃতে প্রিয়তমকে নিজের হাতে সাজাইয়া, একেলা সেরূপ দেখিয়া তাঁদের আর তৃপ্তি হয় না ; জগতকেও দেখাইতে ইচ্ছা হয়। সকল প্রেমিকের মধ্যেই এক সময়ে না এক সময়ে প্রেমের এই বহির্মুখী-নতা প্রকাশ পাইয়া থাকে। অন্তরের সম্ভোগকে বাহিরে প্রকাশ করিবার ব্যাকুলতা সাধারণ প্রেম-ধর্ম্ম। এই ব্যাকুলতা কবিদিগের মধ্যে সর্বদাই দেখিতে পাই। এই ব্যাকুলতা সাধকেরও হয়। আর প্রেমিক, সাধক, কবি ইহাঁরা সকলে যে একই-জাতীয় জীব। কবি প্রাণের ভিতরে যে রূপের বা রসের সাক্ষাৎকার লাভ করেন, তাহাকে বাহিরে ফুটাইবার জন্য অস্থির হইয়া পড়েন। এ অস্থিরতা, এ বেদনা প্রসূতির প্রসব-বেদনার মতন। এ ব্যাকুলতা, এ বেদনা সৃষ্টির অলঙ্ঘ্য বিধান। এ বেদনা প্রেমিকে জানেন। এ বেদনা কবি জানেন। এ বেদনা সাধকেও ভোগ করিয়া থাকেন। এই বেদনার মধ্য দিয়াই কবির অন্তরের রসমূর্ত্তি শব্দে ও বর্ণে, ছন্দে ও সঙ্গীতে বাহিরে ফুটিয়া উঠে। ইহারই ভিতর দিয়া সাধকের ধ্যান-মূর্ত্তি প্রতিমার রূপে আবির্ভূত হন। বাঙ্গালীর প্রতিমা-পূজার মর্ম্ম বুঝিতে হইলে প্রেম-ধর্ম্মের এই সাধারণ প্রকৃতিটি পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইবে।

ভাবাঙ্গ গঠন ও প্রতিমার সৃষ্টি।

প্রেমিক, কবি, সাধক সকলেই আপনাপন প্রাণের এই রস-বস্তুকে বাহিরে প্রতিষ্ঠা করিতে চান বটে, কিন্তু পারেন না। এ যে বাহিরের বস্তু নয়। এই রূপ যে অতীন্দ্রিয়। এই লাবণ্য যে ভাবের, বর্ণের নহে। এই সৌন্দর্য্য যে রসের, গঠন-পারিপাট্যের নহে। এ বস্তু অনঙ্গ, ভাবাঙ্গেতেই কেবল ফুটিয়া উঠে। সে ভাবাঙ্গের পরিপূর্ণ আলোক-চিত্র বা ফটোগ্রাফ তুলিতে পারে এমন যন্ত্র দুনিয়ায় নাই। মা আপনার মর্ম্মপটে সন্তানের যে রূপ দেখেন, বাহিরের চিত্রপটে তাহাকে পরিপূর্ণরূপে ফুটাইয়া তোলেন, এ শক্তি বিধাতা তাঁহাকে দেন নাই। প্রেমিক-প্রেমিকা প্রাণ-পটে আপনার প্রেম-পাত্রীর বা প্রেম-পাত্রের যে রূপ প্রত্যক্ষ করেন, কোনও চিত্র-পটে তাহাকে নিঃশেষে অঙ্কিত করিতে পারেন না। কবি আপনার প্রাণের ভিতরে যাহা দেখেন, এমন শব্দ ও ছন্দ আজিও জগতে আবিষ্কৃত হয় নাই, যাহার দ্বারা সে-বস্তুর পরিপূর্ণ মূর্ত্তি ফুটাইতে পারা যায়। এইজন্য রসমূর্ত্তি মাত্রেই একটা অতৃপ্তি জাগাইয়া রাখে। এরাজ্যে ব্যর্থ চেষ্টাই সার্থক, নিষ্ফল প্রয়াসই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সফলতা লাভ করে।

সংসারের রসের সম্বন্ধসকল বিশিষ্ট-আধারকে ধরিয়া ফুটে; কিন্তু এসকল আধারকে ছাপাইয়া উঠে। সাগর-দৃশ্যে যেমন ভিন্ন ভিন্ন তরঙ্গগুলি দিগন্ত-প্রসারিত হইয়া ক্রমে অনন্ত আকাশের গায়ে মিলিয়া মিশিয়া যায়, মানুষের রসের সম্বন্ধ সকলও সেইরূপ বিশিষ্টকে ধরিয়া গড়িয়া উঠে, কিন্তু গড়িতে গড়িতেই ক্রমে নির্ব্বিশেষে যাইয়া মিশিয়া পড়ে। মাতার স্নেহ ক্ষুদ্র শিশুকে ধরিয়াই প্রথমে ফুটে, কিন্তু ক্রমে বাৎসল্যের অলখনিরঞ্জন বিশ্বরূপেতে যাইয়া মিশিয়া যায়। তখন সকল সন্তান, বিশ্ব সন্তান তাঁর বাৎসল্যের মূর্ত্তি হইয়া উঠে। কিন্তু এ

ত মূর্ত্ত নহে। বিশিষ্ট সন্তানই মূর্ত্ত, সাকার; বিশ্ব-সন্তান একই সঙ্গে মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত, সাকার ও নিরাকার। প্রথমে যে আধারকে আশ্রয় করিয়া সন্তানের মাতৃভক্তি জাগিয়া উঠে ও বাড়িতে থাকে, তাহা বিশিষ্ট বস্তু, সন্দেহ নাই। এ যে আমার মা। প্রথমে কারও সঙ্গে ভাগাভাগি সহ্য হয় না। আর কেউ তাকে মা বলিয়া ডাকিলে প্রাণ জ্বলিয়া উঠে। কিন্তু ক্রমে যখন সন্তান আপনার ভক্তিবলে প্রাণের মধ্যে মাকে পরিপূর্ণভাবে পায়, তখন তার এই বিশিষ্ট জননীর মধ্যে সে বিশ্ব-জননীকে পাইবার জন্য ব্যাকুল হয়। এক কণ্ঠে মা বলিয়া তার প্রাণ জুড়ায় না। জগৎ-জোড়া সে মা-নাম শুনিতে চায়। তখন দুনিয়ার লোককে ডাকিয়া, মা ডাক শুনিবার জন্য তার প্রাণ অস্থির হইয়া উঠে। তখন তার বাহিরের মাতৃরূপ অন্তরের মধ্যে বিশ্বমাতারূপে ফুটিয়া উঠেন। তখন সে যে মাতৃমূর্ত্তি আঁকিতে চায়, তাহা কেবল তার নিজের মা নয়, সকলের মা। কেবল মানুষের মা নয়, সকল জীবের মা। সকল সৃষ্টির মা। এই মা মূর্ত্তও নহেন, অমূর্ত্তও নহেন। এই মাকে সাকারও বলিতে পারি না, নিরাকারও বলিতে পারি না। এই মা একই সঙ্গে মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত; সাকার ও নিরাকার। মূর্ত্তকে ছাড়িয়া অমূর্ত্ত শূন্য, মিথ্যা, বন্ধ্যাপুত্রবৎ অলীক-কল্পনা। অমূর্ত্তকে ছাড়িয়া মূর্ত্ত অপূর্ণ, অর্থহীন, শুষ্ক জড়পিণ্ড, মৃত্যুর ক্রীড়নক মাত্র, অমৃতের প্রেরণা তাহাতে পাওয়া যায় না। সত্য যাহা, বস্তু যাহা, তাহা যুগপৎ মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত, সাকার ও নিরাকার। যতটুকু যখন প্রকাশিত হয় ততটুকুই তখন মূর্ত্ত ও সাকার; আর যাহা প্রকাশিত হয় না, তাহা সর্ব্বদাই অমূর্ত্ত ও নিরাকার। কিন্তু প্রকাশ যাহা হইয়াছে ও হইতেছে, তাহাকে ছাড়িয়া তার পেছনে যাহা অপ্রকাশিত আছে, তার কোনও সন্ধান পাওয়া সম্ভব কি? প্রকাশ ও সত্তা, রূপ ও স্বরূপ, গতি ও শক্তি, আবির্ভাব ও ভাব, মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত, সাকার ও নিরাকার, সসীম ও অসীম, এ সকল একে অন্যকে

ছাড়িয়া কদাপি থাকে না। এই যুগ্ম বস্তুকেই প্রাচীন ব্রহ্মবাদীগণ ছায়াতপের ন্যায় বর্ণনা করিয়াছেন।

বিশিষ্ট সন্তান মূর্ত্ত; বিশ্ব-সন্তান অমূর্ত্ত। বিশিষ্ট জননী মূর্ত্ত, বিশ্ব-জননী অমূর্ত্ত। বিশিষ্ট সখা মূর্ত্ত, বিশ্ব-সখা অমূর্ত্ত। বিশিষ্ট নায়ক ও বিশিষ্ট নায়িকা মূর্ত্ত, বিশ্ব-নায়ক ও বিশ্ব-নায়িকা অমূর্ত্ত। এক ও এক যোগ করিয়া যেমন দুই হয়, এভাবে ভিন্ন ভিন্ন সন্তান বা মাতা, সখা বা প্রণয়ী-প্রণয়িণীকে যোগ করিয়া তাদের যোগফল-রূপে বিশ্ব-সন্তান বা বিশ্ব-মাতা বা বিশ্ব-সখা বা বিশ্ব-নায়ক বা বিশ্ব-নায়িকা প্রকাশিত হয় না। গণিতের পথে এই বিশ্ব-বস্তুর সন্ধান মিলে না। সে পথ জীবনের পথ। ইহার সঙ্কেত গণিতে নাই, জীব-তত্ত্বেই কেবল ইহার আভাস পাওয়া যায়। ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে এক করিয়া তাদের যোগফলরূপে জীববস্তুকে বা জীবন-বস্তুকে পাওয়া যায় না। এই জীবন প্রত্যেক অঙ্গের মধ্যে, অথচ প্রত্যেক অঙ্গকে ছাড়াইয়া, সকল অঙ্গসমষ্টির মধ্যে অথচ সে সমষ্টিকে অতিক্রম করিয়া আছে। এই জীবনের ছাপ প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উপরে আছে। এই জীবনের প্রেরণায়, এই জীবন-বস্তুকে পরিপূর্ণ করিবার জন্যই ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা হয় এ বস্তু সকলের নিয়ামক, সকলের নিয়তি, অঙ্গসকল এই অনঙ্গ বস্তুকেই প্রকাশ করে, এই অনঙ্গ বস্তুকে পাইয়াই অঙ্গের সার্থকতালাভ হয়। বিশ্ব সন্তান, বিশ্ব-মাতা, বিশ্ব-সখা, বিশ্ব-নায়ক ও বিশ্ব-নায়িকা সম্বন্ধেও ইহাই খাটে। প্রত্যেক বিশিষ্ট সন্তান, মাতা, সখা ও প্রণয়ী-প্রণয়িণীর মধ্যে এই বস্তু আছে। এই বস্তুকে প্রত্যেক বিশিষ্ট সন্তানাদি প্রকাশ করে, কিন্তু কেহই নিঃশেষ করিতে পারে না। এই অমূর্ত্ত রসবিগ্রহই সন্তানাদির ছাঁচ, তাহাদের বিকাশ-গতির নিয়ন্তা। ইহাই বাৎসল্যাদি রসের সার্থকতালাভের এক ও অনন্য নিদান। সখ্যবাৎ-সল্যাদির রসমূর্ত্তিসকল এই অমূর্ত্ত রসবিগ্রহকেই ফুটাইতে চেষ্টা করে।

বৈদিক দেব-বাদ ও উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞান।

এজগতের সর্ব্বত্র বিশিষ্টে ও বিশ্বজনীনে, মূর্ত্তে ও অমূর্ত্তে, সাকারে ও নিরাকারে, রূপে ও স্বরূপে এই অদ্ভুত মাখামাখি রহিয়াছে। আর বিশিষ্টের মধ্যে বিশ্বজনীনকে, মূর্ত্তের মধ্যে অমূর্ত্তকে, সাকারের মধ্যে নিরাকারকে, রূপের মধ্যে স্বরূপকে ধরিবার চেষ্টা করিতে যাইয়াই মানুষ তার যাবতীয় ধর্ম্ম, নীতি, বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্প ও সাহিত্যকে গড়িয়া তুলিয়াছে। অতি আদিকালে মানবের শৈশব সাধনা মূর্ত্তের মধ্যেই অমূর্ত্তকে নিঃশেষে ধরিতে যাইয়া ইন্দ্র-বরুণ, ইলোহিম-জিহোভা, অহ্রিমান-অহুর্মজদা প্রভৃতি পুরাতন দেবতার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। ইন্দ্রবরুণাদি চাক্ষুষ দেবতা ছিলেন। কিন্তু চাক্ষুষ হইলেও, তাঁদের সবটা মানুষ দেখিতে পাইত না। যাহা দেখিত তার মধ্যেও একটা রহস্য জাগিয়া থাকিত। তখন এসকল চাক্ষুষ দেবতার মধ্যে ঐ রহস্যটুকুই অতীন্দ্রিয়ের ও অমূর্ত্তের সঙ্কেতটি জাগাইয়া রাখিত। ক্রমে মূর্ত্ত হইতে অমূর্ত্ত, চাক্ষুষ হইতে অচাক্ষুষ, যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তাহা হইতে যাহা ইন্দ্রিয়াতীত পৃথক হইয়া পড়িল। তখন মানুষের ভেদবুদ্ধি প্রবল হইয়া উঠিল। সে হাঁ ও না'র রাজ্যে গিয়া উপস্থিত হইল। যাহা হাঁ, তাহা না নয়; যাহা সৎ তাহা অসৎ নয়, যাহা নৃত তাহা অনৃত নয়, যাহা মর্ত্ত্য তাহা অমৃত নয়, যাহা পরিণামী তাহা নিত্য নয়, এইভাবে সে দুনিয়াটাকে কাটিয়া চিরিয়া ভাগ করিল। দেবতাকে খুঁজিতে যাইয়া সে যাহা কিছু দেখে, তাহাকেই তখন নেতি নেতি বলিয়া বিদায় দিতে লাগিল। না-টা তখন হাঁ অপেক্ষা প্রবল হইয়া উঠিল। প্রত্যক্ষ অসৎ; এই আছে, এই নাই। অপ্রত্যক্ষ অজ্ঞেয় কিম্বা শুদ্ধ সত্তামাত্র-জ্ঞেয়। এইজন্য অমূর্ত্তকে মূর্ত্ত হইতে, স্বরূপকে রূপ হইতে, অতীন্দ্রিয়কে ইন্দ্রিয়জগত হইতে একান্ত পৃথক করিতে যাইয়া, মানুষ এক মহাশূন্যে, এক প্রলয় অন্ধকারে পড়িয়া গেল। এই অন্ধকারে ও মহাশূন্যে তার প্রাণ হাহাকার করিতে লাগিল বটে, কিন্তু জ্ঞান পরিষ্কার

হইল। আদিতে সে রূপের আর স্বরূপের প্রভেদ বুঝে নাই। এবারে বুঝিল, রূপ আর স্বরূপ ভিন্ন বস্তু। তবে বিবেক জাগিল বটে, কিন্তু প্রাণ জুড়াইল না। তখন সে সেই মহা-শূন্য-সিন্ধু মন্থন করিয়া, তাহা হইতে সকল রূপের সার শ্রীকে ও সকল রসের নিদান অমৃতকে তুলিল। ব্যতিরেকী পথে যাইয়া মানুষ নিরাকারে, অরূপে, শূন্যে পৌঁছিয়াছিল। এবারে ফিরিয়া অন্বয়ী পন্থা ধরিয়া আসিয়া সকল আকারকে সেই নিরাকারের দ্বারা, সকল রূপকে সেই অরূপের দ্বারা, সকল শূন্যকে সেই পরিপূর্ণের দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া তুলিল। আমাদের প্রাচীন উপনিষদের সাধক এই অবস্থালাভ করিয়া বলিয়া উঠিলেন—

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ

ঈশ্বরের দ্বারা এই চঞ্চল বিষয়-রাজ্যকে আচ্ছাদন করিয়া তিনি এই ঈশ্বরের সঙ্গে যাবতীয় কাম্যবস্তু ভোগ করিতে লাগিলেন। তাহার এই শ্লোক হইল—

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। যো বেদো নিহিতং গুহায়াং
পরম ব্যোমন্। সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ।
ব্রহ্মণা বিপশ্চিতেতি।

সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্ত ব্রহ্মকে যিনি আপনার নিগূঢ়তম অন্তরের শ্রেষ্ঠ আকাশে নিহিত জানিয়াছেন, তিনি এই সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মের সঙ্গে যুক্ত হইয়া সমুদায় কাম্যবস্তু ভোগ করেন।

ভক্তি-সাধন ও রসমূর্ত্তি।

কিন্তু ইহাতেও তাঁর সকল আশা পূরিল না, সকল সাধ মিটিল না। ইহাতে বিষয়রস শুদ্ধ, নির্ম্মল, ভক্তিসিক্ত হইল মাত্র। কিন্তু যাঁহার রসের কণামাত্র পাইয়া এবিষয় এমন মিষ্ট হইয়াছে, তাঁহাকে ভাল করিয়া, প্রাণ ভরিয়া আস্বাদন করা গেল না। পরম সুন্দর যিনি, যাঁর সৌন্দর্য্যের ক্ষণপ্রভার ক্ষণিক আভা পাইয়া জগতের সকল সুন্দর

বস্তু অমন মিষ্ট হয়, তাঁর সাক্ষাৎকারলাভ হইল না। অন্তরের মধ্যে, প্রাণের ভিতরে, মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিলেও, চক্ষে তাঁহাকে দেখা গেল না। অথচ চক্ষুর ঐটীই গভীরতম পিপাসা। চক্ষু চারিদিকে সেই অলখনিরঞ্জনের রূপই যে খুঁজিয়া বেড়ায়। যতক্ষণ মনে করে এই মুখে, এই দেহে, এই বিগ্রহে, এই আধারে সেই রূপ লুকাইয়া আছে, ততক্ষণ লুব্ধ মধুপের মতন চক্ষু নির্নিমেষে তাহার উপরে বসিয়া থাকে। দর্শনে ধ্যানে তাহাতেই ডুবিয়া রহে। কিন্তু যখন দেখিল, এই রূপে সেই রূপ নিঃশেষে লুকাইয়া নাই, তখন ইহাকে ছাড়িয়া অন্যমুখে যাইয়া বসিল। ইহাই ত জীবের ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্যের কারণ। ইন্দ্রিয় যাহা চায়, তাহা পায় না বলিয়াই ত এরা অমন উড়ো উড়ো ভাবে অস্থির হইয়া বিষয়ে বিষয়ে ঘুরিয়া মরে। ভিতরে পাইয়া সাধ পূরিল না। বাহিরে ঘুরিয়াও প্রাণ জুড়াইল না। তখন সাধক ভিতর-বাহির এক করিবার জন্য অস্থির হইলেন। তখন তিনি রূপে ও অরূপে, মূর্ত্তে অমূর্ত্তে, সাকারে ও নিরাকারে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যে ও অতীন্দ্রিয়ে, সজাগে ও সমাধিতে মাখামাখি করিয়া আপনার ইষ্ট-মূর্ত্তি রচনা করিতে আরম্ভ করেন।

আদিতে দৃষ্টে ও অদৃষ্টে, চাক্ষুষে ও অচাক্ষুষে, সাকারে ও নিরাকারে, সসীমে ও অসীমে, মূর্ত্তে ও অমূর্ত্তে একটা মাখামাখি ছিল। বৈদিক দেব-পিতৃবাদে শৈশব-জীবনের সেই স্মৃতি লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। সে মাখামাখি ছিল অল্পজ্ঞানের ভূমিতে। তখন বিবেক জাগে নাই। আত্মা ও অনাত্মার ভেদজ্ঞান পরিস্ফুট হয় নাই। সে মাখামাখি ছিল প্রদোষের আধা-আলো আধা-আঁধারের সৃষ্টি। এ মিশামিশি তাহা নহে। এখানে জ্ঞান পূর্ণ হইয়াছে। এখানে অনাত্মে আত্মভ্রম, আত্মাতে অনাত্মবুদ্ধি নাই। এ মাখামাখি অজ্ঞানতার বা অল্প-জ্ঞানের সৃষ্টি নহে। ইহা রসের সৃষ্টি। এখানে রসে মাখামাখি হইয়া জড় ও চেতন, চাক্ষুষ ও অচাক্ষুষ, মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত, সাকার ও নিরাকার এক হইয়াছে।

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং—

ঈশ্বরের দ্বারা এই সকলকে আচ্ছাদন করিতে হইবে—এখানকার উপদেশ এ নয়। এখানকার কথা—এই সকলের দ্বারা ঈশ্বরকে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। এখানকার কথা এ নয় যে "সকল কামনাকে ব্রহ্মের সঙ্গে ভোগ করিবে।" এখানকার কথা—"ব্রহ্মকে সকল কামনার সঙ্গে ভোগ করিবে।" পূর্ব্বকার কথা ছিল—অরূপের দ্বারা রূপকে ভোগ করিবে। এখনকার কথা হইল—রূপের দ্বারা অরূপকে ধরিবে। পূর্ব্বকার কথা ছিল—অশব্দের দ্বারা শব্দকে, অরসের দ্বারা রসকে, অগন্ধের দ্বারা গন্ধকে, অস্পর্শের দ্বারা স্পর্শকে অতিক্রম করিয়া যাইবে। এখনকার কথা হইল—শব্দের দ্বারা অশব্দকে প্রবুদ্ধ করিবে; রসের দ্বারা অরসকে পূর্ণ করিবে; গন্ধের দ্বারা অগন্ধকে ফুটাইবে; স্পর্শের দ্বারা অস্পর্শকে প্রাণের মর্ম্মে মর্ম্মে টানিয়া ধরিবে। কোথায় আনিলে, ঠাকুর! এ উল্টাপথে চলি কেমন করিয়া? অসহায় সাধকের আর্ত্ত প্রার্থনাতে ভক্তবৎসলের বাঁশী বাজিয়া উঠিল। ইন্দ্রিয়ের বনে বনে, হৃদয়ের কুঞ্জে কুঞ্জে পশিয়া, সে বংশীধ্বনি প্রাণ-যমুনাকে উজান বহাইতে লাগিল। তখন অরূপে রূপ ফুটিল, অশব্দে শব্দ জাগিল, অগন্ধে গন্ধ বহিল, নিরাকারে আকার গড়িয়া উঠিতে লাগিল। এ আকার জড় নহে, মানস-বস্তু! ইহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে, শুদ্ধ ধ্যানগম্য। আর এ আকারও হঠাৎ ফুটে না, তিলে তিলে অদৃশ্য হইতে দৃষ্টিপটে ফুটিতে আরম্ভ করে।

ছবি ফুটাইতে হইলে, প্রথমে পট প্রস্তুত করিতে হয়। পটে আগেকার যদি কিছু দাগ, লেখা বা রং থাকে, সকলের প্রথমে তাহা ধুইয়া মুছিয়া ফেলিতে হয়। পটখানিকে শাদা করিতে হয়। তার পরে তাহাকে এক-রঙ্গা করা আবশ্যক হয়। ইষ্ট-মূর্ত্তির প্রকাশের পূর্ব্বে সাধকের চিত্তপটও এরূপ এক-রঙ্গা হইয়া থাকে। তখন সর্ব্বজীবে সাধকের ব্রহ্মভাবের উদয় হয়। স্থাবর-জঙ্গম সমু-

দায়ের উপরে একটা অভূতদৃষ্ট আলোর আভাস পড়ে। তখনই সাধক

স্থাবর জঙ্গম দেখে, দেখে না তার মূর্ত্তি।
যাঁহা নেত্র পড়ে, হয় ইষ্ট দেব স্ফূর্ত্তি॥

এখনও কিন্তু ভাব গাঢ় হয় নাই। চক্ষে নূতন রসের কাজল মাখিয়াছে মাত্র। দৃষ্টি খুলিয়াছে, কিন্তু সৃষ্টি আরম্ভ হয় নাই। সমাধিতে সাধক তত্ত্ববস্তুর সাক্ষাৎকারলাভ করেন। সমাধি ভাঙ্গিলে যখন তাঁর মনবুদ্ধি প্রভৃতি আবার বিষয়-রাজ্যে ফিরিয়া আসে, তখন কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত সেই সমাধির নেশা তাঁর চক্ষে লাগিয়া থাকে। এই অবস্থাতেই বৈষ্ণব মহাজন-পদে শ্রীরাধার তমাল দেখিয়া কৃষ্ণ-ভ্রম হইয়াছিল। এখানে তত্ত্ববস্তুর অরূপত্ব দূর হইয়া, সর্ব্বরূপত্ব লাভ হইয়াছে মাত্র। এখানে ভাব ফুটিয়াছে, ভাব গাঢ়, ঘন হই-য়াছে; কিন্তু এখনও ভাবাঙ্গ গড়িতে আরম্ভ করে নাই। অনুভব হইতে ভাব ফুটে। ভাবাঙ্গ গড়ে কেবল অনুভূতি নয়, কিন্তু কল্পনা। কল্পনা অনুভূতিকে লইয়া, ভাবেতে অঙ্গযোজনা করিতে আরম্ভ করে। ধ্যানে, সমাধিতে সর্ব্ব-মাতৃত্বের অনুভব হইল। সমাধিভঙ্গে প্রথমে যার উপরে চক্ষু পড়ে, তাকেই মা বলিয়া মনে হইতে লাগিল। কিন্তু ইন্দ্রিয়সকল সম্পূর্ণ সজাগ হইয়া উঠিলে, এভাব রক্ষা করা কঠিন হইল। ভেদ-জ্ঞান জন্মান ইন্দ্রিয়ের সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম। অথচ প্রাণ সেই সর্ব্বমাতৃরূপকে চাক্ষুষ করিবার জন্য আকুল হইল। কল্পনা তখন সর্ব্বমাতৃরূপ গড়িতে লাগিল। এই ভাবেই মাতৃ-প্রতিমার উৎপত্তি হইল। সাধক পরের জন্য নয়, নিজের প্রাণের দায়ে, আপনার গভীরতম অন্তরঙ্গ অনুভূতিকে আশ্রয় করিয়া, অচাক্ষুষ তত্ত্বকে চাক্ষুষ করিবার চেষ্টায়, অতীন্দ্রিয় বস্তুকে সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা সম্ভোগ করিবার লালসায়, কল্পনা-সহায়ে মানস-মূর্ত্তি রচনা করেন। এটি ভক্তিপন্থার সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম। নিতান্ত নিরাকার-বাদীগণ পর্য্যন্ত এপথে চলিতে যাইয়া ব্রহ্মের মানস-মূর্ত্তি রচনা

করেন। নিরাকারের উপাসক যখন আপনার ইষ্টদেবতাকে "পিতা নোঽসি" বলিয়া প্রণাম করেন, অথবা উপাসনা-কালে "মা"! "মা"! বলিয়া চক্ষুজলে মুখ-বুক ভাসাইয়া দেন; তখন বস্তুতঃ ব্রহ্মের একপ্রকার মানস-রূপ কল্পনা করিয়া থাকেন। পিতা, মাতা, সখা, প্রভৃতি বস্তু নিরাকার নহে; আর পিতৃত্ব, মাতৃত্ব, সখিত্ব প্রভৃতিও সাকার পিতা, মাতা, বা সখা, প্রভৃতিকে ছাড়িয়া কোথাও প্রকাশিত হয় না। মার রূপ হইতে যখন আমরা মাতৃত্ব ধর্ম্মকে পৃথক্ করিয়া ভাবি, তখনও একটা কল্পিত বস্তুর সৃষ্টি করি। আবার এই যে বিশিষ্ট মাতা বা পিতা বা সখা, ইহাঁদের প্রত্যক্ষ স্নেহাদির অভিজ্ঞতা ও অনুভূতিকে আশ্রয় করিয়া যখন বিশ্ব-মাতা বা বিশ্ব-পিতা বা বিশ্ব-সখার কথা ভাবিতে থাকি, তখনও মানস-কল্পনার সৃষ্টি করি। সুতরাং এক গভীর সমাধিতে যে সত্য স্বরূপ-উপাসনা হয়, তাহা ছাড়া—যখন, যে ভাবেই, আমরা ব্রহ্মোপাসনা করিতে চেষ্টা করি না কেন, কিছুতেই এই মানসকল্পনার হাত এড়াইতে পারি না। তবে আমরা যাহাকে সচরাচর নিরাকারোপাসনা বলি, তাহাতে এই মানস-কল্পনা হাল্‌কা, বিমানচারী হয়; তাহাতে ভাব মাত্র ফোটে, ভাবাঙ্গ গড়িতে পারে না। এই মানস-কল্পনাই আর একটু বস্তুতন্ত্র, আর একটু গভীর ও গাঢ় হইলেই প্রতিমারূপে গড়িয়া উঠে। আধুনিক কালের নিরাকারোপাসনার অন্যতম প্রধান আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র এইটি বুঝিয়াছিলেন। তাই বাঙ্গালীর প্রতিমা-পূজার ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন—সাধক দেখিলেন প্রাণের মধ্যে মাকে, ডাকিলেন ভাবা-বেগে—"মা"! "মা"! দাঁড়াইয়াছিল কুমার তাঁর নিকটে, সে গড়িল অমনি প্রতিমা।

ইহাই বাঙ্গালীর প্রতিমা-পূজার ভিতরকার ইতিহাস। এইজন্যই বাঙ্গালী যেসকল প্রতিমার পূজা করে, তাহাকে বেদান্তের সম্পদুপাসনাও বলা যায় না, প্রতীকোপাসনাও বলা যায় না। ইহা একটা স্বতন্ত্র বস্তু। ইহা প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মজ্ঞানের পূর্ব্বকার

কথা নয়, পরের কথা। ইহা ব্রহ্মজ্ঞানের সাধন নহে; ব্রহ্মজ্ঞানের সম্ভোগ। জ্ঞানের দ্বারা অথবা অজ্ঞানের দ্বারা ইহার প্রতিষ্ঠা হয় নাই; ভাবের দ্বারা, রসের দ্বারা, ভক্তির দ্বারা এই সকল গড়িয়া উঠিয়াছে। অজ্ঞানী, অভক্তের হাতে পড়িয়া এসকল প্রতিমা-পূজার অশেষ দুর্গতি হইয়াছে, ইহা অস্বীকার করা অসম্ভব। সিদ্ধপুরুষের অধিকারে যে বস্তুর প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, কেবল অসিদ্ধ নহে, কিন্তু অপ্রবর্ত্ত অজ্ঞ লোকের হাতে পড়িয়া তার অশেষ প্রকারের কদর্থলাভ হইয়াছে, ইহা সত্য। এই জন্যই এগুলি ভক্তি-সাধনের সহায় না হইয়া অনেক স্থানে অন্তরায় হইয়া উঠিয়াছে। এই জন্যই এগুলি ইন্দ্রজালের মতন হইয়াছে এবং লোকের ধর্ম্মকে প্রাণহীন করিয়া তুলিয়াছে। এ সকল স্বীকার করিতে হয়। এই দিক্ দিয়া এসকল প্রতিমা-পূজার প্রতিবাদ করা, এগুলিকে বর্জ্জন করা, ধর্ম্মের হিসাবে প্রয়োজন হইয়াছে। এই জন্যই এগুলিকে একবার বর্জ্জন না করিলে, সংস্কারের কুজ্ঝটিকা কাটিতে পারে না। আর সংস্কার কাটাইয়া না উঠিতে পারিলে, সত্যের ও তত্ত্বের সাক্ষাৎকার-লাভও অসাধ্য। কৃত্রিম, কল্পিত বৈজ্ঞানিক-ব্যাখ্যা দ্বারা অনধিকারীর জন্য এগুলিকে এযুগে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা কেবল নিষ্ফল নহে; কিন্তু অত্যন্ত অনিষ্টকরও হইবে হইবেই। এখন মনস্তত্ত্বের বা Psychologyর দিক্ দিয়াই এসকলের বিচার-আলোচনা করা আবশ্যক। আর তাহা করিতে যাইয়াই দেখি যে এসকল প্রতিমা-পূজার যে ব্যাখ্যা কিছু দিন হইতে শুনিয়া আসিতেছিলাম, তাহা সত্য নহে। এ প্রতিমা-পূজা জ্ঞানসাধনের সহায় নহে, ভক্তির সৃষ্টি ও ভক্তি সাধনের অবলম্বন।

ভক্তির পথ রসের পথ। সুতরাং রস-কলা মাত্রেই ভক্তি-সাধনের অঙ্গ। বিশেষতঃ বাঙ্গালার ভক্তিসাধন বহুদিন হইতেই এই রসের পথ ধরিয়া চলিয়াছে। এইজন্য বাঙ্গালার প্রধান ভক্তি-শাস্ত্র ও ভক্তিসাধন "সাহিত্য-দর্পণ", "কাব্য-প্রকাশ" প্রভৃতি রস-শাস্ত্রের

উপরেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবমণ্ডলীর "উজ্জ্বল নীলমণি" একই আধারে রসতত্ত্ব এবং ভক্তিতত্ত্ব দু'ই। আর "ভক্তিরসামৃতসিন্ধু" প্রভৃতি ভক্তিগ্রন্থ এই রসতত্ত্বেরই সাধনাদি প্রচার করিয়াছেন। এ পথ শাক্তের পথ নহে, ইহা সত্য। সাক্ষাৎভাবে শক্তি-উপাসনা এই রসতত্ত্বের উপরে গড়ে নাই, ইহা জানি। কিন্তু বাঙ্গালার শক্তি-উপাসকেরা যে ভক্তিসাধন করিয়াছেন, পরোক্ষভাবে তাহার উপরে এই ভক্তিতত্ত্বের ও ভক্তিপথের প্রভাব যে খুবই পড়িয়াছে, ইহাও অস্বীকার করা যায় না। আর এই জন্যই বাঙ্গালীর প্রতিমা-পূজার মধ্যে এমন একটা বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাই, যাহা অন্যত্র পাওয়া যায় বলিয়া জানি না।

বাঙ্গালী যে প্রতিমার পূজা করে, তাহাকে বেদান্তের পরিভাষায়, এই জন্যই, প্রতীকোপাসনাও বলিতে পারা যায় না, সম্পদুপাসনাও বলিতে পারা যায় না। প্রতিমা প্রতীক নহে। শালগ্রাম প্রতীক। শালগ্রামে নারায়ণ-বুদ্ধি ধ্যান করিয়া জাগাইতে হয়। দেখিবামাত্র তাহাতে দেবতাজ্ঞান বা ব্রহ্মবুদ্ধি জন্মে না, শিলাজ্ঞানই জাগ্রত হয়। শালগ্রামে শিলাজ্ঞানই বস্তুতন্ত্র, দেবতাবুদ্ধি কল্পিত, "অন্যত্র দৃষ্টঃ পরত্রাবভাসঃ"। এই জন্য শালগ্রাম-পূজা প্রতীকোপাসনা। দুর্গোৎসবেও প্রতীক আছে। সে প্রতীক নবপত্রিকা। নবপত্রিকার মন্ত্রই তার প্রমাণ। যুগ্মবিল্বফলযুক্ত বিল্বশাখা এই নবপত্রিকার দেহ। এই শ্রীফলবৃক্ষ "অম্বিকায়াঃ সদা প্রিয়ঃ"। এই শ্রীফল-শাখাতে দুর্গার অধিষ্ঠান কল্পিত হইয়া, তাহা দুর্গার প্রতীকরূপে পূজিত হয়। এই নবপত্রিকা-পূজা দুর্গার প্রতীকোপাসনা। কিন্তু দুর্গা-প্রতিমা প্রতীক নহে। সম্পদও নহে। তাহা রূপক মাত্র। দুর্গা বিশ্বমাতা, "জগতাং ধাত্রীং"। ত্রিজগতের ধাত্রী, বিশাল বিশ্বের জননীরূপেই দুর্গার ধ্যান হয়।

অষ্টাভিঃ শক্তিভিস্তাভিঃ সততং পরিবেষ্টিতাম্।
চিন্তয়েজ্জগতাং ধাত্রীং ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদাম ॥

এ ধ্যান ত সকলেই করিতে পারে। এভাবে যে সৃষ্টির পরম-তত্ত্বকে না দেখিল, সে ত কিছুই দেখিল না। উপনিষদের নিরাকার ব্রহ্মজ্ঞানও ত এই বস্তুকে বা তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করে। "যেন জাতানি জীবন্তি"—বলিয়া ভৃগুবারুণি সংবাদে এই "জগতাং ধাত্রী"-কেই ত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। আর এই তত্ত্ববস্তু স্বকীয় শক্তির দ্বারাই ত সৃষ্টি প্রসব, রক্ষা ও প্রত্যাহার বা সংহার করিয়া থাকেন। শক্তি ও শক্তিমান, গুণ ও গুণী একই সত্তা ও একই সত্য, দুই নহে; ইহা স্বীকার করিলেও, গুণকে এবং শক্তিকে আমরা গুণী ও শক্তিমান হইতে পৃথক্ করিয়াও কল্পনা করিয়া থাকি। এরূপ কল্পনার দ্বারা শক্তিকে আমরা ভাল করিয়া ধরিতে পারি, শক্তি-মানকেও ভাল করিয়া বুঝিতে পারি। এই জন্য ধ্যানের ভূমিতে, রসের রাজ্যে, আমরা সর্ব্বদাই গুণীকে গুণভূষিত, ও শক্তিমানকে শক্তিপরিবেষ্টিত বলিয়া ভাবিয়া থাকি। এই দুর্গা-ধ্যান এই মামুলী ভাবনাকেই ব্যক্ত করিতেছে। 'অষ্টাভি শক্তিভিঃ'র দ্বারা এখানে অনিমা, লঘিমা প্রভৃতি অষ্টবিধ যোগশক্তি বা যোগসিদ্ধিকে নির্দ্দেশ করিতেছে। এই সকল যোগশক্তি ভগবদৈশ্বর্য্যের মধ্যে পরিগণিত। এই অষ্টশক্তি আছে বলিয়াই পরমতত্ত্ব একই সঙ্গে "অণোরণীয়ান্" এবং "মহতোমহীয়ান্"—অণু হইতেও অণু এবং মহৎ অপেক্ষাও মহৎ। এই জন্যই ত তিনি—"আসীন দূরং ব্রজতি"—উপবিষ্ট থাকিয়াও দূরে গমন করেন; "শয়ানো যাতি সর্ব্বত্র" —শয়ান থাকিয়াও সর্ব্বত্র গমন করেন। এই শক্তিপ্রভাবেই ত তিনি সর্ব্বস্য ঈশানং"—সকলের নিয়ন্তা এবং সকলের প্রভু। অতএব যাঁরা উপনিষদের নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাঁরাও এই 'জগতাং ধাত্রী'র ধ্যান করিতে পারেন। তাহাতে তাঁহাদের নিরাকার সিদ্ধান্ত নষ্ট হয় না। আর এই যে জগতাং ধাত্রী, তাঁর রস-মূর্ত্তিই ত দুর্গাপ্রতিমারূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দুর্গার প্রতিমা দেখিবা মাত্র তাহাতে নারীজ্ঞান উৎপন্ন হয়। এ যে নারী, ইহা

ধ্যানযোগে ভাবিয়া চিন্তিয়া মনের মধ্যে আনিতে হয় না। নবপত্রিকায় নারী-বুদ্ধি ধ্যানযোগে আনিতে হয়। কিন্তু প্রতিমা প্রত্যক্ষমাত্র এ জ্ঞান জাগিয়া উঠে। দুর্গামূর্ত্তি যে প্রত্যক্ষ নারীমূর্ত্তি। এ মূর্ত্তি যে প্রত্যক্ষ মাতৃমূর্ত্তি। দশভুজা হইলেও, এ ছবি মায়ের, আর কাহারও নহে। নারীরূপ মাতৃরূপ। বিশ্ব-মাতৃরূপও নারীরূপ। আমাদের নিজের মাকে দিয়াই ত আমরা বিশ্বমাতা বা বিশ্বজননী বা জগতাং ধাত্রীকে জানিতে ও ধরিতে পারি। আর এই দুর্গা-প্রতিমাতে মায়ের সকল লক্ষণ ফুটিয়াছে। কুমার যে দুর্গার মূর্ত্তি গড়ে, তাহাতে দুর্গার ধ্যান-মূর্ত্তিটিকেই সে ফুটাইয়া তোলে। আর এই ধ্যানে যে দেহ কল্পিত হইয়াছে তাহা মাতৃদেহ, পরিপূর্ণ, নিত্যশক্তিশালী মাতৃ-দেহ।

জটাজুট সমাযুক্তামর্দ্ধেন্দুকৃতশেখরাম।
লোচনত্রয় সংযুক্তাং পূর্ণেন্দুসদৃশাননাম॥
অতসীপুষ্পবর্ণাভাং সুপ্রতিষ্ঠাং সুলোচনাম্।
নবযৌবনসম্পন্নাং সর্ব্বাভরণভূষিতাম্॥
সুচারুদশনাং তদ্বৎ পীণোন্নতপয়োধরাম।
মৃণালায়তসংস্পর্শ-দশ-বাহু-সমান্বিতাম্॥

এ ত মাতৃরূপ। জটাজুটসমাযুক্তা মা আমার সন্ন্যাসিনী নহেন, কিন্তু স্নেহ-আকুলা, অক্লান্ত-সেবা-পরায়ণা। ঐ জটাজুট পৃষ্ঠে আলুথালু হইয়া পড়ে নাই, কিন্তু অর্দ্ধেন্দুকৃতশেখর, মাতার চূড়ায় অর্দ্ধচন্দ্রাকারে জড়িত—এ যে আমার মা। রন্ধনশালে প্রতিদিন প্রভাতে বাঙ্গালী যে ঐ মার রূপ দেখিয়াছে। আমার মা যে ত্রিনয়নী—সন্তানের ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের ভাবনায় সর্ব্বজ্ঞা ও সর্ব্বদর্শিনী। মার মুখ যে বড় মিষ্ট, অমৃতের আধার—অমন স্নিগ্ধসুন্দর মুখ জগতে আর কোথায়? আর মা পীণোন্নতপয়োধরাম্, ইহাই ত মাতৃত্বের প্রস্ফুট রূপ, নিত্যসিদ্ধ লক্ষণ। আমাকে স্তনদান করিতে করিতে সুখাবেশে

যখন তাঁর ওষ্ঠদ্বয় ভিন্ন হইয়া পড়ে, তখন তাঁর কুন্দনিন্দিত দন্তগুলিতে কি রূপই না ফোটে! আর তাঁর বাহু যে আমার অঙ্গে মৃণালবৎ সংস্পর্শ দান করে, তারই কি আবার কথা? দুর্গা-প্রতিমাতে এই ধ্যানমূর্ত্তিটিই ফুটিয়াছে। এই মূর্ত্তি মাতৃমূর্ত্তি। দুর্গাকে দেখিয়া মাতৃভাব আপনি জাগিয়া উঠে।

এই জন্যই এ প্রতিমাকে প্রতীক বলিতে পারি না। ইহা সম্পদও নহে। ইহা রূপক। বাঙ্গালীর প্রতিমাপূজা নিম্ন অধিকারীর প্রতীকোপাসনা নহে। মধ্যম অধিকারীর সম্পদুপাসনাও নহে। ইহা ভক্তের রূপকোপাসনা। ভাবুকের আপনার ইষ্টদেবতার রসমূর্ত্তির পূজা।

আর এই জন্যই আমাদের পূর্ব্বসংস্কার এবং সিদ্ধান্ত বদলাইয়া গেলেও, এই মহাপূজার সময় প্রাণটা অমন করিয়া উঠে। চারিদিকে যখন পূজার কাঁশর ঘণ্টা বাজিয়া উঠে, তখন সমগ্র সাধক-সমাজের সঙ্গে এক হইয়া, হাত তুলিয়া, ঊর্দ্ধনেত্রে,—মা! মা! বলিয়া চীৎকার করিতে ইচ্ছা হয়।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

মদন পিয়াদা

[গল্প]

রামরতন চক্রবর্ত্তীর পূর্ব্বে কাল্‌নায় ঘর-বাড়ী ও কিছু জমীজমা ছিল। সরিকদিগের সঙ্গে অনেক দিন মাম্‌লা মোকদ্দমা করিয়া তিনি প্রায় সর্ব্বস্বান্ত হন। তাহার উপর যমের অত্যাচারে তাঁহাকে দেশত্যাগী হইতে হইল। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র ও একমাত্র জামাতার বিসূচিকায় মৃত্যু হওয়ার কিছুদিন পরে চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র হরিচরণ ও বিধবা কন্যা রমাবতীকে লইয়া কালীঘাটে আসিয়া বাস করিলেন। ইচ্ছা এই যে, নিত্য আদি-গঙ্গায় স্নান ও কালী-দর্শন করিয়া শেষ-জীবন অতিবাহিত করেন। তাঁহার যজন যজ-নের কাজ অল্পস্বল্প জানা ছিল। অধিকন্তু তিনি হালুইকরের কাজও কিছু কিছু করিতে পারিতেন। তাই রামরতন মনে করিয়াছিলেন যে, মায়ের স্থানে একবার গিয়া পড়িতে পারিলে তাঁহার মত ব্রাহ্ম-ণের ছেলের যে-কোন গতিকে হউক দিন চলিয়া যাইবে।

রমাবতীর বয়স ষোল বৎসর। সে দেখিতে সুন্দরী ছিল। বিধবা হইলেও অল্প বয়স বলিয়া তাহার বাপ তাহাকে হাত শুধু করিতে বা থান কাপড় পরিতে দেন নাই। তাহার দাদা হরিচরণের বয়স তাহার অপেক্ষা ছয় বৎসর অধিক।

হরিচরণ চালাক ছেলে ছিল। সে অল্প দিনের মধ্যে কালীবাটী সংক্রান্ত যাত্রীদিগের আবশ্যকীয় সকল কাজকর্ম্ম আয়ত্ত করিয়া ফেলিল। এখন সে টাকাটা সিকাটা 'উল্টা ট্যাঁকে' না গুঁজিয়া কোনও দিনই ঘরে ফিরে না। হরিচরণের রোজগারেই আপাততঃ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের ক্ষুদ্র সংসার এক রকম চলিয়া যাইত।

হরিচরণের পেটে ক-অক্ষর প্রবেশ করিতে পারে নাই। সে

তাহাকে গো-মাংস জ্ঞান করিত ও বলিত,—"মায়ের দরবারে বিদ্যার দরকার নাই; মা কালী সর্ব্বদা খাঁড়া উঁচাইয়া আছেন, সরস্বতীর সাধ্য নাই যে, তাঁহার এলাকার মধ্যে মাথা গলান।"

মূর্খের অশেষ দোষ থাকে। হরিচরণের অশেষ দোষ ছিল কি না, বলিতে পারি না। কিন্তু তাহার একটি সামন্য দোষ যে ছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সে এক আধ ছিলিম গাঁজা খাইত। সঙ্গদোষে তাহার এই দোষ ঘটে। কোন কোন পাঠক হয় ত বলিবেন যে, গাঁজা খাওয়া দোষ নহে, তাহা একটি গুণবিশেষ; যেহেতু বঙ্গের এক মাননীয় ছোটলাট বাহাদুর গঞ্জিকাকে Concentrated Food বা ঘনীভূত খাদ্য বলিয়া গিয়াছেন। আমিও গাঁজার নিন্দা করিতেছি না। আমি জানি যে এই দ্রব্যের নিন্দা করিলে পঞ্চানন্দের কোপে পড়িতে হয়। তবে আমি সত্যের অনুরোধে বলিতে বাধ্য যে, এই গঞ্জিকাধূমের সূত্র ধরিয়াই হরিচরণের একটি পরম বন্ধু লাভ হইয়াছিল। সেই বন্ধুটির নাম ছিল হেমচন্দ্র। দুই বন্ধুই ধূমের বন্ধনে পরস্পরের কাছে বাঁধা পড়িয়াছিল। প্রেমের বন্ধন ছেঁড়া যায়, ধূমের বন্ধন সহজে ছিঁড়ে না।

হেমচন্দ্র বিষ্ণু ঠাকুরের সন্তান, মস্ত কুলীন; তাহার উপর সে কালীমাতার এক সেবায়েত মহাশয়ের জামাতা। নিকড়ে জামাই বলিয়া শ্বশুরের সঙ্গে তাহার বড় বনিবনাও ছিল না। তার শাশুড়ীর আদর যত্নে তাহার সকল অভাব পূরণ হইত বলিয়া সে কালীঘাটেই বাস করিত। হেমচন্দ্রের অন্যত্র আরও বিবাহ ছিল এবং আরও শ্বশুর বাড়ী ছিল। কিন্তু সে এই কালীঘাটরূপ বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছতি, যেহেতু নিত্য কচি পাঁঠার ঝোল অন্যত্র দুষ্প্রাপ্য। কালীঘাটের মাহাত্ম্য অধুনা এই অমূল্য মহাপ্রসাদের মধ্যেই নিহিত দৃষ্ট হয়। সহরের অনেক ভক্ত হিন্দুসন্তান নিউ মার্কেট বা কসাইয়ের দোকান হইতে কচি পাঁঠার মাংস সংগ্রহ করিতে পারেন না বলিয়া, মধ্যে মধ্যে কালীঘাটে কালীদর্শনে গিয়া থাকেন। পূর্ব্বকালে

ভক্তি সামগ্রী ইন্দ্রিয়াতীত ভাবমাত্র ছিল। এক্ষণে স্থান ও কাল মাহাত্ম্যে তাহা ঘনীভূত হইয়া ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রক্তমাংসে পরিনত হই-য়াছে।

স্বর্ণলতার গদাধরচন্দ্র দুধও খাইত, তামাকও খাইত। আর আমা-দের হেমচন্দ্র বাবাজীবন তাহার অনুকরণে মহাতামাকও খাইত, পাঁঠার ঝোলও খাইত এবং অধিকন্তু হামেসাই হরিচরণদের বাড়ীতে যাইত। পুত্রের বন্ধু ও হালদারদের জামাই বলিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাহাকে খাতির করিতেন। রমাবতীও দাদার ভাবের লোক বলিয়া তাহার জন্য পাণ টান সাজিয়া পাঠাইয়া দিত। রমাবতীর যত্ন-আত্তি হেমচন্দ্রের বড়ই ভাল লাগিত। চুম্বকের গুণ লৌহকে আকর্ষণ করা। হরিচরণদের বাটীতে চুম্বক ছিল। তাহারই অপ্রত্যক্ষ আক-র্ষণে হেমচন্দ্র সেখানে যাতায়াত করিত।

হেমচন্দ্র বুঝিত যে, প্রণয়ের উমেদারকে তাহার ভাবী প্রণয়িণীর সমক্ষে বড়মানুষী দেখাইতে হয়। তাই একদিন সে রমাবতীকে শুনাইয়া তাহার পিতাকে বলিয়াছিল, "চক্রবর্ত্তী মশায়! তুমি এক-খানি মিঠাইয়ের দোকান খোল। এই দোকান করিবার জন্য আমি তোমাকে এক শ টাকা দিচ্ছি। তুমি বেচাকেনা করিয়া পরে তাহা ক্রমে ক্রমে শোধ করিও।" এইরূপ চালে কিছুদিন চলিয়া হেম-চন্দ্র ঠিক করিল যে, সে রমাবতীর হৃদয় কিয়ৎ পরিমাণে জয় করিতে পারিয়াছে।

(২)

একদিন বেলা এগারটার সময় হেমচন্দ্র হরিচরণদের বাড়ীতে গিয়া দেখিল যে, হরিচরণ বা তাহার পিতা কেহই বাড়ী নাই। একা রমাবতী রান্নাঘরে রশুই করিতেছে। তাহাকে এই সময়ে একা পাইবে আশা করিয়াই হেমচন্দ্র এই রকম অসময়ে তাহাদের বাটীতে আসিয়াছিল। সুতরাং সে সুবিধা পাইয়া একেবারে রান্নাঘরে ঢুকিয়া

রমাবতীর নিকটে গিয়া বসিল এবং সরাসরি রসালাপ আরম্ভ করিয়া দিল।

হেমচন্দ্র রমাবতীকে বলিল,

"আজ তোমাকে একা পেয়েছি। রোজ রোজ পাণ সেজে বাহিরের ঘরে আমার জন্য পাঠিয়ে দাও। আজ তুমি নিজের হাতে দেবে, তবে আমি তোমার পাণ খাব।"

এই কথা বলিয়াই সে রমাবতীর গায়ে হাত দিতে অগ্রসর হইল।

রমাবতী মাথায় কৃষ্ণ-চূড়া বাঁধিয়া ডালে হাতা দিতেছিল। সে একেবারে লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, "তবে র‍্যা মুখপোড়া! দাঁড়া, তোর মুখে উনানের পাঁস তুলে দিচ্ছি। রোস্ আঁটকুড়ির ব্যাটা, তোকে পুড়িয়ে মার্ব।"

এই বলিয়া রমাবতী এক হাতা গরম ডাল লইয়া হেমচন্দ্রের গায়ে ছিটাইয়া দিল। হেমচন্দ্র "বাবা রে, মা রে, গেছি রে" বলিয়া চীৎকার করিয়া রান্নাঘর হইতে এক লাফে বাহির হইয়া পড়িয়া পলাইয়া গেল। রমাবতী রাগে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে হাতা লইয়া তাড়া করিয়া তাহাকে একেবারে বাড়ীর বাহির করিয়া দিল। প্রেমালাপের এ কি পরিণতি? অথবা ইহা হয় ত এক প্রকার প্রেমের বিচিত্র গতি।

গঞ্জিকাসেবিগণ সকল বিষয়েই কিঞ্চিৎ অধৈর্য্য হইয়া থাকে। রমণীর সঙ্গে প্রেম করিবার যে কয়েকটি পর্য্যায় বা পর-পর ধাপ আছে, ব্যস্তবাগীশ হেমচন্দ্রের তাহা স্মরণ ছিল না। সে গাছে না উঠিয়াই এক কাঁদির প্রত্যাশায় হনুমানের মত লাফ মারিয়াছিল; তাই সমস্ত ছর্‌কোট্ হইয়া গেল। সবুর করিলে মেওয়া ফলিত কি না কে জানে।

হেমচন্দ্রের ভিতরে কবিত্ব ছিল না। থাকিলে সে এই প্রত্যাখ্যানের উপরেই এক প্রকাণ্ড কবিতা বা নাটক লিখিয়া বসিত।

সে রমাবতীর সঙ্গে স্বামীত্ব সম্বন্ধ স্থাপন করিবার অভিলাষ করিয়াছিল। এ বিষয়ে প্রত্যাখ্যাত হইয়া সে আপনাকে অগত্যা তাহার ভগ্নীর স্বামী কল্পনা করিয়া লইয়া, রমাবতীকে শালী সম্বোধনে তাহার উদ্দেশে নানাবিধ বাছা বাছা বিশেষণ প্রয়োগ করিতে লাগিল।

এদিকে রমাবতীও তাহার পিতা ও ভ্রাতা ফিরিয়া আসিলে, তাহাদের নিকট হেমচন্দ্রের পাশবিক ব্যবহারের কথা আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিল। তৎশ্রবণে পুরুষবাচ্ছা হরিচরণ ক্রোধান্ধ হইয়া সকলের সমক্ষে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া বেড়াইতে লাগিল যে, সে সত্বর তাহার এক-ছিলিমের ইয়ার হেমচন্দ্রের চেহারা বিগড়াইয়া দিবে। বাজারে চারিদিকে এই ব্যাপার লইয়া একটা ভারি ঢেউ উঠিল। রকম বিরকম লোকে রকম বিরকম কথা বলিতে লাগিল। ইহার ফলে উভয় পক্ষের শত্রুতা বিলক্ষণ বাড়িয়া গেল।

পাঠক বুঝিয়াছেন যে, রমাবতী বড়ই অরসিকা খাণ্ডার মেয়ে। সুতরাং আমরা তাহাকে এই আখ্যায়িকার নায়িকা করিতে সম্মত নহি।

(৩)

পাপী মানুষ অপঘাতে মরিলে ভূত হয়। স্বার্থকলুষিত প্রেমেরও অপঘাত হইলে একপ্রকার ভূতের সৃষ্টি হয়,—তাহার নাম 'প্রতিহিংসা'। রমাবতীর নিকট লাঞ্ছিত হইয়া হেমচন্দ্রের প্রাণে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলিয়া উঠিল। কি উপায়ে সত্বর ইহার প্রতিশোধ লইবে, তাহাই তাহার সকল চিন্তার ভারকেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইল।

হেমচন্দ্রের পাড়ায় তাহার আর একটি বন্ধু ছিল। তাহার নাম মদন। মদন আলিপুরে প্রথম মুন্সেফের পিয়াদার কাজ করিত। সে জাতিতে পরামাণিক; সুতরাং তাহার জাতিগত ধূর্ত্ততার অভাব ছিল না। মদনের সঙ্গে হেমচন্দ্রের দুই তিন দিন ধরিয়া পরামর্শ চলিতে লাগিল। শেষে স্থির হইল যে, রামরতন

চক্রবর্ত্তীর নামে একখানি পঞ্চাশ টাকার হ্যাণ্ডনোট জাল করিতে হইবে। মিঠাইয়ের দোকান খুলিবার জন্য যেন সে এই টাকা কর্জ্জ করিয়াছিল। এই হ্যাণ্ডনোটের বাবদে প্রথম মুন্সেফের কোর্টে নালিশ রুজু করিয়াই এই মর্ম্মে এফিডেভিট্ করিতে হইবে যে, প্রতিবাদী তাহার মালপত্র লইয়া স্থানান্তরে পলাইয়া যাইবার উপক্রম করিতেছে; এমতে তাহার মালপত্র এস্তাকাল-ক্রোক করিয়া না রাখিলে বাদীর টাকা আদায় হওয়া কঠিন হইবে। এই কৌশলে তাহার বিরুদ্ধে এস্তাকাল-ক্রোকের পরোয়ানা বাহির করাইয়া, তাহা লইয়া তাহার বাড়ী আক্রমণ করিতে হইবে এবং মাল ক্রোকের সময় রমাবতীকে যদিচ্ছামত বেইজ্জৎ করিয়া প্রতিশোধ লওয়া যাইবে।

মদনের পরামর্শ মতই সমস্ত কাজ হইল। পরদিনই আদালতে রামরতনের বিরুদ্ধে আর্জী দাখিল হইল এবং এস্তাকাল-ক্রোকের পরোয়ানা বাহির হইল। সামান্য তদ্বিরেই এই পরোয়ানা মদন পিয়াদার হাওলা হইল।

অন্য পিয়াদা অপেক্ষা মদনের সাহস ও ক্ষমতা অনেক অধিক ছিল। সে মুন্সেফ বাবুর পিয়ারের পিয়াদা। মদন কাছারীর সময় সারাদিন "বাদী দীনবন্ধু লস্কর হাজী—ঈর, প্রতিবাদী রামগোবিন্দ মণ্ডল হাজী—ঈর্" বলিয়া চীৎকার করিত এবং কাছারী হইতে আসিয়া সন্ধ্যার পর মুন্সেফ বাবুর বাসায় উপস্থিত হইয়া স্বহস্তে চপ্ কাট্‌লেট্ প্রস্তুত করিয়া তাঁহার শোড়যোপচারে পূজার ব্যবস্থা করিয়া দিত। মুন্সেফবাবু বলিতেন, "মদন খুব হুঁসিয়ার লোক, কোন দিন তাহার হাতে একটিও গ্লাস বা ডিকাণ্টার ভাঙ্গে নাই।" সুতরাং তাঁহার কাছে এই পিয়াদার সাত খুন মাপ। অন্য পিয়াদা যে কাজ করিতে ভয় পাইত, মদন তাহা নিঃসঙ্কোচে করিতে পারিত।

(৪)

রামরতন চক্রবর্ত্তী জানিতেন না যে, গতকল্য তাঁহার নামে

আলিপুরের মুন্সেফকোর্টে কোনও মোকদ্দমা রুজু হইয়াছে বা এস্তা-কাল-ক্রোকের পরোয়ানা বাহির হইয়াছে। সুতরাং তিনি সপরিবারে নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাইতেছিলেন। তখনও সূর্য্যোদয় হয় নাই। এমন সময় হেমচন্দ্রের সঙ্গে মদন ও রাইচরণ পিয়াদা আসিয়া তাঁহার সদর দরজার সম্মুখে উপস্থিত হইল। দরজা বন্ধ ছিল। মদনের আদেশে হেমচন্দ্রের একটি পদাঘাতেই তাহা ভাঙ্গিয়া গেল এবং সকলে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

হেমচন্দ্র প্রথমেই রসুই ঘরে ঢুকিয়া লাথি মারিয়া হাঁড়িকুড়ি ভাঙ্গিতে লাগিল। ডালের হাঁড়ি ও হাতার উপরে, বিশেষতঃ রমাবতীর উপরেই তাহার বিশেষ রাগ। জিনিসপত্র ভাঙ্গার শব্দে ও হেমচন্দ্রের গালাগালির চীৎকারে বাড়ীর সকলের নিদ্রাভঙ্গ হইল। চক্রবর্ত্তী মহাশয় ঘরের দরজা খুলিয়া বাহির হইলে মদন পিয়াদা তাঁহাকে বলিল, "আমরা আদালতের হুকুমে তোমার সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিতে আসিয়াছি।" সে পরোয়ানা দেখাইল। রামরতন ও হরিচরণ ছুটিয়া পাড়ার লোকদের ডাকিতে গেল। হেমচন্দ্র রমাবতীকে দেখিতে পাইয়া বলিল, "এখন তোর কোন্ বাবা রক্ষা করবে?" এই বলিয়া সে তাহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। অবস্থা বুঝিয়া যুবতী তৎক্ষণাৎ একখানি দা হাতে লইয়া রণরঙ্গিণী বেশে হেম ও পিয়াদাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া বলিল, "সাবধান, যে আমার গায়ে হাত দিতে আসবে তাকে আমি এক কোপে একেবারে দুখানা করে ফেল্‌ব।" মদন মেয়ে মানুষের হাতে খুন হইতে রাজী হইল না। সে হেমচন্দ্রকে টানিয়া সরাইয়া লইল। এমন সময় পাড়ার যোগেশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি পাঁচ সাত জন লোক আসিয়া উপস্থিত হইল।

যোগেশচন্দ্র সিটি কলেজে বি, এ, ক্লাশে পড়িতেন। এই বৎসর তাঁহার পরীক্ষা দিবার কথা। তিনি একটি পরোপকারের বাতিকগ্রস্ত ছাত্র। হাটের নেড়া হুজুগ খুঁজিয়া বেড়ায়। যোগেশ-

বাবুও পাড়ার লোকের বিপদ আপদ খুঁজিয়া বেড়াইতেন এবং সুবিধা পাইলেই তাহাতে বুক দিয়া পড়িতেন। তিনি রামরতনদের বাড়ীতে আসিয়া পিয়াদাদের জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি? কি হয়েছে?"

মদন বলিল,

"বাদী হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিবাদী রামরতন চক্রবর্ত্তীর নামে হ্যাণ্ডনোটের প্রাপ্য টাকার বাবদে প্রথম মুন্সেফের আদালতে মোকদ্দমা দায়ের করেছেন এবং প্রতিবাদীর পলাইয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকায় হাকিম তাহার মালপত্র এস্তাকাল-ক্রোক করিবার হুকুম করিয়াছেন। দাবী মায় খরচা একুনে ৬৫৷৷৵০ আনার জন্য প্রতিবাদীর অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোকের পরোয়ানা বাহির হইয়াছে। আমরা সেই পরোয়ানা নিয়ে মাল ক্রোক করতে এসেছি। আপনারা চলে যান। আপনাদের এখানে থাকিবার প্রয়োজন নাই। আমাদের আদালতের হুকুম তামিল করিতে দিন।"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় উপস্থিত ভদ্রলোকদিগকে ভগ্ন সদর দরজা ও তৈজসপত্রাদির অবস্থা দেখাইয়া দিলেন। দা হাতে করিয়া রমাবতী কিরূপে আত্মরক্ষা করিতেছিল, তাহা তাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। সুতরাং এটি যে মিথ্যা মোকদ্দমা, তাহা বুঝিতে আর তাঁহাদের বিলম্ব হইল না।

যোগেশচন্দ্র পিয়াদাদিগকে বলিলেন, "আমরা পরোয়ানার লিখিত ৬৫৷৷৵০ আনা তোমাদের নিকট আমানত করিতেছি। তোমরা এই টাকা লইয়া চলিয়া যাও; আর মাল ক্রোক করিবার আবশ্যক নাই।"

এই কথা শুনিয়া মদন হেমকে একটু আড়ালে লইয়া গিয়া তাহার সহিত কিছুক্ষণ কি পরামর্শ করিল। তারপর সে যোগেশবাবুর নিকট ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "এখানে আমি টাকা লইতে পারি না। ইচ্ছা করিলে আপনারা আদালতে গিয়া টাকা জমা দিতে পারেন।"

যোগেশবাবু বলিলেন, "বেশ কথা; আমরা আদালতেই টাকা জমা দিয়া আসিব।" মদন বলিল, "ভাল, তবে সেইখানেই বোঝা-পড়া হ'বে; এখন আর কোন কথায় কাজ নাই।"

এই বলিয়া সে রাইচরণ পিয়াদা ও তেমকে লইয়া প্রস্থান করিল।

(৫)

রামরতনের বাড়ী হইতে মদন প্রামানিক একেবারে সটান ভবানী-পুরে মুন্সেফবাবুর বাড়ী চলিয়া গেল। মুন্সেফবাবু তখন বৈঠক-খানায় বসিয়া চা-পানের সঙ্গে সংবাদপত্র পড়িতেছিলেন। মদন কোন দিন সকাল বেলা সেখানে যাইত না। তাহাকে আজ এইরূপ অসময়ে উপস্থিত হইতে দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি খবর রে মদন?"

মদন প্রভুর পদধূলি গ্রহণ করিয়া বলিল, "হুজুর! আপনি কাল যে এস্তাকাল পরোয়ানা সই করেছিলেন, তাহা আমারই জিম্মা হয়েছিল। আজ আমরা সেই পরোয়ানা নিয়ে কালীঘাটে প্রতিবাদী রামরতন চক্রবর্তীর মাল ক্রোক করতে গিয়াছিলাম। আমরা যখন ক্রোকী মালের লিষ্ট তৈয়ার করিতেছিলাম, তখন পাড়ার পাঁচ ছয়-জন লোক সেখানে এসে আমাদের যা-ইচ্ছা-তাই গালাগালি করে তাড়াইয়া দিয়াছে।"

মু। তোরা মাল আনতে পারিস্‌নি?

ম। না হুজুর! আমরা মাল ফেলে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছি। শুনলাম, তারা কালীঘাটের বিখ্যাত ভদ্রলোক গুণ্ডা। যদি আমরা মাল আনবার চেষ্টা করতাম, তাহ'লে আমাদের হাড় গুঁড়া করে দিত।

মু। তোরা আমার পরোয়ানা দেখিয়েছিলি?

ম। আজ্ঞে, আমরা হুজুরের পরোয়ানা দেখিয়ে তাদের বল্লুম,

'আলিপুরের প্রথম মুন্সেফ বাহাদুরের হুকুমে আমরা মাল ক্রোক কর্ত্তে এসেছি। আপনারা বাধা দিবেন না।' তাই শুনে যোগেশ ঘোষ নামে এক ব্যক্তি বলিয়া উঠিল, 'ব্যাটা, রেখে দে তোর মুন্সেফ বাহাদুর; আমি ঢের ঢের মুন্সেফ বাহাদুর দেখেছি।' আমি বল্লাম, 'আপনারা কেন আমার কাছে পরোয়ানার টাকা আমানত করুন না, তা হ'লে আমি মাল ছেড়ে দিয়ে চলে যাচ্ছি।' যোগেশ বলিল, 'টাকা জমা দিতে হয় ত তোর মুন্সেফ বাবার কাছে দেব, তো-শালার কাছে দেব কেন?'

মু। তা, এই কথায় তোরা মাল ফেলে চলে এলি কেন? কেউ ত তোদের মারধর কর্ত্তে আসেনি?

ম। হুজুর! এক স্ত্রীলোক দা নিয়ে আমাদের কাট্‌তে এসেছিল। আমরা কি সহজে পালিয়ে এসেছি?

মুন্সেফবাবুর মুখ লাল হইয়া উঠিল। তিনি কালীঘাটের গুণ্ডাদের অত্যাচারের কথা পূর্ব্বেও অনেকবার অনেকের নিকট শুনিয়াছিলেন। এবার তাহাদিগকে তিনি নিজের আয়ত্বের ভিতর পাইয়াছেন। সুতরাং তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে হইবে, এইরূপ সংকল্প করিলেন। তিনি মদনকে বলিয়া দিলেন যেন সে কাছারীতে গিয়াই সর্ব্বপ্রথমে এই ঘটনার সকল কথা সবিশেষ লিখিয়া এফিডেভিট্ করে। মুন্সেফবাবু বড় বিচলিত হইয়াছিলেন। সেদিন আর তাঁহার খবরের কাগজ পড়া হইল না। চা-ও ঠাণ্ডা হইয়া গেল। তিনি কেবল এই ঘটনার কথাই ভাবিতে লাগিলেন।

(৬)

কাছারীতে হাকিম আসিবার পূর্ব্বেই মদন পিয়াদার এফিডেভিট্ লেখা হইয়া গিয়াছিল। মুন্সেফ বাবু এজলাসে আসিয়া বসিবামাত্র পেশকার মহাশয় তাহা পেশ করিলেন। তাহার উপরে হুজুরের হুকুম হইল যে, যে-সকল ব্যক্তি পিয়াদাগণের বৈধকার্য্যে বাধা

দিয়াছে, কেন তাহারা ফৌজদারী সোপর্দ্দ হইবে না, তাহার কারণ অদ্য হইতে সাত দিনের মধ্যে তাহাদিগকে দর্শাইতে হইবে। মদন পিয়াদা যোগেশ, রামরতন, রমাবতী প্রভৃতি ছয় জনের নামে অভি-যোগ করিয়াছিল। রামাবতী স্ত্রীলোক বলিয়া তাহাকে বাদ দিয়া হাকিম বাকী পাঁচজনের নামে নোটিশ বাহির করিলেন।

সেই দিনই বেলা ১২টার সময় যোগেশ ও রামরতন একজন উকীল লইয়া প্রথম মুন্সেফের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া মদন ও রাইচরণ পিয়াদার নামে সেকায়েৎ করিলেন। উকীলবাবু বলিলেন,

"হুজুর! আপনার পিয়াদাগণ এস্তাকাল পরোয়ানা জারী করিতে গিয়া এই প্রতিবাদীর বাড়ীর সদর দরজা ভাঙ্গিয়া তাহার অনেক মালপত্র তছরুপ করিয়া স্ত্রীলোকদের উপরেও অত্যাচার করিয়াছে। আমরা পরোয়ানার লিখিত টাকা হুজুরাদালতে আমানত করিতে চাহিতেছি এবং পিয়াদাগণ যে অবৈধ অত্যাচর করিয়াছে, সেজন্য হুজুরের নিকট বিচার প্রার্থনা করিতেছি।"

হাকিম বলিলেন,

"আমি সমস্ত ব্যাপার পূর্ব্বেই অবগত হয়েছি। আপনার মক্কেল এই প্রতিবাদী ও তাহার পাড়ার কয়েকজন বদ্‌মায়েস একজোট হয়ে আমার পিয়াদাদের মালক্রোক কর্ত্তে না দিয়া গালিগালাজ করে হাঁকাইয়া দিয়াছে। সেজন্য কেন তাহারা ফৌজদারী সোপর্দ্দ হবে না, তাহাদিগকে তাহার কারণ দর্শাইতে হবে। আর, আমার পিয়াদাগণ যদি কোন অবৈধ কাজ করে থাকে, তাহ'লে ফৌজদারী আদালত খোলা আছে, আপনারা সেখানে তাদের নামে নালীশ কর্ত্তে পারেন। তারা অপরাধ করেছে কি না সেইখানেই তার বিচার হবে।"

উকীল। হুজুরের কাছেই উভয় পক্ষের বিচার হওয়া প্রার্থনীয়। পিয়াদারা হুজুরেরই কর্ম্মচারী। হুজুরই বিচার করে তাদের দণ্ড বিধান কর্ত্তে পারেন। এজন্য ফৌজদারী আদালতে যাইবার আবশ্যক

কি ? আর আমরা পরোয়ানার টাকা হুজুরাদালতে আমানত কর্ত্তে চাচ্ছি। হুজুরই অনুগ্রহ করে কোন্ পক্ষ অপরাধী বিচার করে দেখুন।

হাকিম। মালক্রোকের সময় সেইখানে পিয়াদাদের কাছে এই টাকা জমা দিলেই ত সকল গোল চুকিয়া যাইত। তাহা না করে যখন তাদের অপমান করে তাড়াইয়া দেওয়া হয়েছে, আর আমি যখন show causeএর হুকুম দিয়েছি, তখন আমি আর কিছুই কর্ত্তে পারব না। আমাকে এখন আইন ধরে কাজ কর্ত্তে হবে। আদালতে টাকা জমা দিলেই কি আপনার মক্কেলদের অপরাধ উড়ে যাবে ?

উকিল। হুজুর! এঁরা পিয়াদাদের কাছে টাকা জমা দিতে চেয়েছিলেন। তারা টাকা না নিয়ে মাল ফেলে চলে এসেছে।

এই কথা শুনিয়া হাকিম রাগিয়া উঠিলেন, বলিলেন—

"মিথ্যা কথা! পিয়াদাদের কাছে টাকা জমা দিতে চাওয়া হয়েছিল, তবু তারা সে টাকা না নিয়ে ক্রোকী মাল ফেলে স্ব-ইচ্ছায় চলে এলো, একথা আমি কিছুতেই বিশ্বাস কর্ত্তে পারিনা। এমন কোনও মুর্খ হাকিম নাই, যিনি এ কথা বিশ্বাস কর্‌বেন। যান, আমি আপনাদের কোন কথা শুন্‌তে চাইনা।"

উকীলবাবু অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন, কিন্তু কিছুতেই হাকিমের রাগ পড়িল না। তখন তিনি বিষণ্ণ বদনে আদালত গৃহ হইতে বাহিরে আসিয়া যোগেশবাবুকে বলিলেন,

"এখন পিয়াদাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারীতে নালিশ করা ভিন্ন আর আপনাদের গত্যন্তর নাই। এখানে তাদের অপরাধের বিচার অসম্ভব। আর পিয়াদাদের অপরাধ প্রমাণ কর্ত্তে না পার্‌লে আপনাদেরও অব্যাহতি নাই। যেরূপ দেখিতেছি, তাহাতে বোধ হয় মুন্সেফবাবু নিশ্চয়ই আপনাদের ফৌজদারী সোপর্দ্দ কর্‌বেন। সুতরাং পিয়াদাদের দণ্ড না হলে আপনাদের দণ্ড অনিবার্য্য। অতএব

আপনারা ফৌজদারীকোর্টের উকীলদের সঙ্গে পরামর্শ করে সত্বর যাহা বিহিত হয় করুন।”

(৭)

পরদিবস রামরতন চক্রবর্ত্তী ফরিয়াদী হইয়া আলিপুরের সুবরবন্ পুলিশকোর্টে মদন ও রাইচরণ পিয়াদার নামে অনধিকার প্রবেশ ও ড্যামেজের চার্জ্জ দিয়া নালিশ করিলেন। কোনও বাড়ীর সদর দরজা বন্ধ থাকিলে মাল ক্রোকের পরোয়ানা লইয়া দেওয়ানী আদালতের পিয়াদারা সেই দরজা ভাঙ্গিয়া প্রবেশ করিলে তাহা অনধিকার প্রবেশ হয়। সদর দরজা খোলা থাকিলে আর অনধিকার প্রবেশ হয় না।

ফৌজদারীর বিচারকার্য্য অনেকটা ধড়িধক্কার উপরে হইয়া থাকে। দেওয়ানী আদালতের আঠার মাসে বৎসর; সেখানে মামলা গদাই-লস্করী চালে চলে। মুন্সেফবাবু যোগেশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি পাঁচজনকে ফৌজদারী সোপর্দ্দ করিতে না করিতেই পুলিশকোর্টে পিয়াদাদের বিচার হইয়া গেল। তাহাদের পক্ষে সাফাই সাক্ষ্য এক মাত্র হেমচন্দ্র। কেবল সে-ই বলিয়াছিল যে, রামরতনের বাড়ীর সদর দরজা ঈষৎ খোলা ছিল, সুতরাং বাড়ীতে প্রবেশ করিবার জন্য তাহা ভাঙ্গিতে হয় নাই। স্থানীয় আর সকল সাক্ষ্যই এক-বাক্যে বলিল যে, দরজা ভাঙ্গা হইয়াছিল এবং তাহারা তাহা ভগ্ন অবস্থায় দেখিয়াছে। তাহারা আরও বলিল যে, আসামীগণ পরোয়ানার টাকা লইতে অস্বীকার করিয়া স্ব-ইচ্ছায় মালপত্র ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছিল; কেহ তাহাদিগকে গালাগালি দিয়া তাড়াইয়া দেয় নাই। রামরতনদের সঙ্গে হেমচন্দ্রের পূর্ব্বের আকজ এবং মদনের সঙ্গে হেমচন্দ্রের যোগ-সাজস বিচারক বেশ বুঝিতে পারিলেন। সুতরাং তিনি প্রত্যেক আসামীকে কুড়ি টাকা করিয়া জরিমানা করিলেন।

দণ্ডিত পিয়াদাগণ রায়ের নকল লইয়া শীঘ্র জজ-সাহেবের নিকট আপিল দায়ের করিল। তিনি এই মোকদ্দমার নথী তলপ করিয়া আনাইলেন এবং নিজে আপিলের বিচার না করিয়া মাননীয় হাই-কোর্টে তাহা Refer করিয়া পাঠাইলেন। তিনি তাহার Letter of Referenceএর মধ্যে লিখিয়া দিলেন যে, জনৈক সাক্ষ্য হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের এজাহারে প্রকাশ আছে যে ফরিয়াদীর সদর দরজা ঈষৎ খোলা ছিল, তাহা ভাঙ্গা হয় নাই।

সত্বরই হাইকোর্ট হইতে পিয়াদাদিগের পুনর্বিচারের হুকুম আসিল। সুবরবন্ পুলিশকোর্টের হাকিম আর তাহাদিগের কোনও মোকদ্দমারই বিচার করিতে চাহিলেন না। এক মোকদ্দমায় রামরতন ফরিয়াদী এবং পিয়াদারা আসামী; আর এক মোকদ্দ-মায় পিয়াদাদের অভিযোগে গভর্ণমেণ্ট ফরিয়াদী এবং যোগেশচন্দ্র ঘোষ ইত্যাদি পাঁচজন আসামী। তিনি এই উভয় মোকদ্দমাই আলিপুরের অন্যতম ডেপুটি নবীনবাবুর ঘরে ট্রান্সফার করিয়া দিলেন। সকলে বলিত, ডেপুটি নবীনবাবু বড় কড়া হাকিম।

নবীনবাবুর এজলাসে প্রথমে আসামী পিয়াদাদিগের বিরুদ্ধে যে মোকদ্দমা, তাহারই বিচার আরম্ভ হইল। এক ঘণ্টার মধ্যে শুনানি শেষ হইয়া গেল। মুন্সেফকোর্টের পিয়াদাগণ যে কোনও অবৈধ কাজ করিয়াছে, এই বিচারে হাকিম তাহার কোনও সন্তোষ-জনক প্রমাণ পাইলেন না—এই মর্ম্মে রায় লিখিয়া তিনি তাহাদিগকে বেকসুর খালাস দিলেন। সিভিলকোর্টের পিয়াদাদের জয় হইল।

অপর মোকদ্দমা—যাহাতে পিয়াদারা ফরিয়াদী এবং তাহাদের বৈধকার্য্যে বাধা দিবার অপরাধে কালীঘাট গ্রামের পাঁচজন ভদ্রলোক আসামী—তাহার শুনানি এক সপ্তাহের জন্য মুলতবি রহিল।

(৮)

যোগেশচন্দ্র শিক্ষিত যুবক। পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে তিনি

ইংরাজদিগের জাতীয় গুণগুলির বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। সরকারী উচ্চ কর্ম্মচারী ইংরাজ রাজপুরুষদিগের ন্যায়-নিষ্ঠার উপরে তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। জজ-সাহেব একজন ইংরাজ সিভিলিয়ান্। যোগেশের দৃঢ় বিশ্বাস যে, তাঁহাকে সকল কথা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতে পারিলে তাঁহাদ্বারা কিছুতেই অবিচার হইবে না।

ইতিমধ্যে হাইকোর্ট হইতে হুকুম আসিল যে, একশত টাকার কম দাবীর যে সকল দেনাপাওনার মোকদ্দমা মুন্সেফকোর্টে দায়ের আছে, তাহা যেন শিয়ালদহের স্মল্-কজ্-কোর্টে ট্রান্সফার করা হয়। এই আদেশানুসারে রামরতনের বিরুদ্ধে হেমচন্দ্রের সেই মূল হ্যাণ্ড-নোটের মোকদ্দমা প্রথম মুন্সেফের ঘর হইতে শিয়ালদহের ছোট আদালতে চলিয়া গেল। পাঠকের বোধ হয় স্মরণ থাকিতে পারে যে, পিয়াদা ঘটিত এই সমস্ত গোলযোগের মূলে এই ক্ষুদ্র হ্যাণ্ডনোটের মোকদ্দমা। এই মোকদ্দমার এস্তাকাল পরোয়ানা লইয়াই হেমচন্দ্র পিয়াদাদের সঙ্গে যোগ করিয়া রামরতনের বাড়ী আক্রমণ করিয়াছিল।

শিয়ালদহের ছোট আদালতে এই মোকদ্দমার বিচারে সাব্যস্ত হইল যে, উক্ত হ্যাণ্ডনোট যে প্রকৃত বা genuine তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ নাই। হ্যাণ্ডনোটের মোকদ্দমা ফাঁসিয়া যাওয়াতে যোগেশের একটু ভরসা হইল। তিনি মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, জেলার সকল হাকিমের উপরে হচ্ছেন জজ-সাহেব। তিনি ইংরাজ সিভিলিয়ান্। তাঁহাকে একবার সকল কথা বুঝাইয়া বলা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। কিন্তু উকীলদের দ্বারা একাজ হইবে না। তাঁহারা দরখাস্ত ও আইনের বাহিরে কোন কথা জজ-সাহেবকে বলিবেন না। অতএব যোগেশচন্দ্র স্থির করিলেন যে, জজ-সাহেবের সঙ্গে তিনি নিজেই সাক্ষাৎ করিতে যাইবেন। যদি জেলে যাওয়াই নিশ্চিত হয়, তবে তিনি জজ-সাহেবকে একবার তাহার প্রাণের সকল কথা, সকল ব্যথা, না জানাইয়া জেলে যাইবেন কেন? জজ-সাহেব যে

এই জেলার সকলের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা। তিনি কি সজ্ঞানে কাহারও উপরে অবিচার করিতে পারেন? যোগেশচন্দ্র মনে মনে বলিলেন, "মুন্সেফবাবু হয় ত তাঁহাকে ভুল বুঝাইয়াছেন। অতএব আমি নিজে তাঁহার চরণপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া এই মোকদ্দমার সকল কথা তাঁহাকে জানাইয়া তাঁহার ভ্রম সংশোধন করিয়া দিব। তারপর অদৃষ্টে যাহা থাকে তাহাই হইবে।"

ইতি কর্ত্তব্য স্থির করিয়া আর কাহারও সঙ্গে কিছু পরামর্শ না করিয়া যোগেশচন্দ্র মোকদ্দমার সমস্ত কাগজপত্র পুস্তকাকারে সদ্য ছাপাইয়া ফেলিলেন এবং এই পুস্তকের পরিশিষ্টে তিনি মোকদ্দমার প্রমাণসকল বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইলেন যে, হেমচন্দ্র প্রতিহিংসা-প্রণোদিত হইয়া রামরতনের নামে জাল হাণ্ডনোট তৈয়ার করিয়া তাহার পরিবারবর্গকে বেইজ্জৎ করিবার অভিপ্রায়ে মদন পিয়াদাকে সহায় করিয়া এস্তাকাল পরোয়ানা লইয়া আসিয়াছিল এবং প্রথম বিচারে পিয়াদাদিগের যে দণ্ড হইয়াছিল, তাহাই ঠিক। পরিশিষ্টে আরও দেখান হইয়াছিল যে, ডেপুটি নবানবাবু পিয়াদাদিগের যে পুনর্বিচার করিয়া তাহাদিগকে খালাস দিয়াছেন, তাহাতে ন্যায়বিচারের মর্য্যাদা সর্ব্বথা সংরক্ষিত হয় নাই।

(৯)

মোকদ্দমার কাগজপত্র ছাপান হইল বটে, কিন্তু আজ কাছারী বন্ধ, জজ-সাহেব কাছারী আসিবেন না। যোগেশবাবু আপনার কাজের পক্ষে ইহাই সুবিধা বিবেচনা করিলেন। কাছারীর গোল-মালের মধ্যে সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে চেষ্টা না করিয়া বরং ছুটার দিন তাঁহার কুঠিতে গিয়া সাক্ষাৎ করিলে বিস্তারিত ভাবে কথাবার্ত্তা কহিবার সুযোগ ঘটিতে পারে।

বেলা বারটার সময় যোগেশচন্দ্র চোগা-চাপকান পরিয়া কাগজ-পত্র লইয়া জজ-সাহেবের কুঠির দিকে রওয়ানা হইলেন। সেখানে

গিয়া শুনিলেন, সাহেব কাছারী বন্ধ থাকা সত্ত্বেও সেখানে গিয়াছেন। তিনি সেখান হইতে কাছারী আসিলেন; আসিয়া দেখিলেন যে কেবল পেশকার মহাশয় ও একজনমাত্র আরদালী আদালত গৃহের মধ্যে উপস্থিত আছে, আর কেহ নাই। তিনি পেশকার মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, কতকগুলি মোকদ্দমার রায় লেখা বাকী পড়িয়া যাওয়ায় জজ-সাহেব আজ ছুটীর দিনেও কাছারীতে আসিয়া খাসকামরায় বসিয়া ঐ সকল রায় লিখিতেছেন।

যোগেশবাবু পেশকার মহাশয়কে দিয়া নিজের নামের কার্ড সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। কিছুক্ষণ পরেই সাহেব তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। যোগেশচন্দ্র খাসকামরায় প্রবেশ করিয়া সসম্ভ্রমে জজ-সাহেবকে সেলাম করিলেন। সাহেব তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি পিয়াদাদিগের মোকদ্দমার কথা উত্থাপন করিয়া, তৎসক্রান্ত সকল বক্তব্য কথাগুলি গুছাইয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন, এবং মোকদ্দমার মুদ্রিত কাগজগুলি সাহেবের সম্মুখে রাখিয়া, তাহা হইতে দেখাইয়া দিলেন যে, বাদী হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পূর্ব্ব-শত্রুতার জন্য মিথ্যা হ্যাণ্ডনোটের নালিশ ও মিথ্যা এফিডেভিট্ করিয়া এস্তাকাল পরোয়ানা লইয়া গিয়া তাহার বন্ধু মদন পিয়াদার সঙ্গে যোগসাজস করিয়া, প্রতিবাদী রামরতন চক্রবর্তীর জেনানা আক্রমণ করিয়া অযথা অত্যাচার করিয়াছিল। সুতরাং প্রথমবারের বিচারে পিয়াদাদিগের যে দণ্ড হইয়াছিল, তাহাই ঠিক; দ্বিতীয়বারের বিচারে তাহারা যে খালাস পাইয়াছে, তাহা ঠিক হয় নাই।

জজ-সাহেব যোগেশকে মোকদ্দমা সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন; তিনিও তাহার যথাযথ উত্তর দিলেন। শেষে যোগেশচন্দ্র বলিলেন,

"হুজুর! আমরা পাড়ার কয়েকজন নিরপেক্ষ লোক ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকিয়া পিয়াদাদের সকল অত্যাচার প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম।

পাছে আমরা তাহাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করি, এই ভয়ে মদন পিয়াদা আমাদিগকে আসামীশ্রেণীভুক্ত করিবার জন্য আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা সেকায়েৎ করিয়াছে এবং মুন্সেফবাবুও তাহার কোন তদন্ত না করিয়া আমাদিগকে ফৌজদারা সোপর্দ্দ করিয়াছেন। হুজুর! আপনি এই জেলার যাবতীয় প্রজার দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা। আপনি যদি বুঝিয়া থাকেন যে আমরা যথার্থ নিরপরাধী, তাহা হইলে অনুগ্রহ করিয়া আমাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মোকদ্দমা উঠাইয়া লইবার পক্ষে বিহিত আদেশ দিন।"

জজ-সাহেব যোগেশকে খাসকামরার বাহিরে একটু অপেক্ষা করিতে বলিলেন। কিছুক্ষণ পরে পেশকার মহাশয় একখানি Order Sheetএ জজ-সাহেবের লিখিত হুকুম আনিয়া তাহাকে দেখাইলেন। হুকুম এই,—"আসামী যোগেশচন্দ্র ঘোষ আমার কাছে আসিয়াছিল। আসামীগণ যদি কবুল করে যে, তাহারা পিয়াদাদিগের বৈধকার্য্যে বাধা দিয়াছে এবং নিজেদের অপরাধ স্বীকার করিয়া যদি তাহারা অনুতপ্ত হৃদয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে, তাহা হইলে তখন তাহাদের বিষয়ে কি করা হইবে তাহা বিবেচনা করা যাইবে।"

পেশকার মহাশয় সাহেবের আদেশমত হুকুমটি যোগেশবাবুকে দেখাইয়া তাঁহার স্বাক্ষর করাইয়া লইলেন। হুকুম পড়িয়া যোগেশ-চন্দ্রের হৃদয় বিদীর্ণ হইল, তাঁহার চোখে জল আসিল। পেশকার মহাশয় তাঁহাকে বলিলেন,

"আপনারা অপরাধ স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করুন না কেন; তাহা হইলে সাহেব আপনাদিগকে খুব সম্ভবতঃ অব্যাহতি দিবেন।"

যোগেশবাবু কাঁদ কাঁদ ভাবে বলিলেন,

"মহাশয়! ধর্ম্ম জানেন, আমরা কোনও অপরাধ করি নাই। জজ সাহেব ধর্ম্মের সাক্ষাৎ অবতার। তাঁহার কাছে—আমরা পিয়াদা-দের বৈধকার্য্যে বাধা দিয়াছি, অপরাধ করিয়াছি—এই মিথ্যা কথা কি করিয়া বলিব?" দেখুন, অসত্যের উপরে কিছুরই প্রতিষ্ঠা হইতে

পারে না। যদি মনে মনেও জানিতাম যে আমি যথার্থ অপরাধী, তাহা হইলে পিয়াদারও পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করিতাম না। পেশকার মহাশয়! আপনি জজ-সাহেবকে বলিবেন, আমরা আত্মবলিদানের জন্য প্রস্তুত রহিলাম।"

এই কথা বলিয়া যোগেশবাবু বিদায় হইলেন। পরদিনেই জজ-সাহেবের ঐ Order Sheet ফৌজদারী আদালতে ডেপুটি নবীন-বাবুর নিকট প্রেরিত হইল।

দুইদিন পরে নবীনবাবুর কোর্টে যোগেশবাবুদের কেসের বিচার হইল। সমস্ত দিন ধরিয়া মোকদ্দমা চলিল। হাকিম বলিলেন—"স্ত্রীলোকটীর জবানবন্দি লইব।" কেহ আপত্তি করিল না। রমাবতী সাক্ষ্য দিল। তাহার সাক্ষ্য শুনিয়া হাকিমের মনে কি হইতেছিল মা গঙ্গাই জানেন। একবার যেন মনে হইল, পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া চোখ মুছিলেন। আদালত-গৃহ লোকে লোকারণ্য, কিন্তু নীরব নিস্তব্ধ। সবাই ভাবিতেছিল, বিনা অপরাধে আসামীরা কি জেলে যাইবে? তার পরদিন পূজার আরম্ভ—সপ্তমী। সবাই যেন চক্ষু বুজিয়া বলিতেছিল—মা কালী করেন এদের যেন জেলে না যেতে হয়।

এক ঘণ্টা পরে হাকিমের কলম থামিল। আসামীরা যে দিকে ছিল তাহার অন্য দিকে তাকাইয়া হাকিম বলিলেন, "দশ দশ টাকা জরিমানা"। বলিয়াই এজলাস হইতে উঠিয়া চলিয়া গেলেন।

শ্রীহরিদাস হালদার।

কিশোর-কিশোরী

কেমনে উঠিবে ফুটি শুধু একদিনে ?
আরে ! আরে ! ফুল যবে হেসে ফুটে উঠে
শ্যাম পল্লবের বুকে, সুখ-সূর্য্য-করে,
একটি প্রভাত লাগি, এক নিমেষের
মাঝে, সেকি শুধু সেই মুহূর্ত্তের
লীলা ? তার তরে করেনি কি আয়োজন
সমগ্র জীবন-লীলা যুগ যুগান্তের,
জন্ম জন্মান্তর ধরে ? অনন্ত কালের
শুভ সঙ্গীতের মাঝে উঠে সে ফুটিয়া !
ফুটেনা ফুটেনা ফুল শুধু একদিনে !

সেই যে মিলিনু দোঁহে সন্ধ্যাকাশতলে
সে কি শুধু মুহূর্ত্তের মিলন উৎসব ?
অকস্মাৎ অকারণ সামান্য ঘটনা ?
মুহূর্ত্তে আরম্ভ তার মুহূর্ত্তেই শেষ ?
সেই যে দরশ তব, আঁখি অনিমেষ,
সে যে মোর শুভ দৃষ্টি জনমে জনমে
চির পরিচিত ! সে যে অনন্ত কালের !
যোগভ্রষ্ট যোগযুক্ত যুগ যুগান্তের !
তোমারে দেখেছি শুভে ! কত শত বার !
আবার দেখিনু সেই সন্ধ্যাকাশতলে !

যোগভ্রষ্ট আমি ! কেমনে বর্ণিব বল
অনন্ত কালের সেই মাধুর্য্য কাহিনী ?

যুগে যুগে কেমনে যে পরশ লভেছি !
জনমে জনমে কেন হারায়ে ফেলেছি !
কেনবা পাইনু সেই সন্ধ্যাকাশতলে !
ফুটিয়া উঠিলে মরি ! মধু জ্বল জ্বল
উজল রসের মূর্ত্তি ! কত না কল্পনা
করিছে জীবন যেন স্বপন বাহিনী !
যেন ধরা দেয়, শত শত জনমের
কত না হাসির ধ্বনি কত অশ্রুজল !

জীবন-লীলার সেই প্রথম প্রত্যুষে
মনে হয়, ছিনু মোরা শিলাখণ্ড দুটি
অগাধ আঁধারে যেন ভেসে ভেসে উঠি
দুইটি উপল খণ্ড সৃষ্টি পারাবারে !
বুকে বুক লাগা, সেই যে প্রথম জাগা
প্রাণদীপ্ত মন্ত্রমুগ্ধ নির্ব্বাক অবাক
দুইটি পরাণ ! কে দিল তরঙ্গ তুলি ?
আবার ডুবিনু কেন আঁধার নির্জ্জনে ?
তরঙ্গসঙ্কুল সেই গভীর অর্ণবে
জীবন-লীলার কোন্ প্রথম প্রত্যুষে ?

তারপরে কত কাল কত যুগ ধরে
কালের তিমির-স্রোত ব'হে চলে যায়
কোন চিহ্নহীন পথে ? আলোকবিহীন
কোন্ ঘন তমসায় ? কোন্ স্মৃতিহীন,
পুঞ্জিভূত অন্ধকার অরণ্যের মাঝে
হয়ে যায় লীন ! সেই মহা শূন্যে যেন
অট্ট হাসে পূর্ণ করি দিক দিগন্তর
নৃত্য করে উন্মত্ত সে কোন্ দিগম্বর !

তারি মধ্যে তুমি আমি ছিনু কি নিদ্রায়
কত দিন কত কাল কত যুগ ধরে ?

তারপর হেসে উঠে নব বসুন্ধরা
ফলে পুষ্পে ভরা ভরা ! কৌতুকে অপার
চাহিল নয়ন মেলি নব সূর্য্যপানে !
মোরাও জাগিনু দোঁহে ! মধুবন মাঝে
আমি বনস্পতি ওগো ! তুমি বনলতা ।
কি আনন্দে কি গৌরবে মেলিলাম আঁখি !
আঁকড়িয়া ধরিলাম কঠিন হৃদয়ে,
মধুর কোমল কান্তি সেই লতিকারে !
গলাগলি জড়াজড়ি মিলন রভসে !
হেসে হেসে উঠিল সে নব বসুন্ধরা !

সেই বার সেই মোর ভ্রমর জনম !
গুন্ গুন্ গাহি গান ভ্রমি বনে বনে !
বুকে লয়ে জন্মান্তের বিরহ বেদন
গুন্ গুন্ গাহি গান ভ্রমি আনমনে !
অকস্মাৎ এক দিন কানন প্রান্তরে
অপূর্ব্ব কুসুম রূপে উঠিলে ফুটিয়া !
আনন্দেতে আগুসারি মিলন তৃষায়
যেমনি আসিনু কাছে, কোন ঝটিকায়
ছিন্ন ভিন্ন হয়ে তুমি কোথায় লুকালে
খুঁজিতে খুঁজিতে গেল ভ্রমর জনম ।

তারপর মনে আছে ? ভেলায় ভাসিনু
তুমি আমি নরনারী জীবন-সাগরে !
আশ্চর্য্য অবাক হয়ে আমি চেয়ে ছিনু,

কি জানি কেমন করে তুমি চেয়ে ছিলে!
কুসুমিত মুখকান্তি; মধু দেহলতা;
দোল দোল ঝল ঝল রূপের গৌরবে?
সে কি প্রেম? ভালবাসা? আকাঙ্ক্ষা? বাসনা?
কোন্ টানে চেয়ে থাকা এমন নীরবে?
চাহিতে চাহিতে কেন উঠিল তুফান?
তুমি আমি ডুবিলাম সে কোন্ সাগরে?

তারপর? পশুপক্ষী করিনু শিকার;
ভীষণ অরণ্য মাঝে ব্যাধের জনম।
একদিন বনপ্রান্তে ত্রস্তা সে হরিণী
যেমনি ফেলিনু তারে বাণবিদ্ধ করে,
সজল সরোষ আঁখি ভরা বেদনায়
কোথা হ'তে বাহিরিলে বন আলো করে!
নতজানু হয়ে কত ক্ষমা চাহিলাম
কহিলে না কোন কথা ছুটে চলে গেলে!
ওগো বনলতা! ওগো করুণারূপিণি!
সে জনমে আর কভু করিনি শিকার।

বন শকুন্তলা তুমি বনের মাঝারে
লতা-পাতা-ঘেরা ক্ষুদ্র মোদের কুটীর!
এ জনমে কাঠুরিয়া কাঠ কাটিতাম
ফল মূল জল তুমি বহিয়া আনিতে!
একদিন আক্রমিল কৃতান্তের মত
নিষ্ঠুর দস্যুর দল ঘোর অন্ধকারে!
শাণিত ছুরিকা লয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে
তোমার আমার বক্ষে বসায়ে দিলাম।

সেদিন একত্রে মোরা যাত্রা করিলাম
কোন্ টানে কি আশায় নিশার মাঝারে!

পরজন্মে জনমিলে মধু পদ্ম-আঁখি
রাজার নন্দিনী হয়ে! তব মালঞ্চের
আমি ছিনু মালাকর! প্রভাতে সন্ধ্যায়
গাঁথিতাম মালা, তুলি ফুল কাননের!
কি জানি কি বহে যেত শিরায় শিরায়!
কত হাসিতাম, কাঁদিতাম থাকি থাকি!
একদিন মালা দিতে কি দিনু কি জানি!
ধরা প'ড়ে গেনু! পরদিন বধ্য ভূমে
যবে নিবু নিবু প্রাণ, ঊর্দ্ধে চেয়ে হেরি:
জ্বলিছে গবাক্ষে দুটি অশ্রুভরা আঁখি।

সৈনিকের বধূ তুমি সে কোন জনম?
ছিলে মোর বক্ষ ভ'রে! দেহ মন গড়া
অনলে বিদ্যুতে ফুলে! চোখে হোমশিখা!
চপলা চমকে বুকে! অঙ্গের লাবণি
কুসুম স্তবক সম মধুর কোমল!
অকস্মাৎ রণভেরী উঠিল বাজিয়া!
শক্রর কৃপাণ যবে লাগিল হৃদয়ে,
একবার ভয় হ'ল পাছে যত্নে রাখা
চিত্ত মাঝে তব মূর্ত্তি ছিন্ন হ'য়ে যায়?
পরক্ষণে হাসিলাম; ফুরাল জনম!

আমি কবি, রাজগৃহে গাহিতাম গান
প্রহরে প্রহরে! কত শত জনমের
মিলন বিরহ ব্যথা সুখ দুঃখ আশা

ফুটিয়া উঠিত যেন সেই জনমের
প্রত্যেক গানের মাঝে! কারে খুঁজিতাম?
একদিন হেরিলাম লতার আড়ালে
কাল' কাল' দুটি চোখ, ঢাক ঢাক যেন
এলো মেলো চুলে! সেই দৃষ্টি, সেই হাসি!
সেই কত জনমের চেনা চেনা ভাব!
চমকিয়া উঠিলাম : বন্ধ হ'ল গান।

তারপর? পরজন্মে আমি চিত্রকর,
রূপসী রমণী তুমি ধনীর সংসারে!—
বহুজন সমাকীর্ণ বিপুল সে পুরী!
একদিন তোমারই আলেখ্য আঁকিতে
আমারে লইয়া গেল নয়ন বাঁধিয়া
কত রাস্তা গলি ঘুঁচি কত সিঁড়ী দিয়া
একটি কক্ষের মাঝে? সম্মুখে দর্পণ,
তারি মাঝে ভাসিতেছে প্রতিবিম্ব তব!
হৃদয়ের রক্ত দিয়া আঁকিনু সে ছবি!
হেরি কহে সবে, অপূর্ব্ব এ চিত্রকর!

মনে কি পড়ে না সেই শিবের মন্দির?
আমি যে পূজারী ছিনু সেই দেবতার।
তুমি সেবাদাসী! কোথা হ'তে এসেছিলে
নাহি জানি! দিবারাত্র মন্দির প্রাঙ্গণে
ফুল্ল কুসুমের মত রহিতে পড়িয়া—!
সেই ঢল ঢল ঢল অঙ্গের লাবণি!
একদিন পূজা শেষে, আকুল অধীর
মত্ত প্রাণে যেই তোমা বক্ষে বাঁধিলাম,

চূর্ণ হ'য়ে পড়ে গেল মস্তকে আমার—
কোন্ জনমের সেই শিবের মন্দির!

একি সত্য? একি মিথ্যা? জানিনা জানিনা
শুধু জানি এই লীলা অনন্ত কালের!
জানি আমি জন্মে জন্মে তোমারে পেয়েছি,
পরশ লভেছি কত ভাবে কত বার!
তারি চিত্রগুলি যেন ভেসে ভেসে আসে
আলোক ছায়ার মত মোর চিত্ত বাসে।
তোমারেই পাই ওগো, বারে বারে বারে
তরঙ্গের মত মোর মরম বেলায়!
মিলনে বিরহে কত! আর তারি সনে
যেন বেজে উঠে অনাদি কালের বীণা!

অনন্ত কালের লীলা নহে একদিনে!
সৃষ্টির প্রথম হ'তে চির প্রসারিত
মোর বাহু দুটি, জন্ম জন্ম করি ভেদ
বিদ্ধ করি ব্যস্ত করি যুগ যুগান্তর!
তারি আলিঙ্গন মাঝে, ধরা পড়ে গেলে
সেই দিন! যেন কোন্ মহাদেবতার
মহা-মিলনের তরে মিলেছি আমরা,
যুগে যুগে জনমে জনমে বার বার!
তাই সন্ধ্যাকাশতলে উঠিলে ফুটিয়া;
ফোটনি ফোটনি প্রাণ, শুধু একদিনে।

শর্ম্মার ঝুলি

নবমী-শারী

সাতুরামের ঝুলির দ্বিতীয় প্রবন্ধটি অশ্বত্থপত্রে লিখিত। ইহাতে তিনি পূর্ব্ব-বঙ্গের একটি নবমীর শারীগান লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। আমি তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম ;—

আমাদের গ্রামের হালদারবাড়ীতে দুর্গোৎসব হয়। সেখানে নবমী-শারীর দল আসিয়াছে শুনিয়া আমি দেখিতে গেলাম। দুই দলের দুইজন যুবক অগ্রণী হইয়া দাঁড়াইয়া গান আরম্ভ করিয়া দিল। তাহাদের সেই গানের মধ্যে বেশ বাক্‌বিতণ্ডা চলিতে লাগিল।

প্রথম যুবক গাহিল—

দেবী আমাদের সবার আপন,
দেবী আমাদের সবার মা।

দ্বিতীয় যুবক গাহিল—

দেবী আমাদের জাগ্রত-স্বপন,
দেবী আমাদের কেহই না॥

প্র, যু। দূর্ পাজি! বল্লি কিরে?

দ্বি, যু। তোর বাবার কাছে জিজ্ঞাসা করিস্, ভাল বলেছি কি মন্দ বলেছি। তিনি ত একজন শাস্ত্রী পণ্ডিত?

প্র, যু—দেবী আমাদের শুধু মাতা নয়—
স্তরে স্তরে তার স্নেহ-ফোয়ারা।

দ্বি, যু—দেবী আমাদের কালকূটময়,
পরলে পরলে গরল ভরা॥

প্র, যু। এটা একরূপ মন্দ বলিস্ নাই। কেননা বেটী অনেকের উপরেই বিষ-নয়নে নজর করে।

দ্বি, যু। আমি একটাও মন্দ বলিব না। কিন্তু তুই যে বুঝতে পারবিনা, তাই আমার দুঃখ।

প্র, যু—দেবী আমাদের কুসুম-কোমল,
তাহে নবনীর আস্তর করা।
দ্বি, যু—দেবী আমাদের অলঙ্ঘ্য অচল,
পাষাণ-ভাঙ্গা পাষাণে গড়া॥
প্র, যু—দেবী আমাদের শারদ গগন,
রবি শশী কোলে কেমন হাসে।
দ্বি, যু—দেবী আমাদের ঘোর-দরশন
চন্দ্র সূর্য্য তারা বিশ্ব বিনাশে॥

প্র, যু। এটা কেমন হৈল গা?

দ্বি, যু। তা'ত বাপু পূর্ব্বেই বলেছি যে, তুই সকল কথা বুঝতে পারবি না। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোনও কোনও স্থানে সর্ব্বদাই মহাপ্রলয় ঘটিতেছে।

প্র, যু—দেবীর মায়া সুখ-সৌদামিনী,
পথিক জনায় পথ প্রকাশে।
দ্বি, যু—দেবীর মায়া ভীষণ অশনি,
পথিক জনায় পরাণে নাশে॥

প্র, যু। তা ঠিক্ বলেছিস্। স্বয়ং মহেশ্বরই ঐ মায়ায় পড়িয়া হত হইয়াছিলেন।

দ্বি, যু। অঠিক্ কোনটাই বলিতেছি না।

প্র, যু—দেবী সাধনা নীরদের জল,
ভক্ত চাতকের শুধু ভরসা।
দ্বি, যু—দেবী সাধনা উল্কার অনল;
সাধকের সে পরাণ-নাশা॥
প্র, যু—(এও মিথ্যা নহে; কারণ—)
যেজন ডাকে তারা, তারা,
তারে ক'রে ও যে সারা।"

দ্বি, যু। মিথ্যা বলার প্রয়োজন?

প্র, যু—দেবীর চিন্তা শান্ত স্রোতস্বতী,
অবগাহি নর শ্রান্তি হরে।
দ্বি, যু—দেবীর চিন্তা নদী বেগবতী,
নাবিলেই নর ডুবিয়া মরে॥
প্র, যু—(এ কথাও সত্য।—)
যেজন ভাবে, সেজন ডোবে।

দ্বি, যু। হাঁ, এইবার ঠিক বুঝেছিস্।

প্র, যু—দেবীর হৃদয় নন্দন কানন,
বহে তাহে সদা সুগন্ধি বায়।
দ্বি, যু—দেবীর হৃদয় মরু বিভীষণ,
সদা মহাকাল সঞ্চরে তায়॥

প্র, যু। বুঝাও দেখি বাপু!

দ্বি, যু। অনেক কথা। এটাও তোর বাবার কাছে বুঝিস্

প্র, যু—দেবীর হৃদয় প্রেমের আলয়,
সদা দয়ানন্দে বোঝাই করা।
দ্বি, যু—দেবীর হৃদয় পূতি-গন্ধময়,
চৌরাশি কুণ্ড নরকে ঘেরা॥

প্র, যু। সর্ব্বনাশ! এটা বল্লি কিরে?

দ্বি, যু। ভালই বলেছি। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরী যিনি, তিনি কি নরক আঁস্তাকুড় ছাড়া রে?

প্র, যু—ঠিক্ বলেছিস্ দাদা ভাই।
বর দিয়ে চল্ চ'লে যাই॥

দুইজনে একত্র হইয়া—

"ও দেবি-ই-ই তুই কে,
ছাগল খা'লি-ই-ই কড়ি দে।
"খেলেম ছাগল দিলেম বর,
ভক্তেরা সব কোটীশ্বর।"

ইহাই নবমী-শারীর সমাপ্তি-বর। শারীদারেরা কলা নারিকেল চিড়া মুড়ী খাইয়া বিদায় হইল। আমিও গানের কথা ভাবিতে ভাবিতে বাড়ী ফিরিলাম।

শ্রীগঙ্গাচরণ নাগ।

নবদ্বীপে মাতৃমন্দির

নূতন সেবা-ধর্ম্ম।

কর্ম্মবিপাকে অনেকদিন হইতে বাঙ্গলার বাহিরে আছি। তাই বাঙ্গলাদেশ ও সমাজের মধ্যে ভাব-প্রবাহের যে নব নব ধারার সৃষ্টি হইতেছে, তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটিয়া উঠিবার সুবিধা হয় না। দেশ ও সমাজের হিতার্থ যে সকল সদনুষ্ঠানের উদ্যোগ, আয়োজন ও প্রতিষ্ঠা হইতেছে—সে সকলের পরিচয় কেবল সংবাদ-পত্রের স্তম্ভের মধ্য দিয়াই পাই। তাহার মূল উৎস কোথায়, জীবনী-শক্তি কিসের উপর নির্ভর করিতেছে, সমাজ শরীরের কোন্ রক্তবহা নাড়ীর সঙ্গে তাহাদের যোগ—এ সকল তত্ত্ব বুঝিবার ও জানিবার সুযোগ প্রায়ই পাওয়া যায় না।

এবার কিন্তু এইরূপ একটি সুযোগ পাইয়াছিলাম। কিছুদিন পূর্ব্বে যুগাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাক্ষেত্র শ্রীনবদ্বীপধাম দেখিতে গিয়াছিলাম। দেখিয়া হতাশ হইলাম, হৃদয়ে বেদনা লাগিল। প্রেম-ময় মহাপ্রভুর প্রেমের লীলাক্ষেত্র যে নবদ্বীপ মানসপটে আঁকিয়া রাখিয়াছিলাম, এ নবদ্বীপের সঙ্গে ত তাহার মিল হইল না। এ যে ভাণ ও কপটতার রাজ্য, অর্থপিশাচের পীঠস্থান—কামের দূষিত বাষ্পে বিষাক্ত নরকপুরী! কোথায় সে প্রেম—কোথায় সে ত্যাগ—কোথায় বা 'জীবে দয়া নামে রুচি'! এ ত নবদ্বীপ নয়—এ যে নবদ্বীপের শ্মশান! লালসার অগ্নি ধিকি ধিকি এখানে জ্বলি-তেছে, আর পিশাচেরা তাহার চারিদিকে নৃত্য করিতেছে! দেখিয়া ভগ্নহৃদয়ে ফিরিয়া আসিতেছিলাম। এমন সময় সেই শ্মশানের এক-পাশে চোখে পড়িল এক অপূর্ব্ব মন্দির! নিকটে যাইয়া দেখি—একি! এ যে মৃত্যুর মধ্যে জীবন—ধ্বংসের মধ্যে সৃষ্টির অঙ্কুর—

কাম ও লালসার মধ্যে সেবার সাধনা—ভোগের মধ্যে ত্যাগব্রতের অনুষ্ঠান! কয়েকজন সেবকে মিলিয়া এখানে পূজার আয়োজন করিয়াছেন। দেখিয়া প্রাণে আশা হইল। ভাবিলাম প্রেমাবতার মহাপ্রভুর এককণা প্রেম নবদ্বীপের শ্মশানের মধ্যে ইহারা কুড়াইয়া পাইয়াছে। যে প্রেম প্রভু আমার অযাচিত ভাবে দুই হাতে বিলাইয়াছিলেন, সে যে সকলে দুই পায়ে ঠেলিয়া উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছে! যদি জগৎ তাহা ধরিয়া রাখিতে পারিত, তবে প্রেমের প্লাবনে এতদিন জগৎ ডুবিয়া যাইত। হিংসা, দ্বেষ, লালসা ও কামের তীব্রজ্বালা এত আর থাকিত না। সেই উপেক্ষিত প্রেমেরই বুঝি একবিন্দু পাইয়া ইহারা অমৃতের উৎস খুলিয়া দিয়াছে! অন্ধকারের মধ্যে আলোর বর্ত্তিকার ন্যায়—মরুভূমির মধ্যে জলের ন্যায়—দুর্ভিক্ষের মধ্যে অন্নের ন্যায় ইহারা একেবারে আসল জিনিসটি লইয়াই উপস্থিত হইয়াছে। সে জিনিস পতিতের সেবা, প্রেমের পূজা—ভগবানের প্রেমে মানুষের জন্য আত্মসমর্পণ!

পতিতের সেবা, দীন দরিদ্রের জন্য আত্মদান—সে যে বড় কঠিন কথা! আমরা সব সম্ভ্রান্ত, আমরা সব উন্নত, সমাজসৌধের উচ্চশিখরে আরূঢ়;—আমরা কি করিয়া ভূপতিত দীন দুঃখীদের সেবা করিব? আমরা ধার্ম্মিক, সুনামের শুভ্রবসন পরিয়া থাকি;—অধঃপতিত, সমাজ ও সদাচারভ্রষ্ট, কলঙ্কিত অধার্ম্মিকদের জন্য কি করিয়া আমরা বাহু বাড়াইয়া দিব? আমাদের যে পুণ্যের ক্ষয় হইবে, প্রতিষ্ঠাগর্ব্ব মলিন হইয়া যাইবে!

আমরা ত শাস্ত্রের দোহাই দিয়া নিয়ম করিয়াছি যে, বিধবা কঠোর ব্রহ্মচর্য্য করিয়া দিন কাটাইবে, তা সে শিশুই হউক আর বালিকাই হউক। সমাজের কঠোর বিধানের সম্মুখে তাহারা যন্ত্র মাত্র। নিজেদের হৃদয়বৃত্তিকে সম্পূর্ণ লোপ করিয়া যন্ত্রের মতই তাহারা সমাজের কঠোর অনুশাসন মানিয়া চলিয়া যাইবে। এই অনুশাসনই তাহাদের ধর্ম্ম, তাহাদের ইহকাল ও পরকাল। যদি

কঠিন পিচ্ছিল অনুশাসনের পথ হইতে কেহবা একটু ভ্রষ্ট বা বিচলিত হয়, তবে তাহার আর রক্ষা নাই। একেবারে অখ্যাতি ও নরকের অতল গহ্বরে তাহাকে পড়িতে হইবে;—অনন্ত সূর্য্যা-লোকহীন অন্ধকারের দেশে তাহাকে ডুবিয়া যাইতে হইবে। যে তাহাকে টানিয়া তুলিবে, যে তাহাকে উদ্ধার করিবে—তাহাকেও যে সেই পতিতের সঙ্গে অন্ধকারের গহ্বরেই ছিট্‌কাইয়া পড়িতে হইবে!

বাঙ্গলার হিন্দু-সমাজের অনেক বিধবা ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করিয়া দেবী পদবীতে আরোহণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা পুণ্যের আদর্শ —আত্মত্যাগ ও পবিত্রতার প্রতিমূর্ত্তি। কিন্তু সকলেই ত আর এই কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের পুণ্যানুশাসনে নিজের জীবনকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে না? দুর্ব্বল মানব; প্রবৃত্তি ও ইচ্ছা সর্ব্বদাই তাহার মধ্যে সংগ্রাম করিতেছে। দেহের ধর্ম্ম—সহজ হৃদয়ের ধর্ম্ম তাহার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিতে চাহিতেছে। তাই কেহ কেহবা সহজ প্রকৃতির বশবর্ত্তী হইয়া ব্রহ্মচর্য্যের কঠোর পথ হইতে স্খলিত হইয়া পড়ে, সদাচারভ্রষ্ট হইয়া শুক্রশোণিত-সুলভ চপলতাকে আশ্রয় করিয়া থাকে। সমাজ ইহাদিগকে ক্ষমা করে না; আপনার আশ্রয়-গণ্ডীর মধ্য হইতে ইহাদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। আর এই জন্য ইহারা সর্ব্বসাধারণের উপেক্ষিতা ঘৃণার পাত্রী হইয়া লজ্জা ও কলঙ্কের অন্ধকারের মধ্যে আপনাদিগকে লুকাইতে চেষ্টা করে;—একটা পাপ ঢাকিতে গিয়া আরও গভীরতর পাপে লিপ্ত হয়। উপেক্ষিতা, ঘৃণিতা, আশ্রয়হীনা এই সব হতভাগিনীদিগকে আশ্রয় দিবে কে? —কে ইহাদিগকে পাপের ক্রমপিচ্ছিল পথ হইতে রক্ষা করিবে? —পুণ্যের ও প্রতিষ্ঠার গর্ব্ব দূর করিয়া কে ইহাদের জন্য ত্যাগ স্বীকার করিতে যাইবে? যাহাতে নাম হয়, যশ হয়, প্রতিষ্ঠা হয়, বড় লোকের সঙ্গে সংশ্রব হয়—এমন কাজের জন্য চেঁচাইতে, গণ্ডগোল করিতে, বাঙ্গলাদেশে ঢের লোক আছে। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠাহীন,

পুরস্কারহীন, যশের আশাহীন কার্য্যের জন্য ;—বিপন্না, আশ্রয়হীনা, সমাজ-বহিষ্কৃতাদের সেবার জন্য আত্মদান করিবার মত লোক বাঙ্গলা-দেশে বাস্তবিকই দুর্লভ! এই "মাতৃমন্দিরের" সেবকেরা সেই দুর্লভ শ্রেণীর লোক। ইঁহারা সর্ব্বপ্রকার প্রতিষ্ঠা, সুনাম ও লাভের আশা ত্যাগ করিয়া সেই হতভাগিনী, সমাজ-উপেক্ষিতাদের সেবাতেই কায়মন-প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন। বাঙ্গলাদেশে এ নূতন দৃশ্য—নূতন জীবনের সূচনা—আশার অরুণালোক! তাই বলিতেছিলাম,—নবদ্বীপের শ্মশানের মধ্যে, ধ্বংসস্মৃতির মধ্যে, এই নবীন আশার সূচনা দেখিয়া, হৃদয়ে বড়ই বল আসিল, প্রাণে নূতন ভবিষ্যতের ছবি জাগিয়া উঠিল। মনে হইল মহাপ্রভুর সেই প্রেম ও সেবার ধর্ম্ম বুঝিবা মরিয়াও মরে নাই ; কাম ও লালসার আগুনের মধ্যে সেই খাঁটী সোণা বুঝিবা পুড়িয়াও পুড়ে নাই।

নীতিবাদীরা হয় ত এতটা অত্যাচার সহিবেন না। পাপ যে সর্ব্বথা পরিত্যজ্য। সেই ঘৃণ্য হেয় জিনিসটাকে দূরে দূরে রাখিতে হইবে। দূষিত ব্যাধির বীজের ন্যায় তাহাকে সর্ব্বপ্রকারে নষ্ট করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। তাহাকে সমূলে নষ্ট না করিয়া যদি তাহাকে প্রশ্রয় দেওয়া যায়, তবে সমূহ অনিষ্টেরই সম্ভাবনা। তাহাতে পুণ্যের আধিপত্য খর্ব্ব হইবে—পাপ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে। কিন্তু ইহাই কি পাপ বিনাশের একমাত্র বা শ্রেষ্ঠতম উপায়? এই প্রতিহিংসা-নীতি ত পশু ও পশুবৎ আদিম মানবেরই যোগ্য। আদিম সমাজে পাপ দ্বারাই পাপের প্রতিশোধ দিবার রীতি ছিল। হত্যা দ্বারা হত্যাকে, হিংসা দ্বারা হিংসাকে রোধ করিলে তবেই কর্ত্তব্য করা হইত। প্রাচীন দণ্ডনীতিতে সেই একমাত্র ব্যবস্থা ছিল। আর আধুনিক অনেক সুসভ্য জাতির দণ্ড-নীতির মধ্যেও ত তাহার সুস্পষ্ট ছাপ রহিয়াছে। কিন্তু সভ্যতার ও জ্ঞানের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ত সেই নীতির পরিবর্ত্তন হইয়াছে। মানুষ বুঝিয়াছে হিংসাদ্বারা হিংসাকে, পাপদ্বারা পাপকে দমন করা যায় না ;

পরন্তু ক্ষমাদ্বারাই পাপকে প্রতিহত করিতে হয়, প্রেমদ্বারাই হিংসাকে জয় করিতে হয়। সমাজের মধ্যে যে পাপের উদ্ভব হইয়াছে সে ত সমাজের নিজেরই সৃষ্টি। তাহার 'আওতার' মধ্যে থাকিয়াই ত এ পাপের বীজ বাড়িয়াছে। সেই সব পাপবৃক্ষের ডাল উপর হইতে কাটিয়া দিলেই ত আর তাহার ক্ষয় হইবে না। নীচে যে বীজ উপ্ত আছে, তাহা হইতে আবার নব নব অঙ্কুরের উদ্গম হইবে। যে 'আওতার' মধ্যে বীজের পরিপুষ্টি, তাহার পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। যে সৃষ্টি সমাজের নিজেরই, সমাজ তাহাকে ত্যাগ করিলে, দূরে রাখিতে চাহিলে ত চলিবে না। তাহার ভার সমাজকে নিজেই যে লইতে হইবে। সমুদ্র যেমন ঝটিকা সংবরণ করিয়া থাকে, তেমনই এ পাপের বেগ যে সমাজকেই সংবরণ করিতে হইবে।

এই যেসব পতিতা, সমাজ-পরিত্যক্তা হতভাগিনী ;—কে ইহাদের জন্য দায়ী, কে ইহাদের এরূপ করিয়া তুলিয়াছে? তুমি সমাজ যতই চোখ রাঙ্গাও না কেন, আমি জোর করিয়া বলিব, ইহা তোমারই সৃষ্টি; তোমার বিধি, তোমার ব্যবস্থা, তোমার প্রথা, অনুশাসন—ইহারাই এই সকলের মূল। যে সমাজ মানব-হৃদয় বোঝে না, মানুষের স্বাভাবিক বৃত্তির পরিচয় রাখে না, তাহাকে কেবল যন্ত্রের মত পিষিয়া মারিতে চায়, তাহার ভিতর হইতে এ সকলের উদ্ভব হইবে, ইহা কিছুমাত্র আশ্চর্য্যের কথা নহে। তুমি সমাজ, তুমি ত শুধু পুরুষের সমাজ। পুরুষ সর্ব্ববিধ পাপ ও লালসাতে ডুবিয়া-ভাসিয়াও তোমার মধ্যে মাথা উন্নত করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে। তোমার যত শাস্তি, যত নির্য্যাতন, দুর্ব্বল নারীর উপর। কিন্তু সে হতভাগিনী ত অনেক স্থলে শুধু পুরুষের কামের ইন্ধন, বিলাসযজ্ঞের আহুতি—লালসাতৃপ্তির উপাদান মাত্র। অথচ তোমার বিচারে সে-ই সকলের জন্য দায়ী। যে নরাধম তাহাকে ভোগের সহায় করিয়াছিল, সে তোমার চক্ষে নিষ্কলঙ্ক শুভ্র; আর সেই অসহায় দুর্ব্বল নারীর উপরেই তোমার যত বিধিব্যবস্থা, কঠোর অনুশাসন! নারী যে

আত্মাশক্তি—ভগবানের হ্লাদিনী ভাবের অংশ—রসের বিকাশ। সেই আত্মাশক্তিরূপিণী, রসমূর্ত্তি—একাধারে জননী ও সহধর্ম্মিণী নারীকে প্রাচীন ঋষিরা স্বরূপ মূর্ত্তিতে দেখিয়াছিলেন। তাই হিন্দুসমাজে নারীর অত উচ্চ মাহাত্ম্য কার্ত্তিত হইয়াছিল, অমন উদার আদর্শ কল্পিত হইয়াছিল। আজ অধঃপতনের ঘোর অন্ধকারে আমরা দৈব-আলোক হারাইয়া, সে আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া, নারীমাহাত্ম্য ভুলিয়া গিয়াছি। তাই আমাদের মধ্যে নারীর এ অপমান, জননী—সহধর্ম্মিণীর এ হীন শোচনীয় অসহায় অবস্থা। এই অন্যায়, এই অবিচারই সমাজের যত পাপের মূল। তাহার মধ্যেই এই সকল কলঙ্কের বীজ অঙ্কুরিত হইয়া উঠিয়াছে। সমাজ আজ গর্ব্ব করিয়া, তেজ করিয়া, পুণ্যের স্পর্দ্ধা করিয়া যতই সে কলঙ্ককে ঢাকিতে চাহুক না কেন, তাহাকে দূরে পরিত্যাগ করিতে চাহুক না কেন, সে যে সমাজেরই নিজস্ব, সমাজের মধ্যেই বাড়িয়া উঠিয়াছে! সমাজকেই তাহা সংবরণ করিতে হইবে; যাহাতে তাহার বীজক্ষেত্রের পরিবর্ত্তন করিতে হয়, তাহাই করিতে হইবে। নহিলে সমাজের মঙ্গল নাই।

আজকাল পৃথিবীর স্থানে স্থানে সভ্যসমাজে প্রাচীন প্রতিহিংসা-নীতি ত্যাগ করিয়া এই ক্ষমা ও প্রেমের নীতি কিয়ৎপরিমাণে অবলম্বিত হইতেছে। কিন্তু একদিকে যেমন এই চেষ্টা চলিতেছে, অন্যদিকে তেমনি আধুনিক জীববিজ্ঞান ও তদুপরি প্রতিষ্ঠিত নবযুগের সমাজতত্ত্ব আর এক নূতন সমস্যা ও বাধা লইয়া উপস্থিত হইয়াছে। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফলে যোগ্যতমের জয়ই জীবরাজ্যের নিয়ম, ইহাই আধুনিক জীববিজ্ঞান আবিষ্কার করিয়াছে। এই যে কীটপতঙ্গ, পশুপক্ষী, ভূচরখেচর;—সকলের মধ্যেই ঘোরতর জীবনসংগ্রাম চলিয়াছে ও তাহার ফলে যোগ্যতমেরই জয় হইতেছে। যে অযোগ্য, দুর্ব্বল, অক্ষম—সে ধ্বংস হইয়া যাইতেছে, ধরাপৃষ্ঠে তাহার অস্তিত্বের লোপ হইতেছে। মনুষ্যসমাজেও তাহাই দেখিতেছি। এখানেও ঘোরতর জীবনসংগ্রাম ও তাহার ফলে যোগ্যতমের জয় হইতেছে;

অযোগ্য পিছাইয়া পড়িতেছে—লুপ্ত হইয়া যাইতেছে। এই প্রাকৃতিক নীতি মানবসমাজকে উন্নতির পথেই লইয়া যাইতেছে। দুর্ব্বল, অক্ষম, অযোগ্যকে নষ্ট করিয়া, যোগ্যতমকে বাঁচাইয়া রাখিয়া, সমাজকে প্রকৃতি ক্রমেই উন্নততর ও বিশুদ্ধতর করিয়া তুলিতেছে। যে সমাজ নিজের উন্নতি করিতে চায়, তাহাকে প্রকৃতির এই সনাতন রীতিই অবলম্বন করিতে হইবে। অযোগ্যকে অক্ষমকে প্রশ্রয় দেওয়া হইবে না; তাহাকে বাড়িতে দেওয়া হইবে না;—সমাজের নির্ম্মম শাসনচক্রে তাহাকে পিষিয়া মারিতে হইবে। আর এইরূপে যোগ্যের জয়, অযোগ্যের ক্ষয় করিতে হইলে, এক দিকে বীজশুদ্ধি ও বংশানুক্রমের নীতি,—অন্যদিকে অযোগ্যদমনের কঠোর দণ্ডবিধি অবলম্বন করিতে হইবে। সমাজতত্ত্বে ইহাই আধুনিক তথা-কথিত বৈজ্ঞানিক পন্থা। যাহাতে সমাজে বিশুদ্ধ বীজের রক্ষা হয়, অযোগ্য ও অক্ষম যাহাতে নিজেদের বংশ বিস্তার না করিতে পারে, তাহাই আধুনিক সমাজ-ব্যবস্থার একটা প্রধান লক্ষ্য করিবার বিষয়। সুতরাং তোমরা যদি এই সকল পতিতা হতভাগিনীদিগকে আশ্রয় দাও, সমাজ শরীরে তাহাদের দূষিত বীজ প্রবেশ করিতে দাও, তাহা হইলে সমাজের ধ্বংসেরই প্রশ্রয় দেওয়া হইবে। অযোগ্য, দুর্ব্বল, অক্ষম, দুষ্ট বীজকে পুষিয়া রাখিয়া সমাজকে অধঃপতনের দিকেই লইয়া যাওয়া হইবে।

এ সকল কথা কিয়ৎপরিমাণে সত্য, ইহার মধ্যে একটা সত্যাভাস ও যুক্ত্যাভাস রহিয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাই সমগ্র সত্য নহে। প্রথমতঃ জীবরাজ্যে জীবনসংগ্রামই একমাত্র নীতি নহে। কঠোর সংগ্রাম ও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যোগ্যতার জয়ই যদি একমাত্র প্রাকৃতিক রীতি হইত, তবে এ বিশ্ব-সৃষ্টি-প্রবাহ রক্ষিত হইত না বা বিকাশের পথে চলিত না। জাগতিক ব্যাপারের মধ্যে বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিলে প্রতিযোগিতা ও জীবনসংগ্রাম ছাড়া আর একটি নীতি লক্ষ্য করা যায়;—সেটি হইতেছে সহযোগিতা ও প্রেম। জীবরাজ্যে, উদ্ভিদ্‌রাজ্যে সর্ব্বত্রই

এই নীতির ক্রিয়া দেখা যায়। দলবদ্ধ উদ্ভিদের সহকারিতায় ইহার যেমন আভাস পাওয়া যায়, আবার পিপীলিকার সমাজগঠনেও তাহার স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। আর জীবরাজ্যে যতই উচ্চতর সোপানে আরোহণ করা যায়, ততই এই প্রেম ও সহযোগিতার বিকাশ স্পষ্টতর হয়। শুধু জীবনসংগ্রাম সৃষ্টিরক্ষার পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে; ইহা বিশ্বনীতির একাংশ মাত্র। বিশ্বনীতির আর একাংশ—এমন কি প্রবলতর অংশ—এই সহযোগিতা ও প্রেম। ফলতঃ জীবে-জীবে মারামারি কাটাকাটিই জীবন-সংগ্রামের সত্য অর্থ নয়। প্রত্যেক জীবকে আত্মরক্ষার ও আত্মবিকাশের জন্য প্রতিনিয়তই আপনার পরিবর্ত্তনশীল পারিপার্শ্বিক অবস্থার ও ব্যবস্থার সঙ্গে নিজেকে মানাইয়া চলিবার জন্য প্রাণান্ত প্রয়াস করিতে হয়। ইহাই সত্য জীবন-সংগ্রাম। এই সংগ্রামে যে জয়ী হয়, অর্থাৎ যে সর্ব্বাপেক্ষা কৃতিত্বের সঙ্গে আপনার পরিবর্ত্তনশীল পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে নিজের জীবনরক্ষার ও শক্তিবৃদ্ধির সহায় করিয়া তুলিতে পারে, সে-ই জীব-বিজ্ঞানের বিচারে যোগ্যতম জীব। আর সমাজ-বিজ্ঞান ও আধুনিক ধর্ম্মনীতি-জীববিজ্ঞানের এই সত্যকে গ্রহণ করিয়াই সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিকে এই যোগ্যতমের পদবীতে উন্নীত করিতে চেষ্টা করে। বলিতে গেলে জীবের এই কৃতিত্বকে ফুটাইয়া তুলিবার জন্যই প্রতিযোগিতা ও জীবন সংগ্রামের প্রয়োজন।

মানবসমাজ জীবরাজ্যের উচ্চতম স্তর। সুতরাং এখানেই প্রেম ও সহযোগিতারূপ বিশ্বনীতির সম্যক বিকাশের কথা। আদিম যুগের মানব কতকটা অর্দ্ধপশু। সুতরাং তাহার মধ্যে পশুধর্ম্ম ও সঙ্গে সঙ্গে প্রতিযোগিতা ও সংগ্রামের নীতিই অপেক্ষাকৃত প্রবলভাবে ব্যক্ত হইতে দেখা যায়। কিন্তু সভ্যতাবৃদ্ধির সঙ্গে, মানবসমাজের ক্রমোন্নতির সঙ্গে, তাহার মধ্যে প্রেম ও সহযোগিতার প্রভাবই ক্রমশঃ বেশী পরিস্ফুট হইয়া উঠে। তাই আধুনিক যুগের সভ্য মানব আর তাহাদিগের বৃদ্ধ ও রুগ্নদিগকে পুড়াইয়া খায় না;—অসহায়, পতিত-

দিগকে আর দূরে পরিত্যাগ করিতে চায় না। সত্য বটে, এখনও 'সভ্যতম' আখ্যাধারী সমাজেও এই প্রেম ও সহযোগিতার নীতি সম্যক বিকাশপ্রাপ্ত হয় নাই। এখনও দীনদুঃখী ও পতিতদের আর্ত্তনাদে মানবসমাজ ব্যথিত ও ক্লিষ্ট; এখনও অসহায় ও দুর্ব্বলেরা সমাজচক্রের প্রবলের পেষণের যাতনায় ত্রাহি ত্রাহি চীৎকার করিতেছে। কিন্তু এ সকল সমাজের অপরিণত অবস্থার লক্ষণ। সমাজের পূর্ণ পরিণতির সঙ্গে এ-সকলই ক্রমশঃ দূর হইবে,—প্রতিযোগিতা ও সংগ্রামের অন্ধকারের মধ্যে ক্রমে প্রেমের আলো ফুটিয়া উঠিবে। তুমি সমাজতত্ত্ববিৎ বীজশুদ্ধির দোহাই দিয়া পতিত ও অক্ষমদিগকে যতই দূরে রাখিতে চাও না কেন, সমাজ তোমার কথা শুনিবে না; সমাজ সেই দীন ও পতিত-দিগকেই বুকে টানিয়া লইবে। কেননা, তাহাতেই যে তাহার শ্রেষ্ঠতম পরিণতি; তাহাই যে তাহার উচ্চতর সমাজধর্ম্ম—এক কথায়, মনুষ্যত্ব। পশুপক্ষী কীটপতঙ্গের মধ্যে—উদ্ভিদ্‌জগতে বিশ্বব্যাপী জীবন-সংগ্রাম ক্ষেত্রে সহযোগিতার অপেক্ষা প্রতিযোগিতারই প্রাবল্য ঘটিতে পারে। কিন্তু মানুষের মধ্যে—মানুষের সমাজে তাহা হইতে পারে না। তাহার মধ্যে উচ্চতর নীতির বিকাশেই তাহার সার্থকতা। ইহাতে যদি সমাজ দুষ্ট হয়, ধ্বংস হয়, তাহাতেও মানব পশ্চাৎপদ হইতে পারে না। যাহারা জীবনসংগ্রামের নীতির উপর ভর করিয়া যোগ্যতমের জয়ের দ্বারা আপনাদের সমাজকে বড় করিতে চায়, তাহারা তাহা-দের অর্দ্ধ পশুজীবন ভোগ করুক। কিন্তু যাহারা বিশ্বমানবের অনন্ত-গতির সঙ্গে আপনাদিগকে মিশাইতে চায়, তাহাদিগকে এই প্রেম ও সহযোগিতার মহাসাধনাকেই গ্রহণ করিতে হইবে।

আর এই যে পতিতের সেবা,—অসহায়, দীন, নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দান, অপরাধীকে ক্ষমা, ইহাই হইতেছে আধুনিক জগতের যুগ-ধর্ম্ম;—ইহাই শ্রেষ্ঠতম মানব ধর্ম্ম। আধুনিক ইউরোপে দার্শনিক-প্রবর কোমতে ইহার সূচনা করিয়া গিয়াছেন, আর ঋষি টলষ্টয় তাহার প্রচারে নিজের জীবন ব্যয় করিয়াছেন। ভারতে বহু-

পূর্ব্বেই ইহার প্রচার হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত এই শ্রেষ্ঠ প্রেম-ধর্ম্মের বার্ত্তাই জগতে ঘোষণা করিয়াছেন।—

মনসৈতানি ভূতানি প্রণমেদ্ বহু মানয়ন্।
ঈশ্বরো জীবকলয়া প্রবিষ্ট ভগবানিতি॥

(শ্রীমদ্ভাগবত—৩য় স্কন্ধ।)

সেই সচ্চিদানন্দ ভগবানই ত সর্ব্বভূতের মধ্যে আপনার আনন্দে আপনি লীলা করিতেছেন। সকলই যে তাঁর অংশ, সকলের মধ্যেই তিনি অনুপ্রবিষ্ট। তবে আর কে পতিত, কে নীচ, কে অধম, কে দুর্ব্বল? এই যে দুঃখ, এই যে কষ্ট, এই দারিদ্র্য, এই শোক—এ-যে সব তাঁরই লীলা। জীবের সঙ্গে লীলা করিবার জন্যই যে তাঁর এ সৃষ্টি। জীবের কাছে প্রেম ও সেবা পাইবার জন্যই যে তিনি এত ব্যস্ত। তাই স্বয়ং বলিতেছেন ;—

অথ মাং সর্ব্বভূতেষু ভূতাত্মানং কৃতালয়ম্।
অর্হয়েদ্ দানমালাভ্যাং মৈত্রাভিন্নেন চক্ষুষা॥

(শ্রীমদ্ভাগবত—৩য় স্কন্ধ।)

পতিতকে সেবা করা, অভাবগ্রস্তকে দান করা, নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দেওয়া—এ সকল ত তোমার অনুগ্রহ নয়, এ সব যে তাঁরই পূজা। তিনি যে এই সব পতিত ও দীনদের মধ্যেই আছেন ;—তিনি যে সকল দুঃখের মধ্যে, সকল দারিদ্র্যের মধ্যে, সকল অপমানের মধ্যে তাঁর লীলা-অভিনয় করিতেছেন! তাঁহাকে পাইতে হইলে আর বাহিরে যাইতে হইবে না। বিলাসের সুখ-স্বপ্নে—যশ-মান-পুণ্যের মনোরম সুগন্ধি-সুবাসিত কক্ষে তিনি ত তোমার কাছে আসিবেন না। আর তাঁহাকে যদি না পাও, তবে তোমার স্বর্গ জীবন্মুক্তি পরাগতি সকলই যে তুচ্ছ! যদি তাঁহাকে চাও, তবে দুঃখ দারিদ্র্য রোগ শোক যন্ত্রণার মধ্যে তাঁহাকে অনুসন্ধান কর ; ভক্ত যেমন বলিয়াছিলেন, সেইরূপ বলিতে চেষ্টা কর,—

ন কাময়েঽহং গতিমীশ্বরাৎ পরাম্
অষ্টর্দ্ধিযুক্তাং অপুনর্ভবং বা।
আর্ত্তিং প্রপদ্যেঽখিল দুঃখ ভাজাম্
অন্তঃস্থিতো যেন ভবন্ত্য দুঃখাঃ।

(শ্রীমদ্ভাগবত।)

আমি অষ্টসিদ্ধিযুক্ত পরম গতি চাই না বা অপুনর্জন্ম চাই না। জগতের সমস্ত দুঃখী জীবের হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া যেন তাহাদের সকল দুঃখভার গ্রহণ করিতে পারি এবং তাহাদের দুঃখ দূর করিতে পারি—ইহাই আমার একমাত্র কামনা।

ইহাই ভাগবতের প্রেম-ধর্ম্মের সার। এতকাল তোমরা শিখিয়া আসিয়াছিলে—স্বর্গ, অপবর্গ, সিদ্ধি, জীবন্মুক্তি। এ ত সব ভোগ ঐশ্বর্য্যের কথা। ভাগবত ত সে সব বলিলেন না। ভাগবত বলিলেন সে সব দূর করিয়া দাও। সে সবের মধ্যে ভগবান নাই। ভগবান্ আছেন দীন দুঃখী পতিত অধমদের মধ্যে—রোগ শোক আর্ত্তি দারিদ্র্যের মধ্যে। সেইখানে তাঁহাকে সেবা কর—পূজা কর, তবে ত তাঁহাকে পাইবে!

সহস্র বৎসর ধরিয়া এই কথা ভারতবর্ষের কর্ণে ধ্বনিত হইলেও ভারতবর্ষ ইহা ভাল করিয়া শুনে নাই; স্বর্গ ও জীবন্মুক্তির নেশায় আচ্ছন্ন হইয়া বোধ হয় সে চক্ষু খুলিতেই পারে নাই। এই জগতে অপূর্ব্ব, মানবের শ্রেষ্ঠ সম্পদ—প্রেম-ধর্ম্ম, সে এইরূপে একপ্রকার ভুলিয়াই গিয়াছিল। তাই পতিতপাবন শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর আসিলেন। ভাগবতের সেই মধুর প্রেম-ধর্ম্মের কথা, লীলাময় ভগবানের কথা আবার সকলকে শুনাইলেন। সেই দুঃখময়, বেদনাময়, হৃদয়ের নাথকে কিরূপে পাইতে হয় তাহা "আপনি আচরি জীবকে শিখাইলেন।" পাপী তাপী, দীন দুঃখী, দরিদ্র কেহই বাদ পড়িল না। পাষণ্ডী কপটী যত ছিল—অসহায়, আর্ত্ত নিরাশ্রয় যত ছিল—সকলেই সেই মহাপ্রেমের বন্যায় ভাসিয়া গেল। সঙ্গে

জুটিলেন পাগল নিত্যানন্দ ; তাঁহার ত আর স্থানাস্থান কালাকাল পাত্রাপাত্র জ্ঞান নাই। "তাই ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম" আপনি যাচিয়া দ্বারে দ্বারে বিলাইলেন। পুণ্যের আভিজাত্য দূর হইল, শুচিতার আবরণ খসিয়া পড়িল ; পাগল ক্ষেপা, ভাল মন্দ, উচ্চ নীচ, ছোট বড় সব সমভূমি করিয়া দিলেন। প্রেমের বন্যায় সব ডুবিয়া ভাসিয়া একাকার হইয়া গেল !

অনেক দিন ধরিয়া সেই মহান্ কথা—মধুর কথা ভারতবর্ষ শুনিয়া আসিতেছে। সেই লীলামৃত পান করিয়া আনন্দ অনুভব করিতেছে। আজিও কি সে তাহার প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিবে না ? সেই দুঃখের ধর্ম্ম—সেবাব ধর্ম্ম সে বরণ করিয়া লইবে না ? আজ নব-যুগের নব আন্দোলনের মধ্যে পৃথিবী জাগিয়া উঠিয়াছে ; মানব-সমাজ নূতন আদর্শেব দিকে অগ্রসর হইতেছে। এই দুঃখের ধর্ম্ম—সেবার ধর্ম্মই সেই নূতন আদর্শ—ভবিষ্যতের মহান্ ধর্ম্ম। ভাগবতে সেই প্রেম-ধর্ম্মের চরম বিবৃতি হইয়াছে ; শ্রীগৌরাঙ্গ তাহা নিজের জীবনে মূর্ত্তিমান করিয়া ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র বিলাইয়া দিয়াছেন। আজ ভারতবর্ষকে আবার তাহা সমস্ত পৃথিবীতে প্রচার করিতে হইবে। নবযুগের পতাকা তাহারই হাতে পড়িয়াছে। ওই যে জিঘাংসার মহাশ্মশানে, হিংসার রণতাণ্ডবের মধ্যে কালের ভেরী বাজিয়া উঠিয়াছে, উহাই সেই ভবিষ্যতের নবযুগের সূচনা করি-তেছে। ওই ভয়াবহ কুরুক্ষেত্রে, রক্তের প্লাবনে মানবহৃদয় সিক্ত হইলে, তাহাতেই নবীন ধর্ম্মের বীজ বপন করিবার সুযোগ হইবে। ভারতবর্ষকে সেজন্য প্রস্তুত হইতে হইবে ;—আম্রপত্রশোভিত মঙ্গলঘট স্থাপন করিয়া মহাপূজার উদ্বোধন করিতে হইবে। মাতৃ-মন্দিরের মধ্যে তাহারই সূচনা দেখিয়াছি। তাই তাহার সম্বন্ধে আজ এত কথা বলিতে ইচ্ছা হইতেছে ; তাহাকে সাদরে বরণ করিয়া প্রাণের কাছে টানিয়া আনিতে মন চাহিতেছে।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার।

নবিনচন্দ্রের "শৈলজা"*

অমর-কবি নবীনচন্দ্র যে সমুদায় বহুমূল্য রত্নসম্ভারে জননী বীণা-পাণির পূজামন্দিরে সুনির্ম্মল অর্ঘ্য রচনা করিয়াছেন—আমাদের বরণীয়া মাতৃভাষাকে চির-অম্লান পুষ্পাভরণে সাজাইয়াছেন, তন্মধ্যে "শৈলজা-চরিত্র" অন্যতম। শৈলজা নবীনচন্দ্রের চিত্রাঙ্কনা-প্রতিভার অপূর্ব্ব সৃষ্টি।

অমর-কবি নবীনচন্দ্রের সুভদ্রা দেবী, শৈলজা দেবী ভাবে মানবী। সাধারণ মর্ত্ত্যবাসী দেবতার চরণস্পর্শও করিতে পারে না—যদিইবা কদাচিৎ সৌভাগ্যক্রমে সে সুযোগ ঘটে, তবে কৃতকৃতার্থ হয; কিন্তু সে নর-দেবতাকেই আত্ম-জীবনের আদর্শ করিয়া লইয়া থাকে। এজন্য অমরার শচী পূজনীয়া হইলেও ধরার সতী আমাদের প্রাতঃস্মরণীয়া।

সত্য বটে, সহস্রাংশুর প্রখর রশ্মি-প্রভাবে ধ্রুবতারার ক্ষীণ-প্রভা আবৃত হইয়া যায়, তথাপি সময়ে ঐ ক্ষুদ্র নক্ষত্রটিই লক্ষ্য-হারা পথিককে গন্তব্য-পথ প্রদর্শন করে। কবি যেন জ্যোতির্ম্ময়ী সুভদ্রার নিকটে প্রেমময়ী শৈলজাকে ধ্রুবতারাটির মতই ধীরে ধীরে বিকশিত করিয়া তুলিয়াছেন! আমরা বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে সেই অতুলনীয় সৌন্দর্য্যই অনুভব করিবার চেষ্টা করিব।

সুকৌশলী কবি সুভদ্রার ন্যায় শৈলজাকে সহজসরলভাবে একেবারে আমাদিগের সম্মুখে উপস্থিত করেন নাই—স্ফুটনোম্মুখ শতদল-টিকে কবি পত্রান্তরালে ঢাকিয়া তাহার নিরুপম মাধুরী পাঠককে উপভোগ করাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। যে দেবী, সে ত আজন্ম দেবী; বিবিধ অবস্থার অগ্নি-পরীক্ষায় তাহাকে আর বিশুদ্ধা হইয়া

---

* চট্টগ্রাম-সাহিত্য-পরিষদের বার্ষিক উৎসব-সভায় পঠিত।

আপনাকে দেবীত্বে প্রতিষ্ঠিত করিতে হয় না। মনুষ্য দেবত্বে উন্নীত হইতে গেলেই তাহাকে নানা অবস্থা-বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হয়, প্রত্যেক নর-দেবতার পুণ্যজীবন-কাহিনীই তাহার প্রমাণ; শৈলজা-চরিত্রেও ইহার অসদ্ভাব ঘটে নাই।

বাঙ্গালী পাঠককে বলিয়া দিতে হইবে না, নবীনচন্দ্রের "রৈবতক", "কুরুক্ষেত্র" ও "প্রভাস" তিনখানি পৃথক্ কাব্য হইলেও একখানি অখণ্ড মহাকাব্য। কবি স্বয়ং এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন্—"রৈবতককাব্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আদি-লীলা, কুরুক্ষেত্রকাব্য মধ্যলীলা এবং প্রভাস-কাব্য অন্তলীলা লইয়া রচিত। রৈবতকে কাব্যের উন্মেষ, কুরু-ক্ষেত্রে বিকাশ এবং প্রভাসে শেষ।" বাস্তবিক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ভাস্বর চরিত্র অবলম্বন করিয়া তাহার অতুলনীয় মাহাত্ম্য-সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তুলিবার নিমিত্ত মহাকবির বীণায় বিশ্বারাধ্য সেই ত্রিশক্তির সেই "তজ্জলানের" সৃজন-পালন-হনন-গাথা যথাক্রমে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে। কেবলমাত্র একটি মহৎ জীবন-আশ্রয়ে এইরূপ ত্রয়ী-মহাকাব্য শুধু বঙ্গভাষায় কেন, জগতের অন্য কোন ভাষায় রচিত হইয়াছে কিনা জানি না। এক্ষেত্রে আমাদের নবীনচন্দ্রের ক্ষমতা বা প্রতিভা অসাধারণ—প্রতিদ্বন্দ্বীশূন্য বলিলেও বড় অত্যুক্তি হয় না।

শৈলজা-চরিত্রও এই তিনখানি কাব্যের অভ্যন্তরে অন্তঃসলিলা ফল্গুর স্নিগ্ধ প্রবাহের ন্যায় বহিয়া আসিয়াছে—ধীরে ধীরে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। শৈলজা নবীনচন্দ্রের একান্ত নিজস্ব মানস-দুহিতা; ইতিপূর্ব্বে আর কোন পুরাণেতিহাসে শৈলজার পরিচয় পাইয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না।

এই "শৈলজা" নামকরণের ভিতরেও কবির অন্তরদর্শী কৃতিত্ব সামান্য নহে। শৈলজা নিষ্কাম-প্রেমের মূর্ত্তিমতী আদর্শ; মানবীয় ক্ষুদ্র প্রেম কি প্রকারে মহান্ ঐশী-প্রেমে বিলীন হয়, শৈলজার জীবনে তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। শৈলজা শৈলজার মতই নবীন-চন্দ্রের এক অখণ্ড-মহাকাব্যখানিকে নির্ম্মল প্রেমধারায় অভিষিক্ত

করিয়া অন্তিমে মহা প্রেম-পারাবারে মিশিয়া গিয়াছে। এখানেই শৈলজা নামের সার্থকতা।

জগতে প্রকৃত প্রেমের ইতিহাস অশ্রু ও দীর্ঘশ্বাসের পবিত্র সুবর্ণাক্ষরেই লিখিত হইয়া থাকে, তাই প্রেমিকা শৈলজার জীবনও অশ্রুময় ও দীর্ঘশ্বাসবহুল। আমরা ক্রমে তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হইব।

কিন্তু প্রেমের এই নিগূঢ় রহস্য বোধ হয় আরও স্ফুটতর করিবার জন্য প্রেমতত্ত্বজ্ঞ কবি শৈলজাকে অশ্রু ও দীর্ঘশ্বাসের মধ্য দিয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন। হয় ত এস্থলে "উপস্থিত করিয়াছেন" লিখিলে যথার্থ যুক্তিসঙ্গত হইবে না, আমরা প্রথমেই শৈলজার সাক্ষাৎ পাই না; সুতরাং বলিতে হইবে, মহাকবি নবীনচন্দ্র অশ্রু ও দীর্ঘশ্বাসের সকরুণ বংশী-রবে সর্ব্বপ্রথম শৈলজার অস্পষ্ট বাল্যকথা একখানি অজ্ঞাতপূর্ব্ব দুঃস্বপ্নের মত আমাদিগকে শুনাইয়াছেন।

রৈবতক গিরিশৃঙ্গে মহর্ষি বেদব্যাসের পুণ্যাশ্রমে শ্রীকৃষ্ণ এবং কৃষ্ণসখা পরিব্রাজক অর্জ্জুন মহর্ষির দর্শন ও বন্দন-আশায় উপনীত হইয়াছেন। মহর্ষি বীরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনের অকালে প্রব্রজ্যা-বেশে কৌতূহলী হইয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে অর্জ্জুন বলিলেন—

"বানপ্রস্থ নহে প্রভু, উদ্দেশ্য আমার।"

একদিন জনৈক ব্রাহ্মণের গোধন অপহরণকারী নাগরাজ চন্দ্রচূড়কে তস্করস্থানে মহাসমরে আহত করিলে, তিনি অন্তিমশ্বাসে গর্জ্জন করিয়া বলিয়াছিলেন—

* * * * "নাগরাজ চন্দ্রচূড়। * *
অষ্টম বর্ষীয়া শিশু বালিকা তাহার
কাঁদে দুগ্ধ লাগি; কাঁদে জননী তাহার
অনাহারে,—নাগরাজ তস্কর সে আজি!"

সেই অবধি—

"অষ্টম বর্ষীয়া সেই অনাথা বালিকা
ভাসিতে লাগিল দেব, নয়নে আমার।
বহু অন্বেষণে তার না পাই সন্ধান,
কি যে তীব্র মনস্তাপ, হৃদয়ে আমার
বসাইল বিষদন্ত, সুখশান্তি মম
হইল বিষাক্ত সব। * * * *
অষ্টম বৎসর আজি দেশদেশান্তরে
বেড়াইনু ; কিন্তু নাহি পাইনু সন্ধান
অষ্টম বর্ষীয়া সেই শিশু অনাথায়।"

সত্য বটে, এই "অষ্টম বর্ষীয়া শিশু অনাথাই" যে আমাদের "শৈলজা", এক্ষণে আমরা তাহার কিছুমাত্র পরিচয় পাই না ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কি গভীর দীর্ঘশ্বাস ও তপ্তাশ্রুর মধ্য দিয়া এখানেই শৈলজার জীবনকথা আরম্ভ হইল। পরে এই অশ্রু ও দীর্ঘশ্বাস আরও নিবিড়তর হইতেছে।

মহর্ষি সন্তুপ্ত অর্জ্জুনকে বহু প্রবোধ দিয়া বলিলেন—

"কি ফল তাহারে বৎস, করিয়া সন্ধান ?
তুমি যে পারিবে সুখী করিতে তাহারে
জানিলে কেমনে বল। * * * *
* * * * * * নহে অসম্ভব
বিষম অশুভ তার সেই দরশনে,
শিশিরের সম্মিলনে পদ্মিনীর যথা।
যেমতি রজনীগন্ধা ভানুর উদয়ে
ক্রমে শুকাইয়া বৃন্তে পড়ে ভূমিতলে,
হয় ত তেমতি বালা ক্রমে শুকাইয়া
জীবনের বৃন্ত হতে পড়িবে ঝরিয়া।
নহে অসম্ভব কৃষ্ণ, পার্থ-হুতাশন
প্রবেশিয়া অনাথার জীবন-উদ্যানে

পোড়াইবে একে একে আশার কুসুম
দুঃখিনীর। পোড়াইবে পতঙ্গের মত
তারে। নহে অসম্ভব হইবে অর্জ্জুন
সেই অনাথিনী হন্তা"—

ব্যাসদেবের বাক্য অসমাপ্ত রহিয়া গেল। কিন্তু তাঁহার প্রতি বাক্যে কি করুণা ঝরিয়া পড়িতেছে! তাই—

"উঠিল শিহরি
অর্জ্জুনের কলেবর। হৃদয়ে তাঁহার
কে যেন তুষার ধারা দিলেক ঢালিয়া।"

ফলতঃ মহর্ষি যেন ভবিষ্যতের কৃষ্ণযবনিকা উত্তোলন করিয়া শৈলজার ভাবী অদৃষ্ট-পট আমাদিগের সমক্ষে উৎঘাটিত করিতেছেন,— আমরা উত্তরকালে তাহা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারি।

মানব এ সংসার-রঙ্গভূমিতে অদৃষ্টের হস্তে ক্রীড়াপুত্তলি; মহাকবি বুঝি ইঙ্গিতে সেই কথাই আমাদিগকে বলিতে ও বুঝাইতে চাহিতেছেন, তাই এ স্বর্গের নাম দিয়াছেন—"অদৃষ্টবাদ।"

(রৈবঃ ৩য় সর্গ।)

তারপর অকস্মাৎ শ্রীকৃষ্ণের পুরোদ্যানে নিতান্ত অতর্কিত ভাবে আমরা শৈলজাকে সর্ব্বপ্রথম সশরীরে দেখিতে পাইলাম। কিন্তু "অষ্টম বর্ষীয়া অনাথা" বালিকা বেশে নহে,—বীর-বালক বেশে। (রৈবঃ ৬ষ্ঠ সর্গ।) তাই এ সাক্ষাতেও আমরা তাহাকে চিনিতে পারি না।

বীরকেশরী অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের অতিথি। তাঁহার বীরচরিত্র কৃষ্ণ-ভগিনী আবাল্য "উদাসিনী মূর্ত্তিমতী শান্তিরূপা" সুভদ্রার কিশোর অন্তর স্পর্শ করিয়াছে। তাহার প্রতিধ্বনি অর্জ্জুনের প্রশান্ত অন্তরেও তরঙ্গ তুলিয়াছে—প্রেমের নীরব আহ্বানে প্রেমাস্পদের হৃদয় যে

এমনি ভাবেই সাড়া দিয়া থাকে। ঘটনাচক্রে নির্জ্জন পুরোদ্যানে পরস্পরের সাক্ষাৎ হইল, দুইখানি মুগ্ধ-হৃদয় উভয়ের ঈষৎ অজ্ঞাত-পরিচয় লাভ করিল। এই আভাসে যাহা পাওয়া গেল, তাহা বিকাশ হইবার পূর্ব্বেই মহিষী সত্যভামা ও রহস্যময়ী সুলোচনা "এক চোর খুঁজিতে আসিয়া দুই চোরের" সন্ধান পাইলেন। জগতে দুর্ব্বলের বিচার চিরকালই অগ্রে, তাহারই ফলে—

"ক্রোধে সুলোচনা
জড়াইয়া সুভদ্রারে চলিল ঝঙ্কারি।"

এবং

"হাসি হাসি সত্যভামা চলিল পশ্চাতে।"

ভাববিহ্বল অর্জ্জুন একাকী। আকস্মাৎ—

"পার্থ দেখিলা চমকি
ভীষণ উরগ এক পড়ি পদতলে
বিদ্ধ ফণা তীক্ষ্ণ শরে। দিক লক্ষ্য করি
গেলে পার্থ কিছু দূর, দেখিলা বিস্ময়ে
কিশোর বয়ায় এক বালক সুন্দর
কৃষ্ণবর্ণ, খর্ব্বাকৃতি, ধনুর্ব্বাণ করে।"

অর্জ্জুন সবিস্ময়ে তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন—

"দেখিতে বালক তুমি * * *
কিন্তু যে কৌশলে বিন্ধি ভীষণ উরগে
রক্ষিলে জীবন মম, মানিনু বিস্ময়,—
অসামান্য শিক্ষা তব! কি নাম তোমার?
আসিয়াছ কেন হেথা, আসিলে কেমনে?
দিয়াছ জীবন মম, কি দিব তোমায়?"

মহাবীর অর্জ্জুন জানেন না, তিনি যাহার পিতৃহন্তা,

"অষ্টম বৎসর ধরি দেশদেশান্তরে"

তিনি যাহার অন্বেষণে উদাসীন বেশে ফিরিতেছেন, এই সেই

"নাগরাজ চন্দ্রচূড়"-কন্যা অনাথা শৈলজা! অপূর্ব্ব কৌশলে কাল-ভুজঙ্গ-দংশন হইতে আপন পিতৃহন্তার জীবন রক্ষা করিয়াছে!—প্রথম সাক্ষাতেই শৈলজা-চরিত্রের মহত্ব আমাদিগের হৃদয় আকর্ষণ করে। তাহার আত্ম-পরিচয় ছলে এই উদারতা আরও বিকশিত; যথা—

জানুপাতি করযোড়ে পড়ি পদতলে
সম্ভ্রমে কহিল যুবা—"বীরচূড়ামণি!
মৃগয়া হইতে তব পদ অনুসরি
আসিয়াছে এই দাস, শৈল নাম তার,
সেবিবে চরণাম্বুজ, ভিক্ষা চাহে আর।"

কিশোরী শৈলজা কেন কিশোর বেশে "শৈল" নামে আত্ম-পরিচয় দিল, সে রহস্য পরে প্রকাশ পাইবে। শৈলজা যে অস্ত্র-কৌশলে শূরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনের বিস্ময় উৎপাদন করিতে পারে, সে শিক্ষা অপূর্ব্ব! কিন্তু আরও অপূর্ব্ব যে, বিচিত্র কৌশলে মহাকবি নবীনচন্দ্র শৈলজার আত্ম-জয়ী সেবাপরায়ণ বীর-হৃদয়খানিরই পরিচয় আমাদিগকে সর্ব্বপ্রথম প্রদান করিতেছেন!

বলা বাহুল্য, শৈলজার—ছদ্মবেশী শৈলের মনস্কামনা সিদ্ধি হইল—সে বীরচূড়ামণির চরণাম্বুজ সেবা করিবার অধিকার লাভ করিল।

একদা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সপরিবারে শারদীয়া পূর্ণিমায় রাসোৎ-সবে প্রমত্ত হইয়াছেন—সুবিপুল জনসঙ্ঘ আবালবৃদ্ধবনিতা আনন্দ-হিল্লোলে মাতিয়াছে। কৃষ্ণসখা অর্জ্জুনও তাহাতে যোগ দিয়াছেন। এই "কৌমুদী অমৃতরাশি"-অভিষিক্তা মধুময়ী শর্ব্বরীর অশ্রান্ত হাস্যো-চ্ছ্বাসের মধ্যে কেবলমাত্র

"অর্জ্জুনের আবাসের কক্ষ-বাতায়নে,
দাঁড়াইয়া ভৃত্য শৈল—বিষাদ মূরতি।

* * * * *

* * * * * উৎসব-ঝটিকা
তোলে নাই হৃদয়ের ক্ষুদ্র সরোবরে
একটি হিল্লোল ক্ষুদ্র; পড়ে নাহি তাহে
একটিও ক্ষুদ্র রেখা সুখ-চন্দ্রিকার।"

চারিদিকের এত চঞ্চলতার ভিতরেও প্রহরের পর প্রহর—

"বালক দাঁড়ায়ে স্থির প্রতিমার মত
সেই ভাবে সেই খানে।—

তাহার এত বিষাদ—এত চিন্তা কিসের ?

বহুক্ষণ পরে কক্ষান্তরে পদশব্দ শ্রবণ করিয়া শৈলের ধ্যান-ভঙ্গ হইল। উৎসবান্তে পার্থ ফিরিয়াছেন—শয্যায় শিরস্ত্রাণ রাখিয়া আপন মনে পাদচারণা করিতেছিলেন। উৎসবক্ষেত্রে প্রণয়িণী সুভদ্রার অপূর্ব্ব ফুলসাজ দেখিয়া, তাঁহার ললিতকণ্ঠে সুমধুর কৃষ্ণ-গুণ-গাথা শুনিয়া বিশ্ববিজয়ী ফাল্গুনী মুগ্ধ হইয়াছেন, তিনি আত্মহারাবৎ মৃদু গুঞ্জনে সেই বিষয়েরই পর্য্যালোচনা করিতেছিলেন—ভাবিতেছিলেন—বলিতেছিলেন—

"সেই ত্রিতন্ত্রীতে প্রেম মিশিবে যখন,
হবে কিবা শান্তি সুখ-পুণ্য-প্রস্রবণ।"

এই নিরুপম অভিনব ত্রিবেণীসঙ্গমে—এই প্রেমপূত "শান্তি-সুখ-পুণ্য-প্রস্রবণে" তাঁহার তরুণ হৃদয়খানি অবগাহন করিবার জন্য কতদূর যে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল, তাঁহার উদ্‌ভ্রান্ত-উচ্ছ্বাস আমাদিগকে তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দেয়।

এদিকে—

"দাঁড়াইয়া অন্তরালে মুক্ত কপাটের
অধোমুখে, প্রাচীরেতে হেলায়ে শরীর
শুনিতেছে শৈল সেই প্রণয়-উচ্ছ্বাস।
যতই শুনিতেছিল ততই তাহার

নব জলধরনিভ বদনমণ্ডলে
কি যেন গভীরতর ছায়া জলদের
হতেছিল ধীরে ধীরে মৃদুল সঞ্চার,
নীরদের ছায়া যেন নীল সরোবরে।"

এস্থলে নবীনচন্দ্রের উপমা যেমন অতুল, তেমনি তাঁহার অন্তরদর্শিনী শক্তিও অসাধারণ। আমরা ক্রমে তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিব।

যাহা হউক, অর্জ্জুন নির্জ্জন কক্ষে বহুক্ষণ উদাসচিত্তে ভ্রমণ করিয়া অঙ্গের ভূষণ উন্মোচন করিতে লাগিলেন। প্রভুভক্ত শৈল ধীরে অগ্রসর হইয়া নীরবে সে কর্ত্তব্য পালন করিতে লাগিল। অর্জ্জুন মৃদু হাসিযা সস্নেহে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন -

শৈল এতক্ষণ
উৎসব দেখিতেছিলে বুঝি নানাস্থানে ?"

উৎসবের উৎসবময়ীর ধ্যানে যিনি তন্ময়, তাঁহার পক্ষে এ প্রশ্ন স্বাভাবিক। কিন্তু

"শৈল কোমলতাপূর্ণ স্থির দু'নয়নে
চাহি অর্জ্জুনের পানে উত্তরিল ধীরে—
"দেখিনি উৎসব প্রভু !"

এই ক্ষুদ্র কথাটির মধ্যে কি করুণ ব্যাকুলতা লুকান রহিয়াছে, পার্থ তাহা অনুভব করিলেন না। তাই তিনি সবিস্ময়ে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে শৈল, এতক্ষণ অনিদ্রায় রহিয়াছ কেন ?" অমনি—

স্থির নেত্র পলকেতে নামিল ভূতলে
উত্তরিল অধোমুখে—"প্রভু-প্রতীক্ষায়
আছিল এ দাস"।

শৈলের ভাষা বড়ই আবেগময়ী। স্নেহশীল অর্জ্জুন আত্ম-সংবরণ

করিতে পারিলেন না,—নবীন প্রেমিকের চক্ষে সমস্ত ভুবন নব ভাবে —সরস-সজীব-সুন্দর-সাজে দেখা দেয়—সে সহজেই বিহ্বল হইয়া পড়ে। সুভদ্রাময়-হৃদয় অর্জ্জুনেরও বর্ত্তমানে তদ্রূপ অবস্থা; কবি বড় মধুর ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন:—

"সেই ক্ষুদ্র মুখখানি
অর্জ্জুন আদরে তুলি নিজ বাম করে,
অন্য করে সরাইয়া কুঞ্চিত কুন্তল
দেখিলা সে ক্ষুদ্র মুখ; যথা সমীরণ
সরাইয়া লতা দেখে কানন-কুসুম।
সেই মুখখানি!—পার্থ অতৃপ্ত নয়নে
দেখিলা সে মুখে, সেই বিস্তৃত নয়নে
সেই ঘন ভ্রূ-রেখায় ক্ষুদ্র ওষ্ঠাধরে,
প্রভাত-শিশির-সিক্ত অপরাজিতায়
করুণা-মণ্ডিত সেই বর্ণ-নালিমায়,
কি মহত্ত্ব, কি সৌন্দর্য্য, কিবা কোমলতা,
কিবা নিরাশ্রয় ভাবে কি যেন দৃঢ়তা!
স্বপ্নে কল্পনায় যেন হেন মুখখানি
দেখেছেন ধনঞ্জয় পড়িতেছে মনে
ছায়াময়; উঠিয়াছে অজ্ঞাতে হৃদয়ে
কি যেন উচ্ছ্বাস মৃদু; ভাসিয়াছে মনে
কি যেন স্মৃতির ছায়া!"

কবি এস্থলে মনস্তত্ত্বের আর একটি অপূর্ব্ব রহস্যের ইঙ্গিত করিয়াছেন। আমরা যে জিনসটির জন্য সর্ব্বদা ব্যাকুল, সে জিনিসটি অকস্মাৎ অজ্ঞাতে আমাদের সম্মুখে পতিত হইলে, আমরা কোন কারণে উহা চিনিতে না পারিলেও আমাদিগের মনে অতর্কিতে কেমন একটা চিনি-চিনি ভাব স্বভাবতঃই জাগিয়া উঠে, কি-যেন-কি-মনে-পড়ে কি-যেন-কি-মনে-পড়ে-না এমন একটা উদাস-

ব্যাকুল-অব্যক্ত-ভাব—সে যেন বাদল-চন্দ্রমার হাসিখানি ফুটি-ফুটি করিয়া না-ফোটার ভাব, শৈলজা-অন্বেষণতৎপর অর্জ্জুনের নিকট-বর্ত্তী ছদ্মবেশী বালক-দর্শনে সেই "স্বপ্নে কল্পনার" সেই মুখখানি দেখার মত, সেই "অজ্ঞাতে হৃদয়ে মৃদু উচ্ছ্বাস" উঠার মত, সেই "মনে স্মৃতির ছায়া" ভাসার মত, আমাদিগকে একটুকু চকিত-চঞ্চল করিয়া তোলে! ইহাই মানবের প্রকৃতিগত—কায়বাক্যমনোলব্ধ সাধারণ সংস্কার।

যাহা হউক, অর্জ্জুন শৈলের সেবায়—ভালবাসায়—"প্রভু-প্রতীক্ষায় আছিল" বাক্যে মুগ্ধ; তাই আবেগভরে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"শৈল! এত স্নেহ তব, প্রতিদান তার
দিব কোন মতে আমি?"

অমনি পদতলে লুটাইয়া পা দু'খানি ধরিয়া

"ঢল ঢল নেত্রে চাহি ঊর্দ্ধে প্রভু পানে"

শৈল উত্তর দিল, "বীরশ্রেষ্ঠ! দিবানিশি দাস তোমার পবিত্র পদ-স্পর্শ করিবার অধিকার পাইতেছি, ইহাই আমার পরমার্থ;

ততোধিক আর
নাহি জানে প্রতিদান অনার্য্য কুমার।"

সেই "নেত্রে করুণার ভিক্ষা অন্তরে বিষাদ"-মাখা ক্ষুদ্র প্রতিমা-টিকে অর্জ্জুন সাদরে তুলিয়া লইলেন, সে তাঁহার নিষেধ সত্ত্বেও পদ-সেবায় নিযুক্ত রহিল। অর্জ্জুন ক্রমে নিদ্রাভিভূত হইলেন।

"দেখিতে দেখিতে
শৈলের শিথিল শির পড়িল হেলিয়া
প্রভুর চরণাম্বুজে, হইল স্থাপিত
পদ্মরাগে নীলমণি অতীব সুন্দর।"

তাহার অন্তরে—

"কি আনন্দ! যেন বহু তপস্যার পর
পেয়েছে সাধক নিজ অভীষ্ট ঈশ্বর!"

তারপর বহুক্ষণ সে এইরূপ আত্মহারা থাকিয়া—

"ধীরে একবার
চাহি সেই বীর মুখ, চিত্রিত নিদ্রায়,
প্রবেশিল পার্শ্বস্থিত নিবিড় কাননে।"

তখন রাত্রি তৃতীয় প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। উৎসবান্তে রৈবতক সুপ্তিমগ্ন; এমন কি, মনে হইতেছে—

"দাঁড়াইয়া তরুগণ নিদ্রাগত যেন
শারদ-জ্যোছনাতলে।"

এমন সময় একজন আগন্তুক আসিয়া শৈলের সম্মুখে দাঁড়াইল এবং তৎপর উভয়ে যথাযোগ্য সম্ভাষণান্তে—

"ছায়ার আঁধারে
দুজনে বসিল এই বৃক্ষের শিকড়ে।"

আমরা এতক্ষণ শৈলের অনির্ব্বচনীয় উদারতাই লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছি; কিন্তু এক্ষণে এই নবাগতের সহিত তাহার যে বাক্যালাপ হইল, তাহা নবীন পাঠকের নিকটে কতকটা রহস্যপূর্ণ হইলেও উহা যেমন তাহার হৃদয়তত্ত্বের পরিচায়ক, তেমনি বিমল পুণ্যপ্রভায় আলোকিত। শৈল যদি প্রকৃতপক্ষে ছদ্মবেশী বালক না হইত—তাহার ঐ ছদ্মবেশের অন্তরালে যদি রমণীর সহজ অনুভূতি-সম্পন্ন অন্তরখানি লুক্কায়িত না থাকিত, তবে সে এ বিষয়ে এতটা অগ্রসর হইতে পারিত কি না, নিঃসন্দেহে বলা যায় না।

যাহা হউক, আগন্তুক শৈলকে জিজ্ঞাসা করিল—"প্রেমাকাঙ্ক্ষী পার্থ সুভদ্রার?" শৈল এই একটু আগে অর্জ্জুনের নিভৃত মর্ম্মোচ্ছ্বাস শুনিয়া আসিয়াছে—বুঝিবা অতর্কিতে তাহা তাহার অন্তরের রুদ্ধ-দ্বারে আঘাত দিয়াছে, তাই সে একটি ক্ষুদ্র কথায় উত্তর দিল—"প্রেমাকাঙ্ক্ষী"। ক্রোধান্ধ আগন্তুক আবার জিজ্ঞাসা করিল—

"তন্দ্রা কি তেমন
অর্জ্জুনেতে অনুরক্তা ?"

ইহার উত্তরে শৈল যাহা বলিল, তাহা অনুমান বটে; কিন্তু অতি চমৎকার! হৃদয় দিয়া হৃদয়ের স্পন্দন অনুভব না করিলে, এমন উত্তর কেহ দিতে পারে না। শৈল বলিল—

"ওই দেখ পূর্ণ শশধর,
বসি সিন্ধুবক্ষোপরে দেখ, কি সুন্দর
করিছেন আকর্ষণ, প্রস্তর যেমন,
নিরুচ্ছ্বাস নীরনিধি আছে কি এখন ?"

পূর্ণ শশধর সিন্ধুবক্ষোপরে থাকিয়া তাহাকে আকর্ষণ করিতেছে, সিন্ধু কি সে আকর্ষণে সাড়া না দিয়া পারে ?

আগন্তুক আরও ক্রুদ্ধ—আরও অস্থির হইয়া উঠিল, শেষে আবার জিজ্ঞাসা করিল—"কহ শৈল, অন্য সমাচার।"

অমনি—

"পড়ি পদতলে শৈল ধরি দুই করে
আগন্তুক দুই পদ, করুণ নয়নে
চাহি ভীম মুখ পানে, কহিল কাতরে—
"হেন পাপ-অভিসন্ধি কর পরিহার।
নহ নির্মম তুমি। অভাগ্য অনার্য্য
হয়েছে কঙ্কালসার; তথাপি এখন
আছে শান্তি, বনছায়া আছে অগণন।
কেন মিছে দাবানল করি প্রজ্বলিত
ভস্মিবে কঙ্কালরাশি ? ঘোর পাপানলে
পোড়াবে ভগিনী তব, পুড়িবে আপনি।"

আগন্তুকের নিকটে শৈলের এত কাতরতা কেন, আমরা এখন তাহার কোন বিশেষ কারণ নির্দ্দেশ করিতে না পারিলেও, মনে হয়

ইহার মধ্যে কি-যেন-কি গুপ্ত-রহস্য লুকান রহিয়াছে, যাহা নাকি সমগ্র অনার্য্য জাতির পক্ষে সাংঘাতিক! বনছায়াবাসী শান্তি-কামী শৈল যেন কঙ্কালসার অনার্য্য-জাতির প্রতিভূ হইয়া আগন্তুকের পদে কৃপা ভিক্ষা করিতেছে!

পক্ষান্তরে এস্থলে শৈলের একটি কথা অনুধাবন করিবার আছে। সে বলিতেছে—"ঘোর পাপানলে পোড়াবে ভগিনী তব, পুড়িবে আপনি।" পরমকৌশলী কবি যদিও এযাবৎ পরিষ্কার কিছুই লেখেন নাই, তথাপি শৈল যে ছদ্মবেশী বালক এবং আগন্তুক যে তাহারই ভ্রাতা, তাহার এ কথায় আমরা এখানে সে আভাস পাইতেছি।

কিন্তু অতশত ভাবিবার অবসর আগন্তুকের ছিল না, সে এক পদাঘাতে শৈলকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া সরোষে গর্জ্জন করিয়া বলিল—

* * * "পাপ!
অবহেলি আজ্ঞা মম এই ধর্ম্মনীতি
শিখেছিস্ রৈবতকে, শিখাতে আমারে,
কৃতঘ্ন!"

হায়!—

"পদাঘাতে যেই ধৈর্য্য হয়নি চঞ্চল,
টলিল 'কৃতঘ্ন' এই একটি কথায়।
শৈলের ভরিল বুক, ভরিল নয়ন।
জড়াইয়া ধরি গলা, রাখি ক্ষুদ্র মুখ
বিশাল প্রস্তর বুকে, সিক্ত বালকের
অশ্রুর ধারায়, কষ্টে কি কহিল শৈল;—
চলি গেল আগন্তুক নক্ষত্রের মত।"

শৈল আবার সেই শিকড়েতে উঠিয়া বসিল, বৃক্ষকাণ্ডে মাথা রাখিয়া অস্তগামী শশাঙ্কের পানে চাহিয়া কাঁদিতে লাগিল।—

"সে কৃতঘ্ন সম্বোধন, সেই পদাঘাতে,
বালকের পূর্ব্বস্মৃতি অশ্রুস্রোতে তার
বহুক্ষণ তীরবেগে যোগান জোয়ার।"

তারপর অজস্র বর্ষণে তাহার হৃদয়-ঝটিকা ক্রমে প্রশমিত হইল, বালক তখন আপন মনে বলিতে লাগিল—

"কিন্তু এই মহাপাপে
ডুবিতে আপনি, ভাই, ডুবাতে আমারে
নাহি দিব। জানি আমি হইবে নিষ্ফল
তোমার জীবন-ব্রত, আমার জীবন।
কিবা হিংসানল হৃদে করিয়া বহন,
কিবা ঘোর পাপমন্ত্রে হইয়া দীক্ষিত,
আসিলাম! কিন্তু যেই করিনু প্রবেশ
এ পবিত্র পুরে; যেই দেখিনু নয়নে
সে পবিত্র মুখ,—বীরত্বের প্রতিকৃতি
দয়ার আধার, নিবিল সে হিংসানল।
ভাসিল কি স্বর্গ নেত্রে! বহিল হৃদয়ে
কি অমৃত-মন্দাকিনী! হোক্ সব স্বপ্ন,
সেই স্বপ্ন আজীবন করিব বহন।
এ জগতে স্বপ্ন শান্তি,—দুঃখ জাগরণ।"

রৈবতক গিরিশৃঙ্গের সেই নির্জ্জন বিটপীতলে—সেই অস্তগামী শারদ-শশীর স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নালোকে শৈলের রুদ্ধ হৃদয়-কপাট উন্মুক্ত হইয়া গিয়াছে, আমরা তাহার ভিতর দিয়া শৈলের সকরুণ রহস্যময় জীবনের ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের আলেখ্য-চিত্র সন্দর্শন করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছি। দেখিতেছি, শৈল কোন দুর্জ্ঞেয় কারণে বিষাক্ত হৃদয় লইয়া রৈবতকে প্রবেশ করিয়াছিল; কিন্তু স্থান-মাহাত্ম্যে, বিশেষতঃ বীরত্বের প্রতিকৃতি দয়ার আধার অর্জ্জুনের পবিত্র মুখ

দেখিয়া সেই নিদারুণ হিংসানল নিবিয়া গিয়াছে। শুধু ইহাই নহে, তাহার নির্ম্মল হৃদয়ে কি অমৃত-মন্দাকিনী রহিয়াছে—যাহা আজ তাহার নিকটে স্বপ্নের মতই বোধ হইতেছে, এবং সেই স্বপ্নখানিই আজীবন বহন করিতে সঙ্কল্প করিতেছে, আর বলিতেছে—
"এ জগতে স্বপ্ন শান্তি,—দুঃখ জাগরণ।"

আমাদের শৈল আজ যে স্বপ্নে শান্তি অন্বেষণ করিতেছে, আমরা পশ্চাৎ দেখিব, তাহা পার্থিব কোনরূপ সুখশান্তি বা আনন্দের নহে; তাহা নিষ্কাম প্রেমেরই মধুর স্বপ্ন!

ক্রমে যখন শৈলের অতুল হৃদয়-স্বর্গ অন্ধকার করিয়া শারদায় পূর্ণ-শশী অতল জলধিতলে অন্তিম-শয়ন রচনা করিল, এবং "উষার প্রথমালোক উঠিল ভাসিয়া", তখন—

কাতরে বালক
ফিরাইয়া মুখ পূর্ব্বগগনের পানে,
প্রণত হইয়া, বুক পাতিয়া ভূতলে,
ডাকিল—"অনাথ-নাথ! আশা-অস্তকালে
দেও শান্তি এ হৃদয়ে! যাপিব জীবন
নিরাশার উষালোকে দেখিয়া স্বপন!"

আমাদের মনে হয়, শৈলের এই কাতর-প্রার্থনার অন্তরালে অমরকবি নবীনচন্দ্র যুগপৎ দুইটি গভীর ভাব সন্নিবেশিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। প্রথম, মানব শুধু স্বীয় পুরুষকারের উপর নির্ভর করিয়া জগতে কোন মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিতে পারে না; তাহাকে ইচ্ছায় কি অনিচ্ছায় কতকটা দৈব-বলের আশ্রয় লইতেই হয় এবং যদি কখনও দুর্ভাগ্যক্রমে তাহার সকল আশা ভরসা, উদ্যম উৎসাহ নিঃশেষ হইয়া যায়, তখন স্বভাবতঃই তাহার অন্তরের অন্তঃস্তল হইতে জাগিয়া উঠে—

"অনাথ-নাথ! আশা-অস্তকালে
দেও শক্তি এ হৃদয়ে!"

তারপর দ্বিতীয় তত্ত্বটি জন্মান্তরবাদের অন্তর্গত, কিন্তু অটল বিশ্বাসী হৃদয়ের বাণী! যাহারা নিরাশার অন্ধকারে নহে—নিরাশার উষালোকে স্বপ্ন দেখিয়া জীবনযাপন করিতে চাহে, তাহারা সত্য সত্যই জানে, উষা-স্বপ্ন কোন দিন ব্যর্থ হয় না; নিরাশার ভিতরে যে আশার উষালোক ফুটিয়া উঠে, অক্ষুন্ন-প্রাণে তাহার ধ্যানে নিমগ্ন হইতে পারিলে, এ জীবনে না হউক, জন্মান্তরে দিব্য জ্যোতিঃ-ধারায় তাহাদের ঈপ্সিত স্বপ্ন পূর্ণ-সার্থকতায় অভিষিক্ত হইয়া তৃষিত হৃদয়ের যাবতীয় অতৃপ্ত আশাসাধ অতুল পরিতৃপ্তি লাভ করিয়া অভিশপ্ত জীবনকে পবিত্র ও কৃতার্থ করিয়া দিবে!

যাহা হউক, এদিকে অর্জ্জুন তখন "পুষ্পাস্তর-সুকোমল সুবাস-শয্যায়" শুইয়া স্বপ্ন দেখিতেছিলেন—

"সেই সুখ-রাস-দৃশ্য, সেই রাসেশ্বরী,
সেই নৃত্য, সেই গীতি"—

যথাসময়ে অর্জ্জুনের সুখ-স্বপ্ন ভঙ্গ হইল। "কিন্তু বিকশিল আশার যে উষালোক হৃদয়ে তাঁহার।"

শৈল তাহার জাগ্রত-স্বপ্নে "নিরাশার উষালোক" দেখিয়া সুদূর ভবিষ্যতের পানে তাকাইয়াছিল, আর পার্থ যথার্থ-স্বপ্ন-শেষে "আশার "উষালোক" হৃদয়ে লইয়া জাগ্রত হইলেন! কবি স্বপ্ন-কথায় অপূর্ব্ব নৈপুণ্যে দুইজনার স্বপ্নে কি বিচিত্র পার্থক্য সূচনা করিয়াছেন!

ফলে ফাল্গুনীর "উৎসাহে ভরিল প্রাণ"। তিনি তেমনি উৎসাহে শয্যায় উপবেশন করিয়া সবিস্ময়ে দেখিলেন—

"বসি করযোড়ে শৈল জানুপাতি ভূমে,—
মুখ শান্ত, দৃষ্টি শান্ত, অঙ্গ অবিচল।"

শৈল কি মায়া-বালক? কবি তাহার এই মায়াপ্রভাব আরও বিকশিত করিয়া তুলিলেন, শৈল অর্জ্জুনকে প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ কি-কথা গোপনে নিবেদন করিল, বিশ্ব-বিজয়ী সব্যসাচীর আননেও ভয় ও বিস্ময়ের

ছায়া অঙ্কিত হইল। তিনি ভাবিলেন, "একি গুপ্তচর কেহ?" অমনি—

"চাহিলা বালক পানে তীব্র দু'নয়নে,
দেখিলা সে মুখ শান্ত, শান্ত দু'নয়ন,
সরল ও সুশীতল, ঊষার মতন।"

এমন মুখে সন্দেহের স্থান কোথায়? তাই শুধু—

"ত্রস্তে মৃগয়ার সজ্জা করি বীরবর
নির্গত হইলা, যেন প্রভাত-ভাস্কর।"

তখন স্থানান্তরে কিশোরী যাদবকুমারীগণ বিচিত্র বসনভূষণে সুসজ্জিতা হইয়া চারিদিকে অপূর্ব্ব আনন্দ ও সৌন্দর্য্যের হিল্লোল তুলিয়া "কুমারী-ব্রত" আচরণ করিবার জন্য চলিয়াছে, যেন—

"কিশোরীকুসুমমালা মনোহরা,
অরুণ-রঙ্গে ছুটেছে হাসি!"

তাহাদের—

"সঙ্গে সখীগণ, শোভে করে শিরে
মাঙ্গল্যের ডালা, মঙ্গল ঘট;
কটাক্ষ নয়নে, কটাক্ষ বচনে,
অন্তরে বাহিরে কতই নট!"

এবং তাহাদের "রক্ষিগণ আগে, বাদিত্র পিছে" বার দিয়াছে। দেখিতে দেখিতে তাহারা এক চারু উপবনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া

—"পড়িল ছড়ায়ে
করি নব পুষ্পে পুষ্পিত বন।"

সেই "কিশোরীকুসুম-মালার" তরঙ্গায়িত হৃদয়ের বিপুল পুলকোচ্ছ্বাসের অন্তরালে কোথায় কোন্ অদৃশ্য শরে আহত ক্ষুদ্র শুক-শিশুটি বৃক্ষতলে পতিত ছিল, সেদিকে কাহারও লক্ষ্য করিবার অবসর ছিল না। তাহারা আপন মনে পুষ্পচয়ন করিয়া চলিয়া গেল। শুধু—

"দেখিলা সুভদ্রা সেই কাতরতা,
সে করুণা ভিক্ষা শুনিল তার ;
কাঁদিল পরাণ, ভিজিলা নয়ন,
ছুটিলা লইয়া সরসী পার।"

দেবীর কল্যাণ-করুণাপূর্ণ অশেষ যত্নে মুমূর্ষু পক্ষীশাবক রক্ষা পাইয়াছে। এমন সময় অকস্মাৎ রহস্যময়ী সুলোচনা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভদ্রা! একিলো তোর কুমারীর ব্রত ?" ভদ্রা বলিলেন—"সখি, এযে আমার জীবনের ব্রত!"

সুভদ্রার এই জীবনের ব্রত কোন্ মহান লক্ষ্যে উদ্‌যাপিত হইতে চলিয়াছে, তাঁহার পরবর্ত্তী বাক্যাবলীতে আরও বিশদ হইয়া উঠিয়াছে। হয় ত একদিন তাহা আমাদের শৈলজার জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিবে—আমরা শৈলজা-চরিত্রের মধ্যেও তাহার অমৃত-স্পন্দন অনুভব করিব, তাই তাহার কোন স্মরণীয় অংশ এস্থলে সঙ্কলন করিতেছি।

সুভদ্রা বলিতেছেন—

"করিতে জগৎ আনন্দময়,
জগতের পত্নী, জগতের মাতা,
জগতের দাসী, রমণীচয়।
* * * * * *
থাকুক গার্হস্থ্য কৈলাসে সুখে!
কাটিয়া স্নেহের কঠোর বন্ধন
পড় দিয়া ঝাঁপ অনন্ত মুখে!
ভাব সর্ব্বপ্রাণী পতি পুত্র তব,
পতি পুত্র তৃণ পাদপদ্মল ;
ঢালি প্রেম-বারি, পতিতে উদ্ধারি,
তাপিতে জুড়ায়ে বহিয়া চল।

আনন্দরূপিণী,—জন্ম বিষ্ণুপদে,—
করি পতিতশির আনন্দময়,
পড়ি পদতলে, অনন্তের কোলে,
নারায়ণ পদে হইও লয়।”

ইতিমধ্যে পক্ষীশিশু সম্পূর্ণ নিরাময় হইয়া অনন্ত আকাশে উড্ডীয়মান হইল এবং দেখিতে দেখিতে অনন্তের সনে মিলাইয়া গেল। ধ্যানময়ী সুভদ্রা আনন্দোৎফুল্লা হইয়া বলিলেন—

“দেখ দিদি, ক্ষুদ্র পাখীটি কেমন
অনন্তের সনে হইল লয়,
পারি না আমরা মিশিতে তেমন
করিয়া এ প্রাণ অনন্তময়?
বিহঙ্গের মত উড়িয়া উড়িয়া
দেখিতে মায়ের প্রফুল্ল মুখ!
মুখের ভিতরে লুকাইয়া মুখ,
বুকের ভিতরে রাখিয়া বুক?
বিহঙ্গের মত উড়িয়া উড়িয়া
দেখি যত গ্রহ নক্ষত্র তারা,—
কি অনন্ত শক্তি! কি অনন্ত জ্ঞান!
অনন্ত প্রেমের অজস্র ধারা!”

আমরা উত্তরকালে দেখিব, এই “অনন্ত প্রেমের অজস্র ধারা” একদিন আমাদের প্রেমময়ী শৈলজাকেও অভিষিক্তা করিয়া দিয়াছিল।

যাহা হউক, অকস্মাৎ যাদবকুমারীগণের মহোৎসব আর্ত্ত-রবে পরিণত হইল! বনদস্যুগণ রক্ষিগণকে আক্রমণ করিয়াছে। একজন দস্যু ছুটিয়া আসিয়া সুভদ্রাকে হরণ করিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিল; কিন্তু সে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীমূর্ত্তির পানে চাহিয়া “স্মরিল অজ্ঞাতে চরণ দুটি!”

আচম্বিতে মহাবীর অর্জ্জুন উপনীত হইয়া দৃপ্ত তেজে সেই দস্যুদলপতিকে আক্রমণ করিলেন—

"নহে প্রতিযোগী অযোগ্য কেহ।"

এদিকে প্রহরীগণকে বিনাশ করিয়া দস্যুদল অগ্রসর হইল, "আশ্রয়বিহীনা কুসুমকলিকা কিশোরীগণ" কাঁদিয়া উঠিল! এমন সময়—

"যাও দেবীগণ, প্রবেশ মন্দিরে"—
কহিল ডাকিয়া এ কোন জন?

কিশোরীরা মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, ধনুর্ব্বাণে সুসজ্জিত এক অপূর্ব্ব কিশোর বালক অদ্ভুত বিক্রমে দ্বার-রক্ষা করিতেছে!

সুলোচনা মুগ্ধ-চিত্তে বলিলেন, "সুভদ্রা, দেখ! দেখ!—

আমরি! আমরি! কি রূপমাধুরী!
কি বঙ্কিম ভুরু, নয়ন কিবা!
কিবা মনোহর সুগোল গঠন,
মরি! মরি! কিবা উন্নত গ্রীবা!
রাজহংস মত দাঁড়ায়ে কেমন
যুঝিছে গৌরবে ঈষৎ হাসি!
বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম শোভিছে কেমন
নীল উতপলে শিশির ভাসি!"

সুভদ্রা তখন তন্ময়ভাবে ফাল্গুনীর রণ-কৌশল অবলোকন করিতেছিলেন—নবীন প্রেমিকার নেত্রে প্রেমাস্পদের দুর্দ্দম শৌর্য্য-মহিমাই একমাত্র ধ্যেয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, সুলোচনার কথায় চমকিত হইয়া

"দেখিলা সুভদ্রা অদ্ভুত কৌশলে
যুঝিছে বালক তুলনা নাই!"

অমনি—

ভক্তিতে, বিস্ময়ে, ভরিল হৃদয়,
কাছে গিয়া ভদ্রা কহিলা "ভাই!

বহে স্রোতধারা কিশোর বদনে,
রক্তধারা ক্ষত শরীরে বহে ;
দেহ শরাসন, করি আমি রণ,
অস্ত্রেতে অক্ষম যাদবী নহে।”

মুহূর্ত্তে কিশোর বালক কটাক্ষে চাহিয়া দেখিল, “প্রীতির প্রতিমা” তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছেন ; সে বলিল—

“পার্থ-প্রণয়িণী অস্ত্রে পরাঙ্মুখ
নহে কভু, তাহা জানে এ দাসে !
আমি বনবাসী,—অস্ত্র আভরণ,
মৃত্যু সহচর ছায়াতে রহে।
শত অস্ত্রাঘাত সহিবে পাষাণ,
কাঁটাটিও নাহি গোলাপ সহে।”

কহিতে কহিতে বালক অপূর্ব্ব কৌশলে বর্ষার ধারার মত অজস্র শর বর্ষণ করিল, দস্যুদল নিবিড়তররূপে আহত হইয়া

“পলাইল সব ভঙ্গ দিয়া রণ !”

বিজয়ী বালক তখন ঈষৎ হাসিয়া সুভদ্রার পানে তাকাইল।

এদিকে—

“আত্ম-হারা ভদ্রা রয়েছে চাহিয়া
যথায় অর্জ্জুন করিছে রণ।
আত্ম-হারা শৈল রহিল চাহিয়া
সেই রূপরাশি কুসুম বন।
রূপের স্বপনে রয়েছে নিদ্রিত
কি শান্ত-মহিমা প্রীতির ধারা !
রূপের স্বপনে কি স্বর্গ বিকাশ !—
দেখিল বালক হৃদয়-হারা !”

এই বিচিত্রকর্ম্মা—এই দুর্নির্ব্বার দস্যু-সংগ্রামে বিজয়ী বালক—

এই হৃদয়-হারা বালক যে আমাদেরই শৈল, এতক্ষণে আমরা সে পরিচয় পাইলাম। যে নিরাশার ঊষালোকে স্বপ্ন দেখিয়া জীবন যাপন করিবার প্রতিজ্ঞা করে, তাহার হৃদযখানি যেমন দৃঢ়, তাহার হৃদয়ের শক্তি যেমন অসাধারণ, তাহার বাহুবলও যে তেমনি অজেয়, আমরা সে পরিচয়ও পাইলাম। আর পরিচয় পাইলাম, নবীনচন্দ্রের আশ্চর্য্য কবি প্রতিভার! তিনি উপরোদ্ধৃত কয়েক ছত্রের মধ্যে কেমন অসামান্য নিপুণতার সহিত অর্জ্জুন, সুভদ্রা ও শৈলের অন্তর-বাহিরের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য—মহিমা-গৌরব বিকশিত করিয়া তুলিয়াছেন!

কিন্তু এ পরিচয় এখনও শেষ হয় নাই। সুভদ্রা ক্ষণপরে সাদরে শৈলের হাতখানি আপনার হাতে লইয়া সেই জীবনদাতা বীরেন্দ্রবরের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। শৈল বলিল, "আমি কাননচর, আমার আবার পরিচয কি দিব?" স্নেহময়ী সুভদ্রা আপনার কণ্ঠ হইতে স্বর্ণহার উন্মোচন করিয়া তাহার কণ্ঠে পরাইয়া দিলেন এবং বলিলেন, "তোমার যোগ্য উপহার আর কি দিব? ভগ্নীর এই সামান্য উপহার গ্রহণ কর।"—বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে শৈল বলিল, "লইলাম। কিন্তু

ভগিনি! প্রতিজ্ঞা মম,—
যেই এক হার তপস্যা আমার,
নাহি দিল যদি পাষাণ-মন
নিদারুণ বিধি, অন্য হার দিদি,
পরিব না কভু গলায আর,
বিনা তাঁর স্মৃতি!

তাই তোমার এ হার আমার পূর্ণ প্রীতি মাখিয়া তোমাকেই উপহার দিতেছি,—বনবাসী আমি তোমাকে দিবার যে আর কিছুই নাই, তুমি ইহা দয়া করিয়া লও।" বালক সুভদ্রাকে সেই হারখানি আবার পরাইয়া দিল এবং তাঁহার কর-চুম্বন করিল।

"দেখিলা সুভদ্রা,—অমূল্য রতন
করে দুই বিন্দু উজ্জ্বলতর!"

রৈবতকের নির্জ্জন শৃঙ্গে অস্তগামী শশাঙ্কের করুণ কিরণোচ্ছ্বাসে দাঁড়াইয়া আমরা ইতিপূর্ব্বে আর একবার শৈলের সকরুণ সঙ্কল্পের কথা জানিতে পারিয়াছি, এক্ষণে তাহার আর একটি করুণ প্রতিজ্ঞার কথা শুনিলাম। এ উভয়ের মধ্যে অতি ঘনিষ্ঠ গোপন সম্পর্ক রহিয়াছে। আমরা জানি, শৈল ছদ্মবেশধারিণী রমণী; রমণীর কণ্ঠ-ভূষণ কি, তাহা বিশেষজ্ঞ পাঠককে বলিয়া দিবার আবশ্যক নাই। মনে হয়, নিদারুণ বিধি তাহাকে যে কাঙ্ক্ষিত "হার" হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন, তাঁর স্মৃতিখানিই তাহার ঊষা-স্বপ্ন; কবি অতি কৌশলে শৈলের অবরুদ্ধ হৃদয়-দ্বার ধীরে ধীরে উদ্‌ঘাটন করিয়া বুঝিবা সেই বিশ্ব-অজ্ঞাত রহস্যখানির ঈষৎ আভাস আমাদিগকে প্রদান করিতেছেন।

এদিকে তখনও দস্যুপতির সহিত অর্জ্জুনের সংগ্রাম শেষ হয় নাই। সহসা অর্জ্জুন শরাসনভ্রষ্ট হইলেন, দস্যুপতি উত্থিত কৃপাণ করে ছুটিয়া আসিল, অমনি

"বিদ্যুৎগতিতে
মুষ্টিতে তাহার লাগিল শর।"

দস্যুর শাণিত অসি খসিয়া পড়িল। এমন সময় অর্জ্জুন-সখা শ্রীকৃষ্ণ সসৈন্যে দেখা দিলেন,—দস্যুপতি পলায়ন করিল।

মুহূর্ত্তে চারিদিকে আবার আনন্দের তুফান বহিল। কিন্তু কি বিস্ময়, বালক কই! সে যেমন বিদ্যুৎ-গতিতে অদৃশ্য শরে দস্যুপতির দুর্জ্জয় দর্প হরণ করিয়া অর্জ্জুনের জীবনরক্ষা করিয়াছিল, তেমনি বিদ্যুৎগতিতে আত্ম-গোপন করিয়াছে। শৈল বহ্বাড়ম্বর জানে না—শৈল অন্তরে বাহিরে নীরব কর্ম্মবীর!

নর-দেব শ্রীকৃষ্ণ পার্থকে বলিলেন, "আমি দস্যুপতিকে চিনিয়াছি, আমি তাহার সকল অপরাধ ক্ষমা করিব।—

কিন্তু সে বালক,—শৈল কি তোমার ?
বুঝেছ কি তুমি হৃদয় তার ?"

অর্জ্জুন উত্তর করিলেন, "হাঁ, আমি তাহার হৃদয় বুঝিয়াছি, তাহা প্রীতির নির্ঝর এবং অমৃতাধার।"

হায়, অর্জ্জুন শৈলের উদার হৃদয়খানি যে বুঝিয়াও বুঝেন নাই ! সত্য বটে, তাহা 'প্রীতির নির্ঝর' ও 'অমৃতাধার' এবং তাহার তুলনা এ জগতে দ্বিতীয় মিলে কিনা জানি না ; কিন্তু এই প্রীতির মধ্যে —এই অমৃতের ভিতরে আরও যে কিছু অতি গোপনে লুকান আছে, সুভদ্রা-জীবন অর্জ্জুন সে সন্ধান ত কখনও করেন নাই ! দুরদৃষ্ট সে শৈলের !

মহাবীর ফাল্গুনীর রৈবতক-বাস শেষ হইয়া আসিয়াছে ; সুহৃদ্-শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের সৌহার্দ্দ্য-সখ্যে, কৃষ্ণ-সখা সত্যভামা ও সুলোচনার স্নেহ-আপ্যায়নে, এবং সর্ব্বোপরি আরাধ্যা দেবীপ্রতিমা সুভদ্রার অতুলনীয় প্রেমে তাঁহার হৃদয় কাণায় কাণায় ভরিয়া উঠিয়াছে। এক্ষণে তাঁহাকে বাঞ্ছিত নিধি আহরণ করিয়া বিদায় লইতে হইবে।

একদিন প্রভাতে চতুর্দ্দিকের মঙ্গল-নিক্কণের মধ্যে পার্থ নবীন উৎসাহে জাগ্রত হইয়া সবিস্ময়ে দেখিলেন, তাঁহার "রণসজ্জা" সম্মুখে সুসজ্জিত রহিয়াছে এবং

"কপাটের অন্তরালে দাঁড়াইয়া শৈল
অনিমেষ দু'নয়নে রয়েছে চাহিয়া
তাঁহারই মুখের পানে,—বড়ই কোমল
দৃষ্টি, শান্ত সুশীতল।"

অর্জ্জুন ঈষৎ হাসিয়া সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "শৈল ! আজ যে আমার রণসজ্জার প্রয়োজন, তুমি তাহা কেমন করিয়া জানিলে ?" বালক যেন অন্যমনস্কভাবে নিরুত্তর রহিল, কিন্তু বোধ হইল—"সেই দৃষ্টি দ্বিগুণ কোমল !"

তিনি জানিতেন, শৈল সর্ব্বদা এমনি ভাবে তাঁহার মুখের দিকে

নীরবে চাহিয়া থাকে; তিনি ভাবিতেন, "বালকের কুতূহল, প্রভু-ভক্তি কিবা"—একখানি প্রেম-পিপাসু অতৃপ্ত নারী-হৃদয় যে নেত্র-পথে প্রতিমুহূর্ত্তে তাঁহার বীর-হৃদয়খানিকে আলিঙ্গন করিতে ব্যাকুল হইয়া রহিয়াছে, সে কথা তিনি অনুভব করিতে পারিতেন না।

কিন্তু আজ যেন পার্থ সেরূপ বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না; শৈল যখন অগ্রসর হইয়া নিঃশব্দে তাঁহাকে রণসাজে সাজাইতে লাগিল, তখন তাঁহার বার বার মনে হইতেছে, সে সুকোমল করে যখন যেখানে তাঁহার অঙ্গস্পর্শ করিতেছে—

পরশিছে অঙ্গ যেন পুষ্প সুকোমল,—
পুষ্প যেন সেইখানে রহিবে লাগিয়া।

পার্থ কিছুকালের জন্য বিমনস্ক হইলেন,—তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন, "শৈল, আমার রৈবতক বাস শেষ হইয়াছে, তুমি কি আমাকে ছাড়িয়া স্বগৃহে যাইবে?"

বিদায়-ক্ষণে—হয় ত চির-বিদায়-ক্ষণে শৈলের আত্ম-পরিচয় দিবার সময় আসিয়াছে। দর দর ধারে তাহার অশ্রু প্রবাহিত হইল, সে কাতর-কণ্ঠে বলিল,—"নাহি গৃহ এ দাসীর।"

সে কি! প্রভুভক্ত বালক একি বলিতেছে—"এ দাসীর!" পার্থ ভাবিলেন, এ বুঝি শুনিবার ভুল! নবীন পাঠক পড়িতে পড়িতে ভাবেন, এ বুঝি পড়িবার ভুল!—কবির কাব্য-কৌশলই এইখানে!

ভুলের মধ্য দিয়াই জগতের ভুল ভাঙ্গে! আজ অর্জ্জুনেরও ভুল ভাঙ্গিবে—ভুলের ভিতর দিয়া অতুল সত্যের আবিষ্কার হইবে। প্রিয় পাঠক পাঠিকা! এস, আজ আমরা তাহাই প্রত্যক্ষ করিয়া মুগ্ধ হইব।

বাষ্পরুদ্ধস্বরে পার্থ আবার বলিলেন,—

"শৈল, তবে চল হস্তিনায়,
পাবে প্রেমপূর্ণ গৃহ। পুত্র নির্ব্বিশেষে
পালিবে তোমায় পার্থ। তব স্বার্থহীন

শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালবাসা হইবে তাহার
জীবনের মহাসুখ। হৃদয় তোমার
জগতে দুর্লভ বৎস!"

অর্জ্জুনের এত গভীর স্নেহ-সম্ভাষণ শৈল আর সহ্য করিতে পারিল না, তাহার বক্ষভরা রুদ্ধ-উচ্ছ্বাস অশ্রুরূপে উথলিয়া উঠিল; সে নীরবে আপনার কক্ষে ছুটিয়া গেল।

উত্তপ্ত পাত্র অকস্মাৎ সুশীতল সলিলস্পর্শে বিদীর্ণ হইয়া থাকে। মানব-অন্তরের কোন নিবিড় ভাব যখন তীব্র ঘাত-প্রতিঘাতে আন্দোলিত হইয়া উঠে, তখন তাহা অতি সহজে আকস্মিক প্রীতির প্লাবনে গলিয়া যায়—একমাত্র উচ্ছ্বসিত অশ্রুই তখন তাহার আত্মপ্রকাশের ভাষা হইয়া দাঁড়ায়। এস্থলে শৈলের চরিত্রেও তাহার কোন ব্যতিক্রম ঘটে নাই।

যাহা হউক, শৈলের এ বিচিত্র আচরণে অর্জ্জুনের হৃদয়ে কি যেন সন্দেহ দেখা দিল। এদিকে শৈল অবিলম্বে ফিরিয়া আসিয়াছে। কিন্তু—

"চিত্র ওকি অন্যতর!
চাহিলেন পার্থ, চক্ষু ফিরিল না আর,—
মরি! মরি! কিবা শোভা স্বর্গ-নীলিমার,
অপূর্ব্ব যোগিনী মূর্ত্তি, মাধুরী-মণ্ডিত,
অপরাজিতার সৃষ্টি, সদ্য সুবাসিত।
* * * * *
নীলিমা এ রমণীর,—শারদ আকাশ
অস্ফুট চন্দ্রাভ, শান্তিকরুণানিবাস।
শীতল মাধুর্য্য অঙ্গ, মধুর রেখায়
শান্তি ও করুণা যেন ঝরিছে ধারায়।
সে স্থির সুন্দর নেত্র ঈষৎ সজল,—
শান্তি-করুণার স্বর্গ দর্পণ-যুগল।

ঈষৎ আরক্ত ক্ষুদ্র অধর-কোণায়
শান্তি-করুণার স্বপ্ন, সমাধি তথায়।
নহে দীর্ঘ, নহে স্থূল, সুতন্বী শরীর,
শান্তি-করুণার যেন পবিত্র মন্দির।
দেখ মুখ,—দেখিবে সে হৃদয় তাহার,
কি শান্তি-করুণামাখা প্রেম-পারাবার।
নীরব—কি যেন এক করুণা-উচ্ছ্বাস
অন্তর অন্তরে ধীরে ফেলিছে নিশ্বাস।
যোগিনীর পরিধান আরক্ত বসন,
একটি কুসুমহার অঙ্গের ভূষণ।
সেই মুখখানি!—ওকি মুখ বালিকার?
কিবা সরলতামাখা কিবা সুকুমার!
কিন্তু সেই শান্তি-শোভা স্থিরা সরসীর,
নহে বালিকার,—চিন্তা-রেখা সুগভীর!"

রামধনুর বিচিত্র বর্ণছটা মিলিয়া যেমন শুধু একটি নিরুপম সৌন্দর্য্যই উদ্ভাসিত করিয়া তোলে, তেমনি এই অদৃষ্ট-পূর্ব্বা যোগিনী রমণীর কমনীয় অঙ্গসৌষ্ঠবের মধ্য দিয়া কবি শুধু একটি মাধুর্য্যই বিশেষ ভাবে বিকশিত করিয়া তুলিতে যত্নশীল হইয়াছেন, সে যে শান্তি ও করুণার মাধুরী!- তাঁহার হৃদয়ের এই বিশেষ ভাবটি যেন তাহার প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ভিতরে এক অপূর্ব্ব সুষমা ছড়াইয়া দিয়াছে!

বালিকার সরলতামাখা সুকুমার আননখানিতে সুগভীর চিন্তারেখা অঙ্কিত হইয়াছে—শারদেন্দু নিবিড় নীরদমালায় ঢাকা পড়িয়াছে।

বিস্ময়-বিহ্বল পার্থ আকুল আবেগে বলিয়া উঠিলেন—

"শৈল! শৈল! দেবী কি মানবী
কে তুমি? এরূপে কেন ছলিলে আমায়?"

এ বিস্ময়—এ প্রশ্ন শুধু অর্জ্জুনের নহে—ইহা সমগ্র পাঠকসমাজের! অর্জ্জুনের সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া আমাদেরও তেমনি আগ্রহে—তেমনি বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়,—"শৈল! শৈল! দেবী কি মানবী কে তুমি? এরূপে কেন এতকাল আমাদিগকে ছলনা করিলে?"—এই যে পাঠকের ব্যাকুল-তন্ময়তা, ইহাই শৈলজা-চরিত্রের অন্যতম বিশেষত্ব—ইহাই কাব্যকলার বা কবিপ্রতিভার অন্যতর শ্রেষ্ঠ বিকাশ।

যাহা হউক, শৈল অতিধীরে অর্জ্জুনের পদতলে জানু পাতিয়া বসিয়া এবং তাহার দুইটি হাতে তাঁহার চরণ ধারণ করিয়া সকাতরে বলিল—

"ছলনা দাসার
ক্ষমা কর বারমণি! ভেবেছিনু মনে
অজ্ঞাতে চরণাম্বুজে হইয়া বিদায়
ছলনা করিব পূর্ণ। কিন্তু এই পাপে
সতত ব্যথিত প্রাণ; করিলাম স্থির
এই প্রায়শ্চিত্ত পদে; কহিব দাসার
আত্ম-পরিচয়; কিন্তু সেই শোক-গীত
করুণ হৃদয় তব করিবে ব্যথিত।"—

মহাবীর ফাল্গুনী আত্ম-বিস্মৃত হইয়া করুণার ছবিটির মত শৈলের বিষাদমলিন মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

নিয়তি

(১)

তখন কার্ত্তিক মাস পড়িয়াছে। কিন্তু সে কেবল পঞ্জিকায়। কারণ তখনও মুগ্ধা প্রেম-বিহ্বলা প্রকৃতি শ্যাম কান্ত শান্ত স্নিগ্ধ আশ্বিনকে তাহার বাহু-বন্ধনে জড়াইয়া প্রেমের স্বপ্ন দেখিতেছিল। তাহার কেশের কামিনী-হার তখনও ঝরিয়া পড়ে নাই। শেফালার পুষ্প-শয্যা তখনও পাতা।

সে দিন শনিবার। প্রফুল্লকুমার অন্যান্য দিনের চেয়ে অনেক সকালে স্কুল হইতে আসিয়াছে। বাড়ীতে জলযোগের কোন যোগাড় ছিল না। মা বলিলেন—"বাবা, একটু দেরী কর, মাছের ঝোল হইয়াছে, ভাত কয়টা আর একটু সিদ্ধ হইলেই নামাইয়া দিব"। প্রফুল্ল সব বিষয়ে মাতৃ-ভক্ত; কিন্তু ক্ষুধার সময় ভক্তি বজায় রাখিতে পারে না। মার অন্যায় অনুরোধে বড় রাগ হইল। বলিল, "আমি এক দিনও সময়মত ভাত পাই না। আচ্ছা, আমি কিছুতেই খাইব না। তুমি আমার জন্য আর রাঁধিও না।" এই কথা বলিয়া প্রফুল্ল তাড়াতাড়ি বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল। মা দৌড়িয়া আসিয়া ছেলেকে ধরিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না। বাড়ীর নীচেই একটি স্বল্প-জল বিশিষ্ট খাল ছিল। এক লাফে তাহা পার হইয়া প্রফুল্ল ওপার যাইয়া উঠিল। "বাবা আমার, সোণা আমার—লক্ষ্মী আমার—যা হয় এখনি দিচ্ছি খেয়ে যাও—মাণিক আমার—" মা এইরূপ কত কথা বলিয়া প্রফুল্লকে ফিরাইবার চেষ্টা করিলেন। অবাধ্য অশান্ত বালক ফিরিয়াও চাহিল না। কেবল একবার বলিল—"আমি আর তোমার ভাত খাইব না।"

(২)

মা ফিরিয়া আসিয়া রান্না-ঘবের বারান্দায় বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। প্রফুল্ল মার একমাত্র সন্তান। সেদিন বাড়াতে কেহই ছিল না। প্রফুল্লের রাগ পড়িলে পাড়া খুঁজিয়া কে তাহাকে আদর করিয়া ডাকিয়া আনিবে? মাসের মধ্যে অন্ততঃ দশ দিন প্রফুল্ল এইরূপ রাগ করিত। আর এই দশদিনই প্রফুল্লের মা এইরূপ কাঁদিত। প্রফুল্লের রাগ দুর্জ্জয়। রাগ কবিলে কাহার সাধ্য তাহাকে বুঝাইয়া খাওয়ায়? কিন্তু তাহার এ পাথরের মত কঠিন রাগ গলিয়া যাইত কেবল মাযের অশ্রুজলে। সে মাকে বড় কাঁদাইত। আর মার কান্নায় তাহার প্রাণ বড় কাঁদিত। মা কিছুক্ষণ কাঁদিয়া পরে চক্ষু মুছিয়া ভাতের হাঁড়ী নামাইলেন। পরে রান্না-ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া শয়ন-ঘরের বারান্দায় আসিয়া বসিলেন এবং প্রফুল্লের কথা ভাবিতে লাগিলেন। প্রফুল্ল সকাল-বেলা একমুঠা মাত্র ভাত খাইয়া স্কুলে গিয়াছিল। কতদূরের রাস্তা হাঁটিয়া আসিয়াছে! হতভাগিনী কেন আর একটু আগে ভাত চড়ায় নাই? প্রফুল্ল সারাদিন না খাইয়া রহিল। কখন্ ফিরিয়া আসিবে কে জানে? যদি আজ রাত্রে আর ফিরিয়া না আসে? শেষ কথাটি মনে করিয়া তাহার বুকের মাঝখানটিতে ধক্ করিয়া একটা আঘাত লাগিল। কাল মেঘের মত কতকগুলি অসংলগ্ন চিন্তা একসঙ্গে তাঁহার মনের মধ্যে আসিয়া ভিড় করিয়া তাঁহাকে বড় বিচলিত করিয়া তুলিল। কিন্তু শেষে মনে হইল, প্রফুল্ল মাকে ছাড়া রাত্রে কিছুতেই থাকিতে পারিবে না। মা-ছাড়া যেমন একটি এক বৎসরের ছেলের জীবন অসম্ভব, চৌদ্দ বৎসরের বালক প্রফুল্লেরও ঠিক তাই। মাছ বরং জল-ছাড়া থাকিতে পারে—কিন্তু প্রফুল্ল রাত্রিতে মা-ছাড়া থাকিতে পারে না। প্রফুল্লের মা পূর্ব্বে এ বিষয়ের অনেক প্রমাণ পাইয়াছেন। এইরূপে তিনি হৃদয়কে যতই বুঝাইতে লাগিলেন, হৃদয়

ততই আকুল হইয়া উঠিতে লাগিল—কিছুতেই শান্ত হইল না। বার বার করিয়া অকারণে প্রাণ কাঁদিয়া উঠিতে লাগিল।

(৩)

এদিকে প্রফুল্ল পাড়া ছাড়াইয়া গ্রামের পশ্চিম-প্রান্তে সরকারী বড় রাস্তায় আসিয়া পড়িল। সম্মুখে প্রফুল্লের সহপাঠী মতিদের বাড়ীতে কে যেন হারমোনিয়ম বাজাইয়া গান করিতেছিল। অতি মধুর গলা। গানটি অতি করুণ। প্রফুল্ল রাগের ঝোঁকে বড় বেগে চলিয়াছিল। গান শুনিয়া দাঁড়াইল। রাগ ভুলিয়া গেল। ক্ষুধা ভুলিয়া গেল। মন একেবারে নরম হইয়া গেল। মার উপর রাগ করিয়া আসিয়াছে, সেজন্য নিজের উপর রাগ হইল।—বড় অনুতাপ হইল। মনে হইল, বুঝি মা কাঁদিতেছেন। করুণ রাগিণীতে গানের সুর কাঁদিতেছিল। প্রফুল্লের প্রাণে তাহা প্রবেশ করিল। ব্যাধের বংশী-ধ্বনির মন্ত্রে মুগ্ধ মৃগ-শিশুর ন্যায় বালক প্রফুল্ল স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া গান শুনিতে শুনিতে মায়ের চক্ষে জল-ধারা বহিতেছে দেখিতে পাইল। মায়ের জন্য প্রাণ কাঁদিল। গান থামিল। প্রফুল্ল যেদিকে যাইতেছিল সেই দিকে চলিল, বাড়ীতে ফিরিয়া গেল না। ইচ্ছা হইয়াছিল তবু গেল না। কিছুদূর গেলে বন্ধু জ্যোতির সহিত দেখা হইল। জ্যোতি বলিল, "একি! যেতে যেতেই ফিরে এলে যে? কিছু খাওনি?"

প্রফুল্ল। এই—একটু কিছু খেয়েছি। চল একটু বেড়িয়ে আসি।

জ্যোতি। আমি বেড়াইতেই যাচ্ছি। পাড়ার সকলে নদীতে মাছ ধরিতে গেছে। নদীতে নাকি আজ খুব মাছ ছুটেছে। চল দেখে আসি।

(৪)

পশ্চিমদিকে নিকটেই একটি ছোট নদী। পৌষ মাঘ মাসে শুকাইয়া যায়। এখন অল্প জল আছে। বেশ স্রোত আছে। দুই

জনে সেইদিকে চলিল। স্নানের ঘাটে যাইয়া দেখিল সেখানে কেউ নাই। জ্যোতি বলিল, "এইখানেই ত সকলে মাছ ধরিতে আসিবে শুনিলাম। কৈ কেউ আসে নাই ত!" পরে ইতস্ততঃ একটু তাকাইয়া বলিল, ঐ যে সকলে! ঐ হাট-খোলার কাছে সব জুটিয়াছে! চল ঐখানে যাই।

মাছ-ধরা এবং মাছ-ধরা দেখায় প্রফুল্লের বড় আমোদ। কিন্তু আজ তাহার কিছুই ভাল লাগিতেছিল না। সে শুধু মার কথা ভাবিতেছিল। তাহার হৃদয়ে জাগিতেছিল মায়ের অশ্রু-প্লাবিত নয়ন। তাহার প্রাণ আজ বড় তরল—বড় অস্থির। কে জানে ঐ করুণ-রাগিণী তাহাকে কি করিয়াছে! প্রফুল্ল মাছ-ধরা দেখিতে গেল না। বলিল, "আয় ভাই, এখানে একটু বসি। আজ নদীর স্রোত এত বেশী হইয়াছে কেন, বল দেখি?" জ্যোতি বলিল, "কাল রাত্রে খুব বৃষ্টি হইয়াছে, সেইজন্য"। দুইজনে শ্যাম-তৃণাচ্ছাদিত বর্ষাধৌত নদী-তীরে উপবেশন করিল। পাশে দুইটি খঞ্জন নাচিয়া নাচিয়া বেড়াইতেছিল। প্রফুল্ল বলিল, "বাঃ! দেশে খঞ্জন আসিয়াছে! এই সময়েই ত খঞ্জনেরা এদেশে আসে, না ভাই?"

জ্যোতি। হাঁ, আবার কিছুদিন পরেই চলিয়া যাইবে। কোথায় যে যায় তা কেউ বল্‌তে পারে না। আচ্ছা, প্রথম যে খঞ্জন টির উপর তোমার দৃষ্টি পড়ে, সেটি কোন্ দিকে মুখ করিয়াছিল?

প্রফুল্ল। কেন?—উত্তরদিকে ছিল। ঐ ত এখনও ওটি উত্তর মুখেই রহিয়াছে! কেন বল্ দেখি?

জ্যোতির মুখ একটু গম্ভীর হইল। একটু বিষণ্ণ ভাবে বলিল, "সেদিন মা বলিতেছিলেন—কার্ত্তিক মাসে উত্তরমুখে যে খঞ্জন দেখে সে নাকি সে বছর বাঁচে না।"

এমন সময়ে একটা প্রকাণ্ড দাঁড়কাক বিকট শব্দ করিয়া যেখানে খঞ্জন দুটি খেলা করিতেছিল সেইখানে আসিয়া বসিল। খঞ্জন

ছুটি উড়িয়া গেল। কাকের উপর প্রফুল্লের বড় রাগ হইল। প্রফুল্ল একটি ঢিল ছুড়িয়া কাকটিকে তাড়াইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু কাক একটু উড়িয়া আবার নিকটেই বসিল। প্রফুল্ল আবার একটি ঢিল ছুড়িল। তবু কাক নড়িল না। জ্যোতিরও বড় রাগ হইল। "মা সাধে দাঁড়কাকগুলিকে যমের দূত বলিয়া গাল দেন" বলিয়া জ্যোতি একটি বড় ডাল ভাঙ্গিয়া লইয়া কাকটিকে তাড়াইয়া দিয়া আসিল। কাক নদী পার হইয়া তাহাদের ঠিক সোজাসুজি ওপারে গিয়া বসিল এবং বিকট শব্দ জুড়িয়া দিল। জ্যোতির আরও রাগ হইল। নদীর পাড় হইতে এক প্রকাণ্ড মাটির চাপ ভাঙ্গিয়া জ্যোতি আবার ঢিল ছুড়িতে লাগিল। তখন অগত্যা কাক উড়িয়া পশ্চিমদিকে চলিয়া গেল। সেখান হইতে আধ মাইল দূরে একটা প্রকাণ্ড বটগাছ ছিল। সেই গাছের ঘন পাতায় ছাওয়া এক ডালের উপর গিয়া বসিল। প্রফুল্লের মন সে দিকে ছিল না। সে ভাবিতেছিল, ততক্ষণ তাহার মার ভাত হইয়াছে। ভাত বাড়িয়া লইয়া মা হয় ত বসিয়া আছেন। তাহাকে না দেখিয়া হয় ত কাঁদিতেছেন।

জ্যোতি বলিল, "প্রফুল্ল, বল্ দেখি, কাকটা যে গাছের উপর গিয়া বসিল ওটা কোন গাছ—কোথায়?"

প্রফুল্ল। আমি আর বুঝি জানি না! ও বোয়ালমারীর দ'য়ের পার। ঐ বটগাছে নাকি অনেক ভূত থাকে। সেদিন ঐ গাছের ডালে একটা মড়া ঝুলিতেছিল। ও দ'টাকে এখন সকলে পদ্ম-বিল বলে। ওখানে নাকি অনেক পদ্ম হইয়াছে।

জ্যোতি। হ্যাঁ ভাই, একদিন দেখ্‌তে যাবে?

প্রফুল্লের অনেক দিন হইতে ইচ্ছা—একদিন পদ্ম-বিলে পদ্ম দেখিয়া আসে। মা একদিন প্রফুল্লের মামাকে কয়েকটি পদ্ম আনিয়া দিতে অনেক বলিয়াছিল। জ্যোতির কথা শুনিয়া সে বলিল, "চল্‌না ভাই, আজই যাই। বেশীদূর ত নয়!" জ্যোতি বলিল, "বেশ, চল, অনেক পদ্ম তুলিয়া আনিব।"

(৫)

দুই জনে পশ্চিমদিকে চলিল। পশ্চিম-গগনে সূর্য্যদেব অস্তগমনের উদ্যোগ করিতেছেন। তাঁহার জ্যোতিমণ্ডলের চতুর্দ্দিকে রক্ত জবার ঘন রক্তিমা ক্রমে গোলাপী—পরে লঘুপীত—শেষে নীল হইয়া নীলিমায় মিশিয়া গিয়াছে। একটি ছোট পাখী সেই জ্যোতির সাগরে ভাসিতে ভাসিতে কোথায় হারাইয়া গেল!

দুই বন্ধু পদ্ম-বিলের পাড়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল সেখানে অপূর্ব্ব শোভা। এমন মনোহর দৃশ্য তাহারা কখনও দেখে নাই। অনন্ত অসংখ্য পদ্ম ফুটিয়াছে। কত শত শত ফুটিতেছে। কত শত শত কলি—তাহারা ফুটিবে। কত শত শত ফুটিয়াছিল—ঝরিয়া পড়িয়াছে। নিকটে দূরে, দক্ষিণে বামে, সর্ব্বত্র রাশি রাশি পদ্ম। বৃহৎ সবুজ পাতাগুলি জলের উপর ভাসিতেছে—চারিপাশে ছোট-বড় কলি আর ফুটন্ত পদ্ম। মন্দ পবনে অল্প অল্প দুলিতেছে। অতি মৃদু মনোহর গন্ধ চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইতেছে। অসংখ্য মক্ষিকার মেলা বসিয়াছে। তাহারা বড় ব্যস্ত। কোন্‌টি ফেলিয়া কোন্‌টির মধু খায়? তাই কতকগুলি কেবলি উড়িয়া বেড়াইতেছে। পদ্মের পাতায় পাতায় ছোট-বড় জল-বিন্দুগুলি তরতর্ করিয়া কাঁপিতেছে—মুক্তার মত সূর্য্য-কিরণে জ্বলিতেছে। পাতার ফাঁকে ফাঁকে স্বচ্ছ-জল সূর্য্য-কিরণে জ্বলিতেছে।

পদ্ম-বনে সৌন্দর্য্যের উৎসব দেখিয়া বালক দুটি পাগল হইয়া গেল। প্রফুল্লের এক হৃদয় সহস্র হইয়া একবারে সহস্র ফুলে বসিতে লাগিল। প্রফুল্লের মন সহস্র হস্ত বাহির করিয়া একেবারে সহস্র পদ্ম চয়ন করিতে চাহিল। তাহার হৃদয়-মন আরও কি করিতে চাহিল প্রফুল্ল তাহা বুঝিল না—শুধু ব্যস্ত হইল—শুধু চঞ্চল হইল। করুণ গানের ছন্দে তাহার মন নরম হইয়াছিল—পদ্মের গন্ধে আর মক্ষিকার গুনগুন্-ধ্বনির ছন্দে এখন একেবারে গলিয়া গেল। মার অশ্রু-আঁখি প্রাণে তেমনি জাগিতেছিল। কিন্তু

এখন আর সে অনুতাপ ছিল না। সেই স্নেহাশ্রুপূর্ণ মুখমণ্ডল এখন শুধু সৌন্দর্য্যময়—শুধু আনন্দময়—শুধু স্নেহময় হইয়া ফুটিয়া উঠিল। প্রফুল্ল আনন্দে বিহ্বল—সৌন্দর্য্যে বিভোর। এ সৌন্দর্য্য লইয়া এখন সে কি করে? একবার ভাবিল—জলে নামিয়া পদ্ম তুলি—কলি তুলি—পাতা ছিঁড়ি। আবার ভাবিল—শুধু দাঁড়াইয়া দেখি। শেষে স্থির থাকিতে না পারিয়া উভয়েই জলে নামিল। দুই-জনে কাড়াকাড়ি করিয়া পদ্ম ও কলি ছিঁড়িতে লাগিল। ঐ জ্যোতি বড় ঢলঢলে পদ্মটি ছিঁড়িল! ঐ প্রফুল্ল একটি পদ্ম তুলিতেছিল—তাহার হাত হইতে পাপড়িগুলি খসিয়া ঝরিয়া পড়িল। সেটি ফেলিয়া প্রফুল্ল একটি আধ-ফুটন্ত কলি তুলিল। দুইজনে অনেক পদ্ম—অনেক কলি তুলিল। শেষে আর হাতে ধরে না। কিন্তু প্রফুল্ল দেখিল—বড় বড় ভাল ভাল পদ্মগুলির একটিও তোলা হয় নাই।—সেগুলি আরও বেশী জলে। তাহারা একবুক জলে নামিয়াছিল। একখানা ডিঙ্গি থাকিলে বেশ হইত। কিন্তু তাই বলিয়া ঐ বড় বড় পদ্মগুলি সে ছাড়িয়া উঠিতে পারিবে না। উভয়েই হাতের পদ্ম-গুলি কয়েকটি পদ্মপাতার উপর রাখিল। পদ্মের ভরে পাতাটি ডুবিয়া গেল। পদ্মগুলি চারিদিকে ছড়াইয়া গেল। কেহ তাহা দেখিল না। দুইজনে অনেক জলে নামিতে লাগিল। পদ্মনালের কাঁটায় উভ-য়ের সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইতেছিল—সেদিকে কাহারও দৃষ্টি নাই—দৃষ্টি ঐ ফুটন্ত পদ্ম কয়টির দিকে। দাম উড়ি সেওলা এবং আরও নানা প্রকার জলজ উদ্ভিদ্ তাহাদিগকে বেড়িয়া ধরিতেছিল—সেদিকে কাহারও দৃষ্টি নাই—দৃষ্টি ঐ পূর্ণ-বিকশিত রক্তাভ পদ্মগুলির দিকে। শামুকে প্রফুল্লের পা কাটিয়া গেল, আঁটাল পাঁক হইতে জ্যোতি পা টানিয়া তুলিতে পারিতেছিল না—কিন্তু সেদিকে তাহাদের দৃষ্টি নাই—দৃষ্টি ঐ বড় বড় ঢলঢলে সুন্দর পদ্মগুলির দিকে। হঠাৎ জ্যোতি একটু বেশী জলে নামিয়া পড়িয়াছে। তাহার মাথা পর্য্যন্ত ডুবিয়া গেল। প্রফুল্ল জ্যোতির চেয়ে একটু দীর্ঘাকৃতি। সে তাড়া-

তাড়ি জ্যোতিকে ধরিল। জ্যোতি প্রফুল্লের কাঁধে ভর দিয়া উঠিল এবং অতি কষ্টে সাঁতার দিয়া গলাজলে আসিয়া দাঁড়াইল। প্রফুল্ল দেখিল, তাহার হাতের কাছেই একটি সুন্দর পদ্ম। সেইটি ছিঁড়িবার জন্য প্রফুল্ল হাত বাড়াইতেছিল, এমন সময় তাহার পা গভীর পাঁকে হাঁটু পর্য্যন্ত ডুবিয়া গেল। তখন স্নিগ্ধরশ্মি সূর্য্যমণ্ডল গ্রামান্তের তরুচ্ছায়াময় দিক্‌চক্রবালের অন্তরালে অন্তর্হিত হইল। হঠাৎ প্রফুল্লের বড় ভয় হইল। সে পা টানিয়া তুলিবার চেষ্টা করিল, পারিল না। তাহার চোখ পর্য্যন্ত জলের নীচে। সে হাত তুলিয়া জ্যোতিকে ডাকিল। জ্যোতি চিবুক পর্য্যন্ত জলে নামিয়া প্রফুল্লের হাত ধরিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু লাগাল পাইল না। প্রফুল্লের তখন আরও ভয় হইল। পাড়ের ঐ বটগাছে ভূত থাকে, সেদিন একটা মড়া ঝুলিতে-ছিল—তাহার মনে হইল। সে একবার অতি কষ্টে মাথা তুলিয়া দেখিল, সূর্য্য অস্ত গিয়াছে। চারিদিকে কুয়াসা করিয়া আসিতেছে। শীঘ্রই সব অন্ধকার হইবে। প্রফুল্লের শরীর অবশ হইয়া আসিল। হৃদয়হীনা বিশ্বাসঘাতিনী কর্দ্দমময়ী ধরিত্রী তাহার চরণতল হইতে আস্তে আস্তে সরিয়া যাইতে লাগিল। সম্মুখের বটবৃক্ষের শাখায় সেই কাকটি কর্কশস্বরে ডাকিতেছিল। প্রফুল্লের সেই কাক তাড়ান'র কথা মনে হইল। উত্তরমুখে সেই খঞ্জন-দেখার কথা মনে হইল। মার কথা মনে হইল। রাগ করার কথা মনে হইল। মার চোখের জল মনে পড়িল। তাহার ক্ষুদ্র জীবনের—ক্ষুদ্র ইতিহাসের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য কাহিনী মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে শত শত মনে পড়িতে লাগিল। আর এই সমস্ত কাহিনীর সহিত জড়িত সেই মার মুখ শতবার সহস্রবার মনে পড়িল। শেষে আর কিছুই মনে পড়িল না—কেবল মার সেই মুখ—আর সেই অশ্রু-আঁখি—সেই স্নেহ হাসি, আর সেই অশ্রু-আঁখি। প্রফুল্ল এত বড় হইয়াছে, তবু মার কোলে উঠিত। সেই মার কোল স্মরণ হইল। ক্রমে সমস্ত স্মৃতি বিলুপ্ত হইল। সমস্ত অন্ধকার হইয়া আসিল।

জ্যোতি দেখিল প্রফুল্ল ডুবিল আর উঠিল না। তখন সে কাঁদিয়া উঠিল।—চীৎকার করিয়া হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। কেহ শুনিল না। সেই কাকটি তখনও ডাকিতেছিল। জ্যোতি তখন বাড়ীর দিকে ছুটিল। প্রাণপণে দৌড়িতে লাগিল। প্রফুল্লের মাকে এবং আর সকলকে খবর দিল।

(৬)

কাতর-প্রাণে প্রফুল্লের জন্য ভাবিতে ভাবিতে যখন সন্ধ্যা হইয়া আসিল, তখন প্রফুল্লের মা উঠিলেন। উঠিয়া উঠনে ঝাঁট দিলেন। ঘরে ঘরে ধূপ দিলেন। দীপ জ্বালিলেন। এসব না করিলে নয়, তাই করিলেন। আবার রান্না-ঘরে গেলেন। প্রফুল্লের জন্য ভাত বাড়িলেন। ভাত বাড়িয়া বড়-ঘরে আনিয়া ঢাকিয়া রাখিলেন। নিজে খাইলেন না। বারান্দায় আসিয়া বসিলেন। চিন্তা অসহ্য হইল। প্রতি মুহূর্ত্তে মনে হইতে লাগিল—এই প্রফুল্ল আসিতেছে—কিন্তু প্রফুল্ল আসিল না। শেষে আর বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। হৃদয় অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। ঘরে আসিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িলেন। মন কত কি কুকথা বলিল। হৃদয় কত কি ভয় দেখাইল। একমনে কেবল প্রফুল্লের কথা ভাবিতে ভাবিতে শেষে চোখে একটু তন্দ্রা আসিল। তন্দ্রার ঘোরে স্বপ্ন দেখিলেন, তিনি প্রফুল্লকে খুঁজিতে খুঁজিতে এক নিবিড় বনের মধ্যে যাইয়া পড়িয়াছেন। প্রফুল্ল আগে আগে ছুটিতেছে। তিনি কিছুতেই তাহাকে ধরিতে পারিতেছেন না। প্রফুল্ল বড় দুরন্ত। দৌড়িতে দৌড়িতে উভয়ে এক স্রোতস্বিনীর তীরে আসিয়া পড়িলেন। ভাবিলেন এইবার প্রফুল্লকে ধরিবেন। প্রায় ধরিয়াছেন এমন সময় দুষ্টু-ছেলে সেই বেগবতী নদী-স্রোতে ঝাঁপাইয়া পড়িল। পড়িবামাত্র তীব্রস্রোতে তাহাকে অনেক দূরে লইয়া গেল। দেখিতে দেখিতে প্রফুল্ল এক ভয়ঙ্কর আবর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া ডুবিয়া গেল। প্রফুল্লের মাও ঝাঁপাইয়া অগাধ জলে পড়িলেন। অমনি নিদ্রা

ভাঙ্গিয়া গেল। ধড়ফড় করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া বসিলেন। এমন সময়ে জ্যোতি আসিয়া "মাসী-মা, প্রফুল্ল জলে ডুবিয়া"—বলিতে বলিতে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। সে স্বর ও সে ক্রন্দন বজ্রের আগুনের মত প্রফুল্লের মার বুকের মধ্যে প্রবেশ করিল। তিনি—'অ্যাঁ—বাবা"—বলিয়া উন্মাদিনীর মত ছুটিয়া বাহিরে আসিতে-ছিলেন, চৌকাঠে দারুণ আঘাত পাইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন।

আকাশে চাঁদ উঠিয়াছিল। একখানা বড় কাল মেঘ আসিয়া তাহা ঢাকিয়া ফেলিল। হা-হা করিয়া একটা দম্‌কা বাতাস আসিল। তেঁতুল গাছের ডালের উপর বসিয়া একটা পেঁচা কর্কশ স্বরে ডাকিতে লাগিল!

শ্রীক্ষীতেন লাল সাহা।

স্মৃতি-পূজা—বঙ্কিমচন্দ্র

বঙ্কিমবাবুর মৃত্যু হইয়াছে ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে। সে আজ ২১ বৎসরের কথা। সেকাল হইতে একাল পর্য্যন্ত নানা মাসিকে নানা-ভাবে তাঁহার সম্বন্ধীয় নানা কথা প্রকাশিত হইয়াছে। তার পর রায় সাহেব হারাণচন্দ্র রক্ষিতের "বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিম" প্রকাশিত হইয়াছে। বঙ্কিমবাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র শচীশবাবু তাঁহার জীবনচরিত লিখিয়াছেন। আর সকলের উপর গত বৈশাখের 'নারায়ণে' নানা মনীষী বঙ্কিমবাবু সম্বন্ধে নিজ নিজ অভিমত প্রকাশ করিয়া একেবারে ও-বিষয়ের চূড়ান্ত করিয়াছেন। সুতরাং এখন আর তাঁহার সম্বন্ধে কোন কিছু বলিতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র। কিন্তু তবুও মহাজনের পুণ্যচরিত আলোচনায় পুণ্য বই পাপ নাই মনে করিয়াই আমার এ প্রয়াস।

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের শেষ ভাগে আমি সর্ব্বপ্রথম কলিকাতায় যাই। মফঃস্বলের লোক—পূর্ব্বে কখনও কলিকাতায় আসি নাই, তাই সেখানে গিয়া প্রতিদিনই দর্শনীয় স্থানগুলি দেখিয়া সময় কাটাইতে লাগিলাম। এইভাবে একদিন কলেজ ষ্ট্রীট দিয়া ঠিক মৃজাপুর ষ্ট্রীটের কাছে আসিয়া বিজ্ঞাপন দেখিলাম,—"অদ্য অপরাহ্ণ ৫॥ ঘটিকার সময় রায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর 'Society for the Higher Training of Young Men' গৃহে বৈদিক সাহিত্য (Vedic Literature) সম্বন্ধে ইংরাজী প্রবন্ধ পাঠ করিবেন।" তখন বৈদিক সাহিত্য সম্বন্ধীয় ইংরাজী প্রবন্ধ বুঝিবার ক্ষমতা আমার হয় নাই, কিন্তু সেখানে গেলে বঙ্কিমবাবুকে দেখিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিব, এই অভাবনায় সুযোগ পাইয়া আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম।

তখন আমার আত্মীয় শ্রীযুত অনাদিনাথ সেন (বর্ত্তমানে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট) ও শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ মুস্তফী (বর্ত্তমানে উকীল) আমার সঙ্গে ছিলেন। বক্তৃতা শুনিতে ও বঙ্কিমবাবুকে দেখিতে যাইবার জন্য তাঁহাদিগকে ধরিয়া বসিলাম। কিন্তু উভয়েই তখন কলেজের ছাত্র—তাঁহাদের পরীক্ষার বৎসর, তাই তাঁহারা পড়ার ক্ষতি হইবে বলিয়া আমার সঙ্গে যাইতে পারিলেন না। তাঁহারা মৃজাপুর ষ্ট্রীটের উপর দাঁড়াইয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশে আমাকে গোলদীঘীর অপর পারস্থিত Institute-গৃহ দেখাইয়া দিলেন। তাঁহাদের নির্দ্দেশমত আমি মৃজাপুর ষ্ট্রীট ধরিয়া কলেজ স্কোয়ারের মোড় পর্য্যন্ত আসিয়াছি, এমন সময় আমার পশ্চাৎ হইতে তীক্ষ্ণচক্ষু, শ্বেতমস্তক, শ্মশ্রুগুম্ফহীন, কোট-পেণ্টুলান-পরিহিত একটি তেজস্বী পুরুষ অগ্রে চলিয়া গেলেন। তাঁহার মস্তকে felt cap জাতায় একটি মখমলের টুপি—বামহস্তে কতকগুলি ভাঁজকরা ফুলস্ক্যাপ কাগজ। ইঁহাকে দেখিয়া স্বতঃই আমার মনে হইল, ইনিই বঙ্কিমবাবু! আমি পূর্ব্বে বঙ্কিমবাবুকে কখনও দেখি নাই—শুধু তাঁহার ছবি দেখিয়াছিলাম। কিন্তু তবুও ইনিই বঙ্কিমবাবু বলিয়া আমার মনে দৃঢ় ধারণা হইল—আর আমি বিহ্বলচিত্তে একেবারে তাঁহার সম্মুখে গিয়া তন্ময় হইয়া তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিলাম। আমার অল্প বয়স ও আমার ভাব দেখিয়া তাঁহার মনেও বুঝি একটু কৌতূহল হইল। তিনি প্রশান্ত দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন। তাহাতেই যেন আমার উৎসাহ বাড়িল। আমি স্থানকালপাত্র ভুলিয়া তাঁহার কাছে গিয়া বলিলাম, "আপনিই বঙ্কিমবাবু?" তিনি হাত বাড়াইয়া আমার হাত ধরিলেন। আমি কৃতার্থ হইয়া তাঁহার পায়ে লুটাইয়া পড়িলাম—তিনি পিতৃস্নেহে আমাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া স্নেহব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন—"আশীর্ব্বাদ করি মাতৃভাষার সেবা করিয়া যশস্বী হও।" অস্তগমনোন্মুখ রবি-করোজ্জ্বল রাজপথে মহাপুরুষের আশীর্ব্বাণী আমার কর্ণে দৈববাণীর ন্যায় প্রবেশ করিয়া আমাকে

তড়িৎ-স্পৃষ্টবৎ অভিভূত করিয়া তুলিল। আমি উত্তেজিত হইয়া আবার তাঁহাকে প্রণাম করিয়া মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম, 'যেমন করিয়া হউক, যে ভাবেই থাকি, মাতৃভাষার সেবা করিবই।' বঙ্কিম-বাবু আমাকে লইয়া Institute গৃহের দিকে চলিলেন। পথে চলিতে চলিতে তিনি, আমার বাড়ী কোথায়, কলিকাতায় কেন আসিয়াছি, কোথায় আছি, কতদিন থাকিব, ইত্যাদি কথা জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তাহার সহিত তাঁহার পটলডাঙ্গার বাড়ীতে গিয়া দেখা করিতে বলিলেন।

বঙ্কিমবাবুর সহিত সভাস্থলে প্রবেশ করিয়া একেবারে তাঁহার বামপার্শ্বের আসনে উপবেশন করিলাম। তাঁহার সহিত দেখিয়াই বোধ হয় কেহ আমাকে বাধা দিল না।

যথাসময়ে বঙ্কিমবাবু তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রবন্ধ ফুলস্ক্যাপ কাগজে half margin রাখিয়া লেখা ছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্রবন্ধ বুঝিবার মত বিদ্যা আমার ছিল না। কিন্তু তবুও যতক্ষণ তিনি প্রবন্ধ পাঠ করিতেছিলেন, ততক্ষণ আমি আপনা ভুলিয়া তন্ময় হইয়া তাঁহারই মুখের দিকে চাহিয়াছিলাম। এমনই তাঁহার বলিবার ভঙ্গী—এমনই তাঁহার সরল সতেজ উচ্চারণ-কৌশল। বঙ্কিমবাবু যখন প্রবন্ধ পাঠ শেষ করিলেন তখন রাত্রি হইয়া গিয়াছে। তাই আমি মেসে যাইবার জন্য উঠিয়া পড়িলাম। যাইবার সময় বঙ্কিমবাবুকে বলিতে পারিলাম না—পারিলাম না নহে—বলিবার সাহসও হইল না। কারণ, তখন তাঁহার আশে পাশে কলিকাতার অনেক প্রধান পুরুষ উপবিষ্ট ছিলেন। মেসে গিয়া একথা বলিলে, সকলেই আমার অভিনব সৌভাগ্যে আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। যশোহর ইতিনা নিবাসী শ্রীযুত জ্ঞানদানন্দ সেন সেই মেসে থাকিতেন। তাঁহার আনন্দই যেন সকলের চেয়ে বেশী হইয়াছিল। তিনি এতদূর আনন্দিত হইয়াছিলেন যে, সেই রাত্রিতেই আমাকে দোকানে লইয়া গিয়া কিছু না খাওয়াইয়া ছাড়িলেন না।

রাত্রে শয়ন করিয়া এবিষয় চিন্তা করিতে লাগিলাম, আর ভাবিতে লাগিলাম—একি হইল! বঙ্কিমবাবুর সম্বন্ধে কত কথা শুনিয়াছিলাম—শুনিয়াছিলাম তিনি অহঙ্কারী, তিনি দেমাকী, তিনি সমপদস্থ, সমকক্ষ ব্যক্তিবর্গের সহিত মিশিতে কুণ্ঠাবোধ করেন—তিনি নিজের গৌরবে নিজেই সকলের নিকট হইতে স্বতন্ত্র থাকিতে ভালবাসেন। কিন্তু একি দেখিলাম! যিনি আমার ন্যায় অপরিচিত নগণ্য বালকের সহিত এমন সদয়, এমন মধুর ভাবে মিশিতে পারেন, তিনি যদি অহঙ্কারী হন, তিনি যদি দেমাকী হন, তবে সরল, বিনয়ী, সহৃদয় কাহাকে বলিতে হইবে জানি না।

বঙ্কিমবাবুর চরিত্রের বিশেষত্ব দেখিলাম তাঁহার আশীর্ব্বাদে। কেহ কাহাকে প্রণাম, অভিবাদন বা নমস্কার করিলে লোকে আশীর্ব্বাদ করে—'সুখী হও, নিরোগী হও, ধনপুত্রে লক্ষ্মীলাভ হউক।' কিন্তু বঙ্কিমবাবু ইহার কিছুই বলিলেন না—তিনি বলিলেন—"আশীর্ব্বাদ করি মাতৃভাষার সেবা করিয়া যশস্বী হও।" মাতৃভাষার সেবায় উৎসর্গীকৃতপ্রাণ মহাপুরুষের এইটুকুই বিশেষত্ব; আর এই বিশেষত্বই সাধারণ হইতে তাঁহাকে অনেক দূরে, অনেক উচ্চে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছে।

মহাজনের কথা চিন্তা করিতে করিতে নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম। পরদিন সকালে উঠিলেই জ্ঞানদাবাবু আমাকে বঙ্কিমবাবুর বাড়ীতে গিয়া দেখা করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। কিন্তু আমার যেন কেমন লজ্জা ও বাধ বাধ বোধ হইতে লাগিল। তাঁহাকে বলিলাম—'এখন থাকুক পরে যাইব।' ইহার পর অতি শীঘ্রই আমাকে দেশে ফিরিয়া আসিতে হয়। তখন মনে করিলাম, 'আবার যখন আসিব তখন দেখা করিব।' কিন্তু আমার অদৃষ্টে আর মহাপুরুষ-দর্শন ঘটিল না। আমি বাড়ী আসিবার দুই তিন মাস পরেই তিনি মর্ত্ত্যলীলা সম্বরণ করিয়া স্বর্গধামে প্রয়াণ করিলেন। এ সংবাদে আমার মনে যে কি ভাবের উদয় হইয়াছিল তাহা

আমি বুঝাইতে পারিব না। মনে হইতে লাগিল—হায়! কেন আমি তখন বাড়ী গিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিলাম না! নিজের বুদ্ধির দোষে এমন সুযোগ হেলায় হারাইলাম!—ইহা নিতান্তই অদৃষ্টের ফের। মহাপুরুষ তাঁহার সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার আশীর্ব্বাদ এখনও প্রতিনিয়ত আমার কর্ণে প্রবেশ করিয়া আমাকে সাহিত্য-চর্চ্চায় উদ্বোধিত করিতেছে।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার সেন।

সঙ্গীতে বিজ্ঞান

সঙ্গীত সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিতে হইলে, প্রথম শব্দ কাহাকে বলে জানা চাই। একটা পুষ্করণীর উপর স্থির জলে আঙ্গুল নাড়িলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, আঙ্গুলের চারিদিকে গোল গোল বৃত্তাকার ঢেউয়ের সারি ছুটিয়া চলিয়াছে। জলে আঙ্গুল নাড়িলে যদি ঢেউ উঠে, তবে বাতাসে কোনও জিনিস নাড়িলে ঢেউ কেন না উঠিবে? আমরা যখন কথা বলি, তখন আমাদের জিহ্বা সামনের বায়ুটাকে নাড়া দেয়। সেই নাড়াটা ঢেউএর আকারে চারিদিকে ছুটিয়া চলে। ঢেউএর চলিবার পথে যদি মানুষের কাণ থাকে, তাহা হইলে কতকটা ঢেউ কাণে প্রবেশ করিয়া কাণের ভিতরকার একটা চর্ম্মপটহকে কাঁপাইয়া তুলে। কাণের ভিতরকার এই কাঁপুনিটুকুই শব্দের অনুভূতির কারণ। বায়ুতে ঢেউ সৃষ্টি করে কম্পমান জিনিস। জিনিস কাঁপিবার সময় বায়ুতে আঘাত দেয়। যদি সেকেণ্ডে বিশবার কাঁপে, তবে বায়ুতে আঘাতও পড়ে সেকেণ্ডে বিশবার, আর আমাদের কর্ণের চর্ম্ম পটহও বিশবার করিয়া নড়িতে থাকে।

তবে দেখা যাইতেছে যে, শব্দ আর কিছুই নহে, কেবল বাতাসে কম্পন বা ঢেউ মাত্র। শব্দটা যখন কম্পন মাত্র, তখন বিভিন্ন রকমের শব্দের কম্পন যে বিভিন্ন রকমের, তাহা বুঝিতে বিশেষ কষ্ট হয় না। যে আওয়াজ যত চঞ্চল তাহার কম্পনের সংখ্যা তত বেশী, এ কথা আমি যে কেবল মুখে বলিলাম তাহা নহে। আমার পরীক্ষণাগারে কেহ আসিলে আমি তাঁহাকে সহজেই যন্ত্রের সাহায্যে দেখাইতে পারি যে, কম্পনের সংখ্যা যত বাড়িতেছে আওয়াজ ততই চড়িতেছে। শুধু তাহাই নহে। একটা যন্ত্র যখন কাঁপিতেছে ও বায়ুতে শব্দের ঢেউ তুলিতেছে, তখন আমি সহজেই সূক্ষ্ম যন্ত্রের সাহায্যে সেকেণ্ডে কতবার

কাঁপিতেছে, তাহাও গণিয়া বলিতে পারি। শুধু তাহাই নহে। একটা কম্পমান জিনিস বায়ুতে ঢেউ তুলিলে ঢেউটা কি রকম আকারের হয়, তাহাও আমি কাগজে আঁকিয়া লইতে পারি। একরূপ বলিতে গেলে Gramophoneএর রেকর্ডে শব্দের ঢেউ চিত্রিত হইয়া থাকে, শব্দটা ছবির মধ্যে বাঁধা পড়িয়া নিস্তব্ধ হইয়া আছে, পিনের সহিত ঘর্ষণ পাইলেই, ঘুমন্ত রাজকুমারী যেমন সোনার কাঠির স্পর্শে জাগিয়া উঠিয়াছিলেন, সেইরূপ মুখরিত হইয়া উঠে। ঢেউ অবশ্য নানা আকারের হইতে পারে, এক জলেই কত প্রকারের ঢেউ দেখা যায়। সে কথা পরে বলিতেছি।

টেব্‌ল হার্ম্মোনিয়ামের চাবি বাঁ দিক হইতে ডানদিকে অনবরত চড়িয়া গিয়াছে। সাধারণতঃ মাঝখানের C চাবি হইতে যে আওয়াজ বাহির হয়, তাহার কম্পন সেকেণ্ডে ২৫৬ বার। তাহার আগের C সেকেণ্ডে ১২৮ বার ও পরেরটা ৫১২ বার। একটা বেহালা যদি হার্ম্মোনিয়ামের একটা চাবির সঙ্গে একসুরে বাঁধা যায়, তাহা হইলে বেহালার তাঁতটা সেকেণ্ডে যতবার কাঁপিবে, হার্ম্মোনিয়ামের সেই চাবির রীডের পিতলের কল কটাও ঠিক ততবার কাঁপিবে। এইখানে একটা কথা উঠিতে পারে যে, যদি শব্দ কেবল মাত্র বায়ুতে আন্দোলন হইতে প্রসূত হয়, তাহা হইলে দুইটা বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ দুইরকম কেন? ঐ বেহালাটা যখন হার্ম্মোনিয়ামের একটা সুরের সঙ্গে বাঁধা হইয়াছে, তখন হার্ম্মোনিয়ামের রীডের কল কটা সেকেণ্ডে যতবার কাঁপিতেছে, বেহালার তাঁতটাও ঠিক ততবার কাঁপিতেছে। তাই যদি হইল, তবে হার্ম্মোনিয়ামের ধ্বনিটা এক রকমের ও বেহালার ধ্বনিটা আর এক রকমের কেন? ইহার উত্তরে এই বলা যাইতে পারে—শুধু বলা নয়, পরীক্ষা করিয়া দেখান যাইতে পারে যে, একটা যন্ত্রের একটা সুর যখন বাজে, তখন যে শুধু কেবলমাত্র সেই একটা সুর বাজে তাহা নহে, তাহার উচ্চ সপ্তকের দুই একটা সুর সেই সঙ্গে সঙ্গে ক্ষীণভাবে ধ্বনিত হয়। হার্ম্মোনিয়ামের যখন আমি এই 'সা' টা

বাজাইতেছি তখন আসল এই সুরটা ত বাজিতেছে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ইহার উচ্চ সপ্তকের কয়েকটা সুর স, গ, গ, ইত্যাদিও ক্ষীণভাবে বাজিতেছে। বেহালাতে বাজাইবার সময়েও উচ্চ সপ্তকের সুর বাজে, তবে হার্ম্মোনিয়ামে যে কয়টা বাজে, ঠিক সেই কয়েকটা নহে, অন্য কয়েকটা। তার কারণ সে তাঁত আর রীডের পিতলফলক ত এক বস্তু নয়। দুইটার কম্পনের সংখ্যা এক হইলেও কাঁপিবার ভঙ্গী এক রকম না হওয়াই সম্ভব। তবে একটা আশ্চর্য্য এই যে, কাঁপিবার ভঙ্গীটা যেরূপই হউক না কেন, ইহাকে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, একটা আসল কাঁপুনির সহিত তাহার উচ্চ সপ্তকের (অর্থাৎ ডবল কি তিনগুণ কম্পনওয়ালা) কাঁপুনির মিশ্রণ আছে। কাঁপুনির ভঙ্গী বিভিন্ন রকমের হইলে বাতাসে তাহার দ্বারা যে ঢেউ উৎপন্ন হইবে তাহা বিভিন্ন রকমের হইবে। বিভিন্ন রকমের ঢেউ কিরূপ হইতে পারে তাহার কয়েকটী চিত্র দেওয়া গেল ;—

নানা রকমের ঢেউ
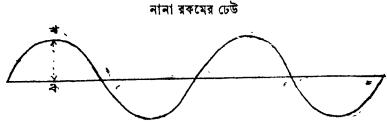
একটা শুদ্ধ সুরের ঢেউ যেমন সা মুখবন্ধ অর্গান পাইপে পাওয়া যায়।
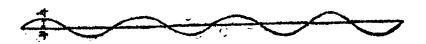
তাহার উচ্চ সপ্তকের ঢেউ, সা খুব ক্ষীণভাবে বাজিতেছে। ক খ যত উচ্চ হইবে, ঢেউও তত জোরাল হইবে।
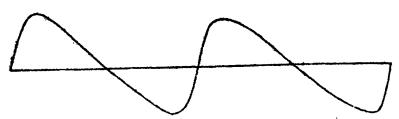
ঐ দুইটার মিলনে ঢেউয়ের আকার প্রায় বেহালার ধ্বনির ঢেউয়ের মত।
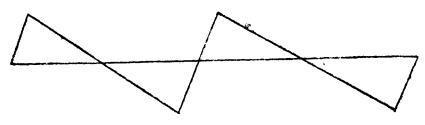
বেহালার ধ্বনির ঢেউ। *

অর্গান পাইপের মুখবন্ধ করিয়া বাজাইলে তাহা হইতে যে আওয়াজ বাহির হয় তাহা প্রায় শুদ্ধ, ইহার সহিত উচ্চ সপ্তকের সুরের প্রায় মিশ্রণ নাই। এরূপ আওয়াজ মিষ্ট হইলেও বড় মৃদু এবং বেশী খাদে নামিলে মোটেই সুশ্রাব্য নহে। খোলা অর্গানের একটা সুরের সহিত তাহার পঞ্চম ষষ্ঠ সপ্তক পর্য্যন্ত প্রায় সব কয়টার সুরই থাকে। এরূপ যন্ত্রের আওয়াজের গাম্ভীর্য্য খুব বেশী। ষষ্ঠ সপ্তকের উচ্চের দুই একটা যদি সুরের সহিত মিলিত থাকে তাহা হইলে গাম্ভীর্য্য নষ্ট হয় বটে, কিন্তু মিষ্টতা খুব বাড়ে এবং এরূপ তীক্ষ্ণ হয় যে, মনে হয় যেন

---

* আমি Transverse ঢেউ আঁকিয়াছি, অর্থাৎ ঢেউ যে মুখে চলে কম্পমান কণাগুলি তাহার লম্বভাবে নাচে, কিন্তু বাস্তবিক শব্দের ঢেউ বাতাসে Longitudinal, বায়ুর কণাগুলি ঢেউয়ের চলিবার পথেই আনা গোনা করে। সাধারণ পাঠকের বুঝিবার সুবিধার জন্য ঐরূপ আঁকা হইয়াছে। ঢেউ উপরে উঠার অর্থ Compression, ও নিচে নামার অর্থ Rarefaction, লেখক।

আওয়াজটা শরীর ভেদ করিয়া অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করিল। বেহালা ক্লারিয়নেট ইত্যাদি এই ধরণের। খুব উচ্চ সপ্তকের সুরের মিশ্রণ থাকিলে আওয়াজটা নাকিসুরে শুনায়। গ্রামোফোনের পিনের সহিত রেকর্ডের ঘর্ষণে এরূপ হয় বলিয়া নাকিসুর বড় বেশী পাওয়া যায়। আমাদের গলার আওয়াজে কি কি উচ্চ সপ্তকের মিশ্রণ আছে, তাহা একজন জর্ম্মান বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন। তারপর তিনি সেই কয়টা সুর মিশাইয়া অবিকল মানুষের গলার আওয়াজ বাহির করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। একটা সপ্তকের মধ্যে সাতটা সুরের প্রত্যেকটা সেকেণ্ডে কতবার কাঁপিতেছে, তাহা যদি পরীক্ষা করিয়া বাহির করা যায়, তাহা হইলে একটা বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যায়। স্পন্দনগুলার পরস্পরের সঙ্গে অনুপাত অতি সহজ :—

সা : র্সা	১ : ২
সা : পা	২ : ৩
সা : মা	৩ : ৪
সা : গা	৪ : ৫
সা : △ গা	৫ : ৬

অর্থাৎ নিচের সা যদি সেকেণ্ডে ১০০ বার স্পন্দিত হয় ত তাহার উপরের সা সেকেণ্ডে ২০০ বার স্পন্দন করিবে। সা যদি ১০০ বার হয় ত পা হইবে ১৫০ বার, মা হইবে প্রায় ১৩৩ বার। সঙ্গীতে একটা সপ্তকের মধ্যে এই সাতটা সুরই বা কেন আছে ও তাহাদের পরস্পরের মধ্যে এমন সহজ অনুপাত বা simple ratio কেন বর্ত্তমান,

তাহা মানব সমাজে চিরকাল একটা বড় সমস্যা। পিথাগোরাস ২৫০০ বৎসর পূর্ব্বে সুধীগণকে এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন। সাতটা সুরের অস্তিত্বের সন্তোষজনক কারণ বাহির করিতে না পারিয়া পূর্ব্বে ইহার অনেক রকম অদ্ভুত ব্যাখ্যা হইয়াছিল।

কেহ বলিতেন, পৃথিবীতে সাত এই সংখ্যাটাই পবিত্র। দেখ সূর্য্যের আলোক সপ্তরশ্মির সমষ্টি, আকাশে মাত্র সাতটা গ্রহ আছে, এমন কি পিথাগোরাস এই হইতে গ্রহগণের সঙ্গীতও নাকি শুনিতে পাইলেন। পরে যখন সাতটা সুরের মধ্যে ভাগ করিয়া বারটা সুর প্রস্তুত হইল, কেহ কেহ বলিলেন যে, বৎসরের মধ্যে যেমন বারটা মাস আছে সেইরূপ একটা সপ্তকে বারটা সুরও আছে। যাহা হউক, সাতটা সুরের অস্তিত্বের কারণ খুঁজিয়া বাহির করা অপেক্ষাকৃত সহজ। সমস্ত ব্যাপারটা ভাল করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। দুইটা সুরের একটার স্পন্দন যখন আর একটার ঠিক দ্বিগুণ হয়, তখন দুইটা সুর একেবারে মিলিয়া যায়, এমন কি একত্র বাজাইলে সহসা বুঝিতে পারা যায় না যে, দুইটা সুর বাজিতেছে কি একটা সুর বাজিতেছে। তাহা হইলে এইরূপ দুইটা সুরকে দুইপ্রান্তে রাখিয়া দেখা যাউক, মাঝে সুরটাকে কি রকম ভাবে ভাগ করিলে কাণে মিষ্ট ঠেকে। মানুষের কাণ কেবল মাত্র যে একটা সুরের মিষ্টত্ব উপলব্ধি করিতে পারে তাহা নহে, কিন্তু দুইটা সুর একত্র বাজাইলে, বা একটা সুর হইতে আর একটা সুরে যাইবার সময় তুলনা করিয়া মিষ্টত্ব উপলব্ধি করিতে পারে। প্রথমেই বলিয়াছি, একটার স্পন্দন আর একটার দ্বিগুণ হইলে দুইটা একেবারে মিলিয়া যায়। ইহার পরে যদি দুইটা সুরের স্পন্দনের অনুপাত ২ : ৩ থাকে কিংবা তিনটা সুরের অনুপাত ৪ : ৫ : ৬ থাকে, তাহা হইলেও সে মিলটা মিষ্ট লাগে। ইহার পরে যে মিলটা কাণে ভাল লাগে, তাহার অনুপাত ১০ : ১২ : ১৫। তা হইলে সাতটা সুর তৈয়ার করিতে গেলে দেখিতে হইবে, তাহার তিনটা তিনটা সুরের মধ্যে অনুপাত ৪ : ৫ : ৬ থাকে। এই অনুপাত বজায় রাখিতে গেলে

ও সুরগুলার পরস্পরের অনুপাত সহজ করিয়া রাখিতে গেলে দেখা যায়, সাতটার বেশী সুর কোনমতেই প্রস্তুত করা যায় না।

```
                                  ৪ · ৫ · ৬
                                  পা  নি  রে
                      ৪ · ৫ · ৬ |  ·    ·
                      সা  গা  পা |
১৬ · ২০ ·  | ২৪ · ৩০ · ৩৬ · ৪৬ · ৫৪
মা    ধা    সা
৪  .  ৫  .  ৬
```

তিনটা সুর লওয়া যাক্ ; ইহাদের পরস্পরের স্পন্দনের অনুপাত ৪ : ৫ : ৬,—ইহা হইল সা, গা, পা। এখন ইহার নীচে ও উপরে ৪ : ৫ : ৬ ওয়ালা, তিনটা তিনটা ছয়টা সুর লিখি, তাহা হইলে আমরা নীচে মা-ধা-সা ও উপরে পা, নি, রে পাই। এখন মা-এর দ্বিগুণ স্পন্দনওয়ালা একটা সুরকে মা নাম দিয়া গা ও পা-এর মাঝখানে ও ধা-এর দ্বিগুণ-টাকে ধা রূপে পা ও নি-র মাঝখানে এবং রে-র অর্দ্ধেক স্পন্দনওয়ালা একটু সুরকে সা ও গা-র মধ্যে দিলেই সা রে গা মা পা ধা নি সাতটা সুর প্রস্তুত হইল। সা, গা, পা-র মাঝে মাঝে সুর দেওয়ার অর্থ এই যে, সুরগুলা অত দূরে দূরে থাকিলে গানের সময় গলার খেলাইবার সুবিধা হয় না। আর যে সুরগুলা বসান হইয়াছে, তাহাদের সরল অনুপাত বজায় রাখিয়া কেবল মাত্র দ্বিগুণ বা অর্দ্ধেক করিয়া দেওয়া হইয়াছে (সা : মা : ধা = ৩ : ৪ : ৫) ; সেই জন্য সুরের বিশেষ কোনও বিকৃতি ঘটে নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দুইটা সুরে স্পন্দন একটা আর একটার দ্বিগুণ হইলে দুইটা একেবারে মিলিয়া যায়। সব কয়টা সুরের আনুপাতিক স্পন্দন সংখ্যা লিখিলে এইরূপ দাঁড়ায়—

সা	রে	গা	মা	পা	ধা	নি	সা
২৪	২৭	৩০	৩২	৩৬	৪০	৪৫	৪৮

অবশ্য একটা বাদ্যযন্ত্রে, যেমন হার্ম্মোনিয়ামে 'সা' টা যে ২৪ বার কাঁপে তাহা নহে, তবে সা যদি ২৪ বার কাঁপে, ত রে কাঁপিবে ২৭ বার, পা ৩৬ বার, ইত্যাদি ; পরস্পরের অনুপাতটা এই থাকে। আমি উপরে অনুপাত লিখিয়াছি মাত্র, বাস্তবিক এতবার কাঁপিবে তাহা লিখি নাই।

একটা সুর হইতে আর একটা কত চড়া তাহা বাহির করিতে হইলে, দুইটার অনুপাত বাহির করিলেই চলিবে, এই অনুপাতকে ইংরাজিতে Interval বলে।

সা – রে	রে – গা	গা মা	মা পা	পা ধা	ধা নি	নি সা
$\frac{২৭}{২৪}=\frac{৯}{৮}$	$\frac{৩০}{২৭}=\frac{১০}{৯}$	$\frac{৩২}{৩০}=\frac{১৬}{১৫}$	$\frac{৩৬}{৩২}=\frac{৯}{৮}$	$\frac{৪০}{৩৬}=\frac{১০}{৯}$	$\frac{৪৫}{৪০}=\frac{৯}{৮}$	$\frac{৪৮}{৪৫}=\frac{১৬}{১৫}$

এখানে তিনপ্রকার interval রহিয়াছে ; $\frac{৮}{৯}$, $\frac{১০}{৯}$, $\frac{১৬}{১৫}$, ইহার মধ্যে $\frac{৮}{৯}$ ও $\frac{১০}{৯}$ প্রায় সমান, ইহাকে tone বলে ; $\frac{১৬}{১৫}$ tone-এর প্রায় অর্দ্ধেক, ইহাকে semitone বলে। 'গা' হইতে 'মা' এবং 'নি' হইতে 'সা'-এর তফাৎ semitone, বাকিগুলার তফাৎ tone। সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই জানেন যে, গা হইতে মা ও নি হইতে সা সা-রে রে-গা, মা-পা ইত্যাদির প্রায় অর্দ্ধেক চড়া।

যাহা হউক ৪ : ৫ : ৬ এই মিলটা ভাল লাগে ইহা জানা থাকিলে, সাতটা সুর কেন হয় তাহা একরকম বুঝা গেল। ইহাও বেশ বুঝা গেল যে, স্পন্দনের অনুপাত সংখ্যা যদি সরল হয়, তাহা হইলে সে কয়টা একত্রে বাজাইলে মিষ্ট ঠেকে। কিন্তু কেন ঠেকে ? অনুপাত ৩ : ৪ : ৫ বা ৪ : ৫ : ৬ হইলে কাণের মধ্যে এমন কি আছে, যাহার জন্য আমরা আনন্দ অনুভব করি ? অনুপাতটা সরল রকমের না হইয়া যদি ২৯ : ৩৩ : ৪১ হয়, তবে কাণে বিসদৃশ লাগে কেন ? মানুষ এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য কত রকম ব্যাখ্যার সৃষ্টি

করিয়াছে। প্রসিদ্ধ গণিতবেত্তা (Euler) অয়লার-এর গবেষণা এ বিষয়ে প্রথম। অয়লার বলেন যে, মানুষের মন স্বভাবতঃই মিল চায়। বহুর মধ্যে একের সন্ধান পাইলে আনন্দ অনুভব করে। আর এই মিলও একত্ব সন্ধান করিয়া কৃতকার্য্য হইলে সন্তোষ পায়। বৈজ্ঞানিকের ব্যবসাই এই, তিনি প্রকৃতির মধ্যে চিরজীবন মিল খুঁজিতেই ব্যস্ত। পাঁচটা পাঁচ রকম প্রাকৃতিক নিয়মের পরিবর্ত্তে একটা নিয়ম বসাইতে পারিলে মনে করেন যে, একটা মস্ত বৈজ্ঞানিক সত্যের আবিষ্কার হইল। সঙ্গীতে যদি বিচিত্র রকমের স্পন্দন, একের পর এক আসিতে থাকে, আর আমরা যদি সেই বৈচিত্র্যের মধ্যে সহজ অনুপাত খুঁজিয়া বাহির করিতে পারি, যেখানে অমিল ছিল সেখানে মিল পাই, যদি দেখি যে দুইটা সুর একেবারে ভিন্ন নয় কিন্তু অনুপাতের সূত্র দিয়া বাঁধা, তবে আমরা মনে মিলনানন্দ অনুভব করি। সেই জন্য সঙ্গীতের দুইটা স্পন্দনের অনুপাত যত সহজ, যত সরল হইবে, ততই তাহা আমাদের ভাল লাগিবে। অয়লার-এর এই মত। মতের মধ্যে অবশ্য ভুল কিছুই নাই। আমরা বাস্তবিকই বিশৃঙ্খলার মধ্যে শৃঙ্খলা খুঁজিয়া পাইলে সুখ অনুভব করি। কিন্তু কথা হইতেছে যে, এই শৃঙ্খলা খুঁজিয়া বাহির করিতেছে কে? আমি আজ অঙ্কশাস্ত্র ও পরীক্ষণের সাহায্যে আপনাদের সম্মুখে শৃঙ্খলা খুঁজিয়া বাহির করিয়া দিলাম। আমি নিজে শৃঙ্খলাটি বই পড়িয়া শিখিয়াছি। আমি শিখিয়াছি বলিয়া গান শুনিতে আপনাদের চাইতে আমার যে বেশী ভাল লাগে তাহা নহে। আজ শৃঙ্খলার ব্যাখ্যা শুনিলেন বলিয়া কাল হইতে আপনারা যে গানের মস্ত সমজদার হইয়া উঠিবেন তাহাও নহে। তবে? তবে বোধ হয় অয়লারের মতের মধ্যে কোথাও একটি গলদ আছে। হয় গলদ আছে, নয় মানুষের মধ্যে এমন কিছু যন্ত্র আছে যাহা মানুষের অজ্ঞাতে ঐ শৃঙ্খলা খুঁজিয়া বাহির করে। মানুষ জানিতেও পারে না, কিন্তু ভিতরের সেই যন্ত্রটী বসিয়া বসিয়া অনবরত অমিল হইতে মিল, বিশৃঙ্খলা হইতে শৃঙ্খলা ও সুরের

স্পন্দনের মধ্যে সহজ অনুপাত বাছাই করিতে ব্যস্ত। এই যন্ত্রটির সন্ধান ও কার্য্যবিবরণী সর্ব্বপ্রথম জগতে প্রচার করে হেল্‌মহোল্‌ট্‌জ (Helmholtz)। হেল্‌মহোল্‌টজের নাম সকলেই শুনিয়াছেন; এত বড় বৈজ্ঞানিক মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তি সচরাচর জন্মান না। ইনি গোড়ায় ছিলেন ডাক্তার, তাহার পরে হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে শারীর বিজ্ঞানের অধ্যাপক হন, তারপর লাইপজিকে গণিতের অধ্যাপক, এবং শেষজীবনে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপনা করিয়া জীবন শেষ করেন। এইরূপে এক ব্যক্তির পক্ষে জ্ঞানসমুদ্রের এপার হইতে ওপারে সন্তরণ দেওয়া কম বিক্রমের কাজ নয়।

যাহা হউক, যন্ত্রটির কার্য্য বুঝিতে হইলে আর একটা বিষয়ের সামান্য একটু আলোচনা করা দরকার। আমাদের বিজ্ঞানশাস্ত্রে Sympathetic Vibration বলিয়া একটা কথা আছে। যদি দুইটা বেহালা ঠিক একসুরে বাঁধা ও কাছাকাছি থাকে তাহা হইলে দেখা যায় যে, একটাকে বাজাইলে অপরটাও বাজিয়া ওঠে। দুইটা কিন্তু ঠিক এক রকম বাঁধা থাকা চাই। একটা বেহালাকে বাজাইলে বায়ুতে যে কম্পন হয়, সেটা বেহালাটার তারের কম্পনের ঠিক তালে তালে হয়। অপর বেহালাটার কাঁপিবার ভঙ্গী ঠিক এক রকম বলিয়া, যখন এই বায়ু-কম্পন যাইয়া তাহাতে আঘাত করে, তখন সেটাও বাজিয়া ওঠে।

আর এটা পরীক্ষা করা খুবই সহজ। এস্রাজ কিংবা সেতার লইয়া তাহার দুইটা তার এক সুরে বাঁধুন; তারপর একটা তারের উপর এক টুক্‌রা কাগজ রাখিয়া অপরটাকে যদি বাজান, তাহা হইলে দেখিবেন যে, কাগজওয়ালা তার হইতে কাগজটা লাফাইয়া পড়িবে। অর্থাৎ দেখা গেল যে, একটা জিনিস সেকেণ্ডে যতবার কাঁপিতে পারে, ঠিক ততবারের বায়ুস্পন্দন যদি তাহাতে যাইয়া আঘাত করে, তবে সেটা

আপনা হইতে বাজিয়া ওঠে,—অর্থাৎ এক সুরের বাঁধা দুইটা যন্ত্র থাকিলে একটার জন্য অপরটা বাজে।

কর্ণ যন্ত্র।
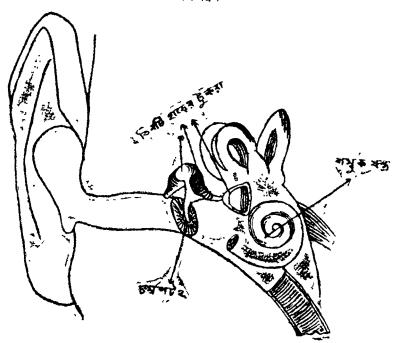
শব্দ তরঙ্গ যাইয়া চর্ম্মপটাহে আঘাত করে। স্পন্দন সেখান হইতে তিনটি ছোট হাড়ের টুকরা বাহিয়া শম্বুক যন্ত্রে পৌছায়। শম্বুক যন্ত্রের ভিতর তিনভাগে বিভক্ত। ইহার মধ্যভাগে কর্ণ-পিয়ানো-যন্ত্র অবস্থিত। ইহা পরের চিত্রে পরিবর্দ্ধিত আকারে দেওয়া হইয়াছে।

এইবার আমরা যন্ত্রটির একটু সন্ধান করি। আমাদের কর্ণের মোটামুটি বিবরণ সকলেই জানেন। কর্ণের ছিদ্রের ভিতরে একটা পাতলা চামড়া লাগান আছে। বাহির হইতে বায়ুস্পন্দনের আঘাত পাইলেই ইহা নড়িয়া উঠে। এই চামড়া হইতে কয়েকটা অস্থির টুকরা আর একটা যন্ত্রে পৌঁছিয়াছে। ইহার আকার বাহির হইতে কতকটা শামুকের মত। আমাদের সুরের মধ্যে মিল খোঁজার আসল

যন্ত্রটি এই শামুকের মধ্যে অবস্থিত। যন্ত্রটি ঠিক একটি ছোট খাট পিয়ানোর মত। দুই টুকরা অস্থির মধ্যে অনেকগুলি ছোট ছোট সূক্ষ্ম শক্ত তার (অবশ্য কোন ধাতুর নহে) ধনুকের মত বাঁকা করিয়া লাগান আছে। পিয়ানোতে একশত কি দেড়শত তার থাকিতে পারে, কিন্তু এই প্রকৃতির পিয়ানোতে প্রায় তিন হাজার তার আছে। ইহার সর্ব্বনিম্ন তার সেকেণ্ডে পনর ষোল বার কাঁপে ও সর্ব্ব উপরের তার প্রায় ৩৫০০ বার কাঁপিতে পারে। এখন যদি বাহিরে একটা সুর বাজিয়া ওঠে, তা' হইলে কি হইবে? বাদ্যের কম্পন বায়ুতে যে স্পন্দন তুলিবে, তাহা যাইয়া চর্ম্মপটহে আঘাত করিবে। সেই আঘাত হাড়ের টুকরা বাহিয়া শম্বুকের অভ্যন্তরস্থিত আমাদের পিয়ানোযন্ত্রে উপস্থিত হইবে। সে সময় কি তাহার সব তার কয়টাই বাজিয়া উঠিবে? না, কেবল মাত্র যে তারটি ঠিক বাহিরের সুরটির সঙ্গের এক সুরে বাঁধা সেইটাই বাজিতে থাকিবে, ও সেই তারের গোড়ায় যে স্নায়ুগুচ্ছ আছে, তাহারা এ সংবাদ মস্তিষ্কে পৌঁছাইয়া দিবে। (সম্মুখের চিত্র দেখুন।)

আমি গোড়ায় বলিয়াছি যে, সাধারণ বাদ্যযন্ত্রে যখন একটা সুর বাজান যায়, তখন যে কেবল সেই সুরটাই বাজে তাহা নহে—তাহার উপরের অনেকগুলি সুরও সেই সঙ্গে ধ্বনিত হইতে থাকে। আর এই সংমিশ্রণের জন্য বাদ্যযন্ত্রের যা' কিছু গাম্ভীর্য্য ও মিষ্টত্ব।

একটা সুরের সঙ্গে তাহার উপরের কোন্ কোন্ সুরের মিশ্রণ থাকা সম্ভব তাহার একটা তালিকা দেওয়া গেল :—

		।	।	।	△।	॥	॥	॥	॥	॥	॥	॥△	॥	॥।
সা়	সা	পা	সা	গা	পা	—	সা	রে	গা	—	পা	ধা	—	নি	সা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬

তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে যে, চতুর্থ সপ্তকের প্রায় সব কয়টা সুরই আসল সুরের সঙ্গে মৃদু ধ্বনিত হইতে থাকে। স্বরগ্রামের আর একটা সুর বাজাইলে তাহার উচ্চ সপ্তকের কয়েকটা

কর্ণের অভ্যন্তরস্থিত পিয়ানো যন্ত্র।
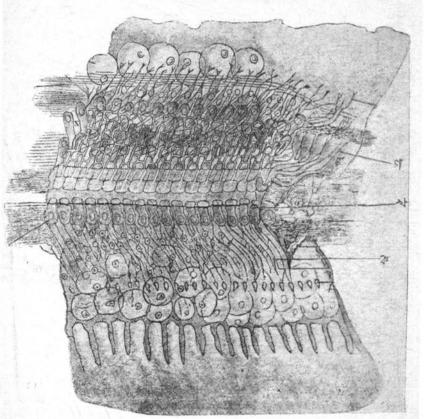
তারগুলি ঠিক সোজাভাবে নাই। 'ক' হইতে আরম্ভ করিয়া, 'খ'য়ের মধ্য দিয়া ধনুকের মত বাঁকিয়া গয়েতে পৌছিয়াছে। সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ৩০০০ এইরূপ ধনুক আমাদের কাণের শম্বুক যন্ত্রের মধ্যে অবস্থিত।

(চিত্রটি চারি শত গুণ পরিবর্দ্ধিত।)

সুর ঐ সা-এর উচ্চসপ্তকের সঙ্গে মিলিয়া যাওয়া সম্ভব। যেমন ধরুন গা।

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬

, । △। । ॥ ॥ ॥△ ॥ △।।। ।।।

গা গ নি গ ধা নি — গা মা ধা — নি — — রে গা

সেইজন্য সা ও গা একত্রে বাজাইলে অনেকটা মিলিয়া যায়। গা-টা যদি সা-এর সঙ্গে ৪ : ৫ অনুপাত না হইয়া একটু চড়া বা একটু খাদে হয়, তাহা হইলে উপরের সপ্তকের সুরগুলি মিলিবার অবকাশ পায় না।

এখন আমাদের কর্ণ-পিয়ানো-যন্ত্রে একটা সুর, যেমন ধরুন 'সা', পড়িলে কি হইবে? আসল 'সা'এর তারটা কাঁপিবেই ও সেই সঙ্গে উপরের সপ্তকের রে গা মা ইত্যাদি কাঁপিতে থাকিবে। ইহার পর আমি যদি সা টাকে ছাড়িয়া অন্য একটা সুরে যাই, তাহা হইলে সেই সুরটা কাণের যে তারগুলাকে আঘাত করিবে, তাহার অনেক গুলিই পূর্ব্ব হইতে 'সা' সুরের দরুণ কাঁপিতেছিল। যে আঘাত তারের উপর পড়িল তাহা সহসা নয়—তারটা পূর্ব্ব হইতেই অল্প অল্প কাঁপিয়া এই আঘাতের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। অর্থাৎ সুরগুলা আমাদের কর্ণপিয়ানোর তারকে এলোমেলো ভাবে আঘাত করে না, যাহাকে আঘাত করে, তাহাকে পূর্ব্ব হইতে নোটিস দেয়, সে পরবর্ত্তী আঘাতের জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। এইখানেই সঙ্গীতের মিষ্টত্ব ও এইখানেই সুরসপ্তকের বিশেষত্ব। আমরা যদি অন্য ভাবে স্বর-গ্রামের অনুপাত প্রস্তুত করি বা সাতটার বদলে নয়টা সুর রাখি, তাহা হইলে কাণের আঘাত এলোমেলো ভাবে লাগিবে ও সঙ্গীতজ্ঞ বলিয়া উঠিবেন, যন্ত্রটা বেসুরা। বাস্তবিক দুইটা সুর যদি একত্র বাজান যায়, তা হইলে দেখা যায় যে, যেখানে যেখানে দুইটা সুরের অনুপাত আমাদের স্বরগ্রামের অনুপাতের মধ্যে পড়ে, সেইখানেই মিল পাওয়া যায়। নিম্নের চিত্রিত রেখা হইতে ইহা বেশ বুঝিতে পারা যায়, রেখাটার

নিচুমুখে নামার অর্থ মিল ও কাণে মিষ্ট ঠেকা ও উপরে উঠার অর্থ অমিল ও কাণে কর্কশ ঠেকা।
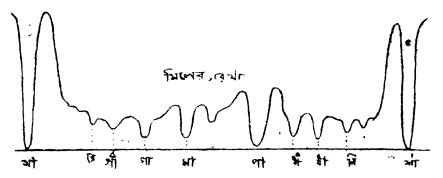
রেখা নীচে নামার অর্থ কাণে মিষ্ট লাগা, মিলন। উর্দ্ধে উঠার অর্থ অমিল ও কর্কশ। দুইজন বেহালাবাদক এক সুরে বেহালা বাঁধিয়াছে। একজন অনবরত 'সা' বাজাইতেছে, অপর ব্যক্তি ক্রমশঃ সুর চড়াইতেছে। দুইটা সুর একত্রে কাণে প্রবেশ করিলে যে যে জায়গায় মিষ্ট লাগে, সেই সেই জায়গায় সুর সপ্তকের সুরগুলি অবস্থিত।

মনে করুন দুইজন বেহালাবাদক তাহাদের যন্ত্র দুইটাকে একসুরে বাঁধিল। তারপর একজন তাহার বেহালাতে 'সা' সুরটা বাজাইতে লাগিল ও অপর ব্যক্তি 'সা' হইতে আরম্ভ করিয়া, তাহার আঙ্গুল সরাইতে সরাইতে সুরটাকে ক্রমশঃ চড়াইতে লাগিল। এখন আমাদের কাণে দুইটা সুর একসঙ্গে প্রবেশ করিতেছে। যেখানে আমাদের মিলনে কাণে মিষ্ট ঠেকিতেছে, সেখানে রেখাটা নিচে নামিয়াছে, আর যেখানে অমিলটা যত বেশী হইতেছে, সেইখানে রেখা তত উর্দ্ধে উঠিয়াছে। দুইজনেই যখন সা বাজাইতেছে, তখন রেখাটা নীচে নামিয়া একেবারে মিলিয়া গিয়াছে। একজনের বেহালা যখন সা হইতে একটু চড়িল, তখন কাণে অত্যন্ত খারাপ লাগিতেছে—রেখাটা একেবারে সহসা উর্দ্ধে উঠিয়া গিয়াছে। অপর বেহালাটা চড়িতে

চড়িতে যখন 'গা'এর কাছাকাছি আসিয়াছে, তখনও আবার বেশ মিলিবার মুখে আসিয়াছে, মা-এতেও তদ্রূপ, পা-এতে প্রায় মিলিয়া গিয়াছে। 'নি' ছাড়িয়া যখন প্রায় 'সা'এর কাছাকাছি গিয়াছে, তখন কাণে শুনিতে অত্যন্ত কর্কশ লাগিতেছে—রেখা সটান উর্দ্ধে উঠিয়া গিয়াছে—আবার 'সা'এতে গিয়া দুইটিতে একেবারে মিলিয়াছে। অর্থাৎ দেখা যাইতেছে যে, দুইটি সুর একত্র বাজাইলে অমিলই বেশী, জায়গায় জায়গায় রেখাটা নীচুমুখে নামিয়া মিলের দিকে আসে। আর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে,যেখানে যেখানে মিল হয়, সেখানে সেখানে সুর দুইটির অনুপাত অত্যন্ত সহজ, ২ : ৩, ৩ : ৪, ৪ : ৫ ইত্যাদি। আর আমাদের সুর-সপ্তকের সুরগুলি এই মিলের জায়গাতেই বসান আছে। অবশ্য যখন সপ্তক তৈয়ার হইয়াছিল, তখন এই সহজ অনুপাতের কথা কেহ জানিত না। কিন্তু তাহাদের অজ্ঞাতে মানুষের কর্ণের অভ্যন্তরস্থিত সেই বিচিত্র পিয়ানো যন্ত্রটি সহজ অনুপাতে মিলনের মিষ্টত্ব দেখাইয়া দিয়াছিল।

এই কর্ণ-পিয়ানোর আবিষ্কারকের নাম Marchese Corti; সেই জন্য ইহাকে Cortis Fibres বলে। তবে ইহার সহিত সঙ্গীতের সম্বন্ধের গবেষণা হেল্‌মহোল্টজই সর্ব্বপ্রথম করেন। কাণের এই যন্ত্রটি বাস্তবিকই অতি আশ্চর্য্য। বাহির হইতে একটা মিশ্রসুর আসিয়া কাণে পড়িল। কাণ তাহাকে ভাগ করিয়া দেখিল, তাহার মধ্যে কি কি সুর আছে। তাহার পর যখন আর একটা সুর আসিল, তখন দুইটাতে তুলনা করিয়া নিজে কাঁপিয়া বেশ বুঝিয়া লইল, উভয়ের উচ্চ সপ্তকের মধ্যে কোন্ কোন্‌টার সহিত মিল আছে। এইরূপে অনবরত বাছান গোছান চলিতে থাকে। ঠিক যেন ডাক ঘরে sorter চিঠি sort করিতেছে, বিভিন্ন জায়গার বিভিন্ন চিঠি নম্বরওয়ালা খোপে পূরিতেছে—সুবিধামত খোপ না পাইলে বিরক্ত হইয়া উঠিতেছে। কর্ণ মহাশয়ও গান শুনিবার সময় সুরের পর

সুর অনবরত বাছাই করিতেছেন, তাররূপী খোপে পূরিতেছেন ও নিমীলিত নেত্রে আনন্দ অনুভব করিতেছেন—ঠিক তারে আঘাত না পড়িলে বেসুরো বলিয়া চীৎকার করিতেছেন।

সঙ্গীত একটি আর্ট। সুতরাং অন্যান্য আর্টকে যে হিসাবে ভাল মন্দ বলা যাইতে পারে, সঙ্গীতকেও সেই হিসাবে ভাল মন্দ, উচ্চ অঙ্গের বা নিম্ন অঙ্গের বলা যাইতে পারে। আর্টের উদ্দেশ্য মানুষের মনে আনন্দ দেওয়া। আর্ট বাহিরের প্রকৃতি হইতে তাহার মাল মসলা যোগাড় করিয়া, তাহাকেই নূতন ভাবে গড়িয়া মানুষের সম্মুখে উপস্থিত করে। কিন্তু বাহিরের সঙ্গে হুবহু মিলাইতে পারিলেই যে Art হয় তাহা নহে। তাহা হইলে Photography আর্ট হইয়া যাইত। হরবোলা পাখী স্বর অনুকরণ করিয়া বড় আর্টিষ্টের পদবী লাভ করিত। আর্ট মিলের একটা আভাস দেয় মাত্র। অনেকখানি বলে, কিন্তু অনেকখানি লুকাইয়াও রাখে। আর্টিষ্ট যদি কিছু করিবার সময় নিখুঁতভাবে তুলনাটাকে ফুটাইয়া তুলেন—অথবা গোড়ার সঙ্গে শেষের সম্বন্ধটাকে জাজ্জ্বল্যভাবে দেখাইয়া দেন, অর্থাৎ তাঁহার কার্য্যে যদি Design থাকে, তাহা হইলেই তাঁহার রচনা আর্টের পদবী হইতে নামিয়া পড়িল। বুদ্ধির খেলাকেও আর্ট বলি না, তাহা' হইলে বড় বড় গণিতজ্ঞের দুরূহ প্রশ্নের সমাধা বা Steam Engine উঁচু দরের আর্ট হইত। তবে আর্ট কাহাকে বলিব ? অবশ্য আর্টের মধ্যে একেবারে Design নাই, এ কথা বলিতে পারি না। আর্ট Design লইয়া কাজ করে, কিন্তু তাহা প্রচ্ছন্ন থাকে, যখনই আর্টের মধ্যে Designটা প্রকাশ পায়, তখনই তাহা খেলো হইয়া যায়। Designটুকু খুঁজিয়া বাহির করিতে যে আয়াস হয় তাহাই আর্টের প্রাণ। বরং যেখানে খুঁজিবার জন্য বেশী চেষ্টা করিতে হয়, যেখানে যতবার খুঁজি ততবারই একটা নূতন জিনিস নূতন ভাবে লাভ করি, সেইখানেই আর্ট তত উচ্চ অঙ্গের

বলিয়া মনে হয়। Artএর মধ্যেও নিয়ম আছে। সে নিয়মটা সাধারণ মানুষের সহজ বুদ্ধি ও মনের উপর নির্ভর করে। তাহা না হইলে আর্টিষ্টের একটা রচনা আমার ভাল লাগিল বলিয়া, আমি আশা করিতাম না যে সেটা মোটামুটি জনসাধারণের ভাল লাগিবে। অন্ততঃ যাহারা ঠিক আমার মত আমার দেশের বা পরিবারের লোক তাহাদের ভাল লাগা উচিত।

সঙ্গীতের আর্টও ঠিক এইরূপে আমাদের মনের মধ্যে আনন্দ দেয়। সঙ্গীতে পরস্পর সুরের মধ্যে যে মিল আছে, সঙ্গীতকার তাহা বলিয়া দেন না। গণিতজ্ঞ বলিয়া দিলেও বাহির হইতে তাহা সহজে অনুভূত হয় না। দুইটা সুরের মধ্যে যে গূঢ় মিল আছে, তাহা কর্ণ অস্পষ্টরূপে ধরিয়া দেয়। যেখানে মিলটা খুব স্পষ্ট, যেমন একটা সুর ও তাহার ঠিক উচ্চ সপ্তকের সুর তাহারা একের পর এক বা একত্রে বাজাইলে তত আনন্দ দেয় না। কিন্তু যেখানে মিলটা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, যেখানে মিলনটাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে কর্ণকে একটু আয়াস স্বীকার করিতে হয়, সেইখানেই আমরা আনন্দ অনুভব করি বেশী; যেমন মা ও গা অথবা সা ও গা। যাঁহারা সঙ্গীত আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা বোধ হয় সকলেই দেখিয়াছেন—যখন একটা সুর হইতে একটু দূরের সুরে যাই—তখন প্রায়ই এই সামান্য একটু মিল বজায় রাখিয়া চলি। অনেক গানের অন্তরা গাহিবার সময় আমাদের গলা কিছুক্ষণ মা ও পা-র উপর খেলা করিয়া একেবারে নি-তে উপস্থিত হয়। পা ও নি-র অনুপাত ৪ : ৫। ভৈরবীর গোড়াটা গাহিবার সময় আমাদের গলাটা সা হইতে একেবারে মা-তে উপস্থিত হয়। সা ও মা-র অনুপাত ৩ : ৪। এইরূপ খুঁজিলে আরও অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়।

আমরা একটা তালিকা দিলাম :—

অন্তরা যে যে সুরের উপর দিয়া যায়	রাগ বা রাগিণীর নাম
অন্তরা গাহিবার সময় পা কিংবা মা, পা হইতে একেবারে নি-তে যাইয়া তারার সা-তে পৌঁছে। মা : সা—২ : ৩, পা : নি—৪ : ৫	দেশ, সুরট, সিন্ধু, সিন্দুড়া, সাহানা, মল্লার, তিলককামোদ, বৃন্দাবনী সারঙ্গ। *
অন্তরাতে গা, পা, ধা, সা এই সুরগুলির উপর দিয়া যাইতে হয়। গা : পা—৫ : ৬, ধা : সা—৫ : ৬	বিভাষ, ভূপালী, ইমন, পূরবী।
অন্তরা গাহিবার সময় মা, ধা, নি সা, কিংবা গা, মা, ধা, নি, সা, এইরূপে যাইতে হয়। মা : ধা—৪ : ৫	খাম্বাজ, সোহিনী, বসন্ত, শ্যাম, হাম্বীর।

১। এমন অনেকগুলি সুর আছে যাহার অন্তরা গাহিবার সময় পা কিম্বা মা পা সুর হইতে একেবারে নি-তে যাইয়া তারার সা-তে পৌঁছিতে হয়; যথা,—দেশ, সুরট, সিন্ধু, সিন্ধুড়া, সাহানা, মল্লার তিলক-কামোদ, বৃন্দাবনী সারঙ্গ *। এখানে পা-এর পরেই নি সুর

---

* পাঠক মনে না করেন যে, এই রাগিণীগুলি একজাতীয় বা নিকট-সম্বন্ধ। সারঙ্গ ও সাহানায় আকাশ পাতাল প্রভেদ।

উচ্চারণে বিজ্ঞানসম্মত স্বাভাবিক Harmony বা মিষ্টত্ব বর্ত্তমান। বেহাগ রাগিণীতে এইটি সুস্পষ্ট।

২। আবার কতকগুলি রাগিণীর অন্তরাতে গা পা ধা র্সা এই সুরগুলির উপর দিয়া যাইতে হয়। অর্থাৎ মা ও নি-কে বাদ দিয়া যায়; যথা,—বিভাষ, ভূপালী, ইমন, পূরবী। এখানেও গা ও পা এবং ধা ও র্সা-এর মধ্যেও ঐ হার্ম্মনির নিয়মটুকু দেখিতে পাওয়া যায়।

৩। আবার কতকগুলি রাগিণীর অন্তরাতে মা ধা নি র্সা কিম্বা গা মা ধা নি র্সা এইরূপ গাহিতে হয়। যথা—খাম্বাজ, সোহিনী, বসন্ত, শ্যাম, হাম্বীর।

সঙ্গীতজ্ঞ পাঠক একটু চেষ্টা করিলে এইরূপ অনেক উদাহরণ পাইতে পারেন।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি হার্ম্মনি-তত্ত্বটুকু লইয়াই প্রধানতঃ আলোচনা করিয়াছি। সঙ্গীতে সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য সৃষ্টির সময়ে যে Harmony ভিন্ন অন্য উপায় ব্যবহৃত হয় না তাহা নহে। কোথাও Harmony বা মিল, কোথাও বৈপরীত্য, উভয় ব্যাপরই ব্যবহৃত হয়। কোথাও সা-এর পরেই রে কোমল, কোথাও পা-এর পরেই ধা কোমল, এরূপ প্রায়ই উচ্চারিত হইয়া থাকে। এখানে বৈপরীত্যও বিরুদ্ধ ভাবের পরেই সহজ সুরে আসিবার একটি আরাম ও আনন্দ পাওয়া যায়।

আমরা এতক্ষণ সঙ্গীতের বিজ্ঞান ও সৌন্দর্য্যবোধের আলোচনা করিলাম। ইহার মধ্যে মোটামুটি দেখিতে গেলে গোড়ার আলোচনাটাই দুরূহ। কিন্তু আমরা যদি সঙ্গীতে সৌন্দর্য্যবোধের আরও গূঢ় ভাবে আলোচনা করিতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে সৌন্দর্য্যবোধ ব্যাপারটাই বেশী দুরূহ হইয়া দাঁড়াইবে। সঙ্গীতকার যেখানে সুরের খেলার মধ্যে নিজের প্রাণ নিজের passion ঢালিয়া দেন, তন্ময়ভাবে বিভোর হইয়া অলৌকিক সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করেন, তাহার সহিত

প্রকৃতিতে তুলনা ত কিছুই নাই ? মানুষ রাগ দ্বেষ ভয় ভালবাসার যে স্ফুট বা অস্ফুট আবেগময়ী ধ্বনি করে, তাহার সহিত সঙ্গীতের ধ্বনির আপাত দৃষ্টিতে কোনও মিলই ত পাওয়া যায় না। তবে যখন সঙ্গীতকার নিজের সুরের পর সুরে, মিড় মুর্চ্ছনা গমকের সাহায্যে, কখনও দ্রুত কখনও ধীরে, কখনও আরোহন কখনও অবরোহন করিয়া, কখনও গিরিনির্ঝরিণীর মত উল্লম্ফন প্রদানে, কখনও বিশাল সাগরের মত গম্ভীর গর্জ্জনে চলিয়া যান, তখন কেন আমাদের মনের মধ্যে নানারূপ সৌন্দর্য্যরাজ্যের সৃজন হয়, কেন আমাদের অন্তর্নিহিত বাসনা ও বেদনা এক অব্যক্ত মূর্ত্তি পরিগ্রহণ করিয়া ফুটিয়া উঠে ? বাহিরে প্রকৃতির সহিত যদি কোনও মিল নাই তবে কেন এমন হয় ?

ইহা গবেষণার বিষয় বটে। আমি কিন্তু এখন আমার বিজ্ঞান রাজ্যের সীমানায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। সুতরাং সৌন্দর্য্যবোধের গবেষণা যতই উচ্চ দরের হউক না কেন, আমি আমার অধিকার ছাড়িয়া বাহিরে যাইতে প্রস্তুত নহি।

শ্রীশিশিরকুমার মিত্র।

প্রমাণ

[গল্প]

তিনটি প্রাণী লইয়া সংসারটি কালস্রোতে সুখের তরণীর মত ভাসিয়া চলিতেছিল। স্বামী সুধাময়, স্ত্রী অরুণা এবং কন্যা করুণা। সুধাময়ের বয়স পঁয়ত্রিশ বৎসর, মার্চ্চেণ্ট্ আফিসে বড় চাকরি করে, শরীর একটু রুগ্ন এবং অলস, মনটি কিন্তু বিশেষভাবে প্রবণ এবং প্রবল, অর্থাৎ গিরিনদীর মত, অতি অল্প কারণেই বহিতে আরম্ভ করে এবং যখন বহিতে আরম্ভ করে তখন খরস্রোতে যুক্তি ও তর্ককে উপলখণ্ডের মত ভাসাইয়া লইয়া চলে। স্ত্রী অরুণার বয়স পঁচিশ বৎসর। গত পাঁচ বৎসর হইতে যাহারা তাহাকে লক্ষ্য করিতেছে, তাহাদের মনে হয় সে যেন যৌবনের সর্ব্বান্তস্তরে উপনীত হইয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছে—যেখান হইতে তাহার পতনের কোন লক্ষণ নাই। কেবলমাত্র একটি সন্তানের মাতৃত্বে অভিষিক্ত হইয়াই সে অব্যাহতি লাভ করিয়াছে। তার মনের তুষ্টি এবং দেহের স্বাস্থ্য উভয়ের সাহচর্য্যে তাহার নিটোল প্রসন্ন মূর্ত্তিখানি সুদক্ষ চিত্রকরের অঙ্কিত চিত্রের মত চিত্তাকর্ষক। এবং কন্যা করুণা তাহার জননীর বাল্য মূর্ত্তিখানি সম্পূর্ণভাবে বহন করিয়া কৈশোরের সীমান্ত অতিক্রম করিবার উপক্রম করিতেছিল। সে যে তাহার জনক-জননীর একমাত্র সন্তান হইয়া তাঁহাদের স্নেহ-ভালবাসার ষোল আনার অধিকারিণী হইয়াছে—এই অভ্রান্ত জ্ঞানটির দ্বারা তাহার মনের মধ্যে একটি সুমিষ্ট অভিমান সঞ্চারিত হইয়াছিল।

সেদিন ছুটীর দিন ছিল। শীতের মধ্যাহ্নে আহারের পর শয্যার উপর অর্দ্ধশায়িত হইয়া সুধাময় ইংরাজী সংবাদপত্র পাঠ করিতেছিল। এবং অদূরে একটা বেতের চেয়ারের উপর বসিয়া অরুণা নিবিষ্টমনে একটা লেসের উপর রেসমের ফুল তুলিতেছিল। করুণা বাড়ী ছিল

না; স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রীর গুরুতর অসুখ শুনিয়া দেখিতে গিয়াছিল।

সংবাদপত্রের একটা বিশেষ অংশ সুধাময়ের দৃষ্টি ও মনোযোগ আকর্ষণ করিল। বড় বড় অক্ষরে হেড্-লাইন:—"আমেরিকা প্রত্যাগত জ্যোতিষী স্বামী বিমলানন্দ এম-এর অদ্ভুত কাহিনী"। তাহার নিম্নে মুদ্রিত বিবরণ পাঠ করিয়া সুধাময় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। উঃ কি আশ্চর্য্য ক্ষমতা! হিন্দুগণ যে জ্যোতিষশাস্ত্রকে অঙ্কশাস্ত্রের স্তরে লইয়া গিয়াছিল, এতদিনে এই মহাপুরুষ তাহা সপ্রমাণ করিলেন। যে সংশয়ী জাতি হিন্দুর জ্যোতিষশাস্ত্রকে এতদিন 'বুজরুগী' বলিয়া পরিহাস করিয়া আসিয়াছে, তাহারাই এখন তাহার প্রকৃত পরিচয় পাইয়া বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে। বলিতেছে, এই মহাজ্ঞানীর নিকট অদৃষ্ট সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত হইয়া ভূত এবং ভবিষ্যতে ঠিক বর্ত্তমানের মতই প্রত্যক্ষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে! সুধাময় শয্যার উপর উঠিয়া বসিল।

স্বামীর ঔৎসুক্য লক্ষ্য করিয়া অরুণা কহিল, "অত মন দিয়ে কি পড়্‌ছ?"

সুধাময় কহিল, "কলিকাতায় বিমলানন্দ স্বামী নামে একজন জ্যোতিষী এসেছেন। তাঁর অদ্ভুত ক্ষমতা! তিনি যা গণনা করেন তার একটিও ভুল হয় না। ইনি আমেরিকায় গিয়েছিলেন—সেখানকার একজন পাদরি সাহেব বলেছেন যে, একজন পণ্ডিতের অঙ্ক কষায় ভুল হতে পারে কিন্তু এঁর জ্যোতিষ গণনায় ভুল হবার যো' নেই। তা ছাড়া আরও অনেক সাহেব এঁর গণনা দেখে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছেন।"

অরুণা দন্তের সাহায্যে সুতা কাটিয়া বলিল, "কি দেখে গণনা করেন?"

"কোষ্ঠি দেখে, হাতের রেখা দেখে, কপালের রেখা দেখে, যেমন করে বল্‌বে তেমনি করে গণনা কর্‌বেন, অথচ গণনার ফল ঠিক এক হবে। আমেরিকায় একজন লোকের কপালের রেখা দেখে ইনি

গণনা করেন—তারপর দশ দিন পরে সেই লোকের মুখ ঢেকে হাতের রেখা দেখান হয়। তিনি হাতের রেখা দেখে যা গণনা করেছিলেন, তা আগেকার গণনার সঙ্গে একেবারে ঠিক মিলে গিয়েছিল!"

অরুণা আর কিছু না বলিয়া নিজের কার্য্যে মন নিবিষ্ট করিল।

সুধাময় কহিল, "গোটা কুড়িক টাকা দাও, আর বেরবার কাপড় দাও—এ সুযোগ ছাড়া হবে না।"

অরুণা কহিল, "স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করতে যেতে হবে না কি?"

"হ্যাঁ। আর চার দিন পরে তিনি জাপান রওয়ানা হবেন। হগ্ সাহেবের বাজারের দক্ষিণে তিনি আছেন। এগারটা থেকে আটটা পর্য্যন্ত লোকজনের সঙ্গে দেখা করেন।"

"তা' টাকা কি হবে?"

"আধ ঘণ্টা গণনা করবার জন্য তাঁর ফি দশ টাকা।"

অরুণা মৃদু হাস্য করিয়া কহিল, "যখনই শুনেছি আমেরিকা ফেরৎ, তখনই বুঝেছি যে পাকা ব্যবসাদার লোক। যে স্বামী ব'লে নিজেকে পরিচয় দেয়—তার এত টাকার প্রয়োজন কি? আধ ঘণ্টায় দশ টাকা?"

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া সুধাময় কহিল, "বল কি! যিনি এত বড় একজন মহাত্মা ব্যক্তি, তাঁর কি কোন মহৎ উদ্দেশ্য নেই তুমি মনে কর? এ টাকা ইনি নিজের জন্য নিচ্ছেন না—এই টাকা নিয়ে ইনি কাশীতে হিন্দু কলেজ অফ্ অ্যাষ্ট্রলজি খুলবেন এবং এত বড় একটা মৃতপ্রায় শাস্ত্রকে জীবন দান করবেন।"

সুধাময়ের কথা শুনিয়া অরুণা শুধু একটু মৃদু হাস্য করিল—কিছু বলিল না। জ্যোতিষ সম্বন্ধে তাহার স্বামীর অন্ধ বিশ্বাস এবং অনুরাগের কথা সে সম্পূর্ণ অবগত ছিল; প্রতিনিয়ত পুঁথি বগলে পথে পথে ঘুরিয়া ভাগ্য-নির্ণয় করিবার নামে যাহারা লোক ঠকাইয়া বেড়ায়, তাহাদের মধ্যে ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি আছে বলিয়া যাহার দৃঢ় বিশ্বাস, আমেরিকা প্রত্যাগত ইংরাজি সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত স্বামীজী

সম্বন্ধে তাহার ধারণা টলাইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না, তাহা অরুণা বিশেষরূপে জানিত।

সুধাময়কে টাকা দিবার সময় অরুণা জিজ্ঞাসা করিল, "আমার সম্বন্ধে কি জিজ্ঞাসা করবে শুনি?"

সুধাময় স্নেহভরে পত্নীর নাসিকায় অঙ্গুলির মৃদু আঘাত দিয়া কহিল, "জিজ্ঞাসা করব কতদিনে তোমার একটি খোকা হবে।"

অরুণা কহিল, "সে খবরের জন্য আমি একটুও ব্যস্ত নই, ভগবানের কৃপায় আমার করুণ বেঁচে থাক—তা হ'লেই হ'ল!"

"তবে কি জিজ্ঞাসা করব?"

স্বামীর মুখের উপর প্রশান্ত দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া সহাস্যমুখে অরুণা কহিল, "জিজ্ঞাসা ক'রো, কবে তোমার পায়ে মাথা রেখে আমি মরতে পাব।"

সুধাময় কহিল, "তার চেয়ে জিজ্ঞাসা করব কতদিনে তোমার বৈধব্য-যোগ———"

ত্বরিতবেগে অরুণা সুধাময়ের মুখ চাপিয়া ধরিল, কহিল, "ফের যদি ও-সব কথা বলবে ত ভাল হবে না বলছি!"

হাসিতে হাসিতে সুধাময় প্রস্থান করিল।

২

প্রকাণ্ড অট্টালিকার নিম্নতলের দুইটি কক্ষ ভাড়া লইয়া বিমলানন্দ স্বামী দোকান সাজাইয়াছেন। সুধাময়কে অন্বেষণ করিতে হইল না। সুবিস্তৃত সাইনবোর্ডের উপর অতি বৃহৎ অক্ষরে ইংরাজিতে লেখা— "জ্যোতিষী শ্রীযুক্ত বিমলানন্দ স্বামী এম এ"। এত বৃহৎ এবং উজ্জ্বল যে, কোন পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে বিফল হয় না। নামের উভয় পার্শ্বে রাশি-চক্র এবং গ্রহ উপগ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতি বিচিত্র বর্ণে অঙ্কিত এবং দ্বারের উভয় পার্শ্বে দুইটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র সাইনবোর্ডে স্বামীজীর জ্ঞান ও গরিমার কাহিনী সংক্ষেপে বিবৃত। দ্বারের নিকট

তক্‌মা পরা ভৃত্য বসিয়া হ্যাণ্ডবিল বিতরণ করিতেছে; ব্যবস্থা এমন সুন্দর যে, কেহ যে হ্যাণ্ডবিল না লইয়া তাহাকে অতিক্রম করিয়া যাইবে তাহার উপায় নাই। এমন কি সুধাময়কেও একটি হ্যাণ্ডবিল হাতে লইয়া ঘরে প্রবেশ করিতে হইল।

প্রথম কামরাটি স্বামীজির অফিস্। সেখানে নানাজাতির এবং নানাশ্রেণীর অভ্যাগতের দল বসিয়া আছে, পার্শ্বের ঘরে স্বামীজি বসিয়া গণনা করিতেছেন—যেমন যাহার ডাক পড়িতেছে সে যাইতেছে।

সুধাময় প্রবেশ করিতেই একটি কর্ম্মচারী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি গণনা করাবেন কি?"

"আজ্ঞে—হ্যাঁ।"

"কতক্ষণ সময় নেবেন?"

"আধ ঘণ্টা।"

হস্ত প্রসারিত করিয়া কর্ম্মচারী কহিল, "দশ টাকা দিন্।"

সুধাময় ব্যাগ হইতে একটি দশ টাকার নোট বাহির করিয়া প্রদান করিল।

কর্ম্মচারী জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার নাম?"

সুধাময় একটু ইতস্ততঃ করিয়া কি ভাবিয়া প্রকৃত নাম গোপন করিল। কহিল, "বিনোদবিহারী গুপ্ত।"

কর্ম্মচারী তখনই বিনোদবিহারী গুপ্তর নামে দশ টাকার একখানি রসিদ লিখিয়া সুধাময়কে দিল। সুধাময় পড়িয়া দেখিল, তাহার মধ্যে তাহার সময় নির্দ্ধারিত রহিয়াছে ৫॥টা হইতে ৬টা। তখন বেলা ২॥টা মাত্র।

সুধাময় কহিল, "আর একটু আগে আমার সময় দিতে পারেন না কি?"

কর্ম্মচারী হাসিয়া কহিল, "আগেকার সমস্ত সময় বুক্‌ড্ (booked) হয়ে রয়েছে। কে আপনাকে অসুবিধায় ফেলে আপনাকে সময়

দেবে বলুন ? আপনি ইচ্ছে করলে বাড়ী ঘুরে আসতে পারেন কিম্বা অন্য কোথাও যদি কাজ থাকে—"

সুধাময় কহিল, "না তা হলে অপেক্ষাই করি।"

"যেমন আপনার সুবিধা" বলিয়া কর্ম্মচারী অন্যত্র চলিয়া গেল। সুধাময় বসিয়া হ্যাণ্ডবিলখানি পড়িতে লাগিল। হ্যাণ্ডবিলটি স্বামীজির ক্ষমতা এবং কীর্ত্তি কাহিনীর সম্পূর্ণ বিবরণী। খবরের কাগজে ইহার দশভাগের একভাগও প্রকাশিত হয় নাই! হ্যাণ্ডবিলখানি পাঠ করিতে করিতে বিস্ময়ে ও সম্ভ্রমে সুধাময়ের মন ভরিয়া উঠিল। আর কিছুক্ষণ পরেই এই যাদুকরের মন্ত্র প্রভাবে তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের যবনিকাখানি উন্মোচিত হইয়া যাইবে এবং এতদিন ধরিয়া যাহাকে সে অদৃষ্ট মনে করিয়া নিগূঢ় রহস্যের মধ্যে নিহিত মনে করিত, তাহা তাহার চক্ষের সম্মুখে প্রত্যক্ষরূপে প্রকাশিত হইয়া উঠিবে!

স্বামীজির ঘরের মধ্যে বেল বাজিয়া উঠিল এবং তাহার পরেই একটি ইংরাজ-মহিলা ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

বাহিরে একটি ইংরাজ অপেক্ষা করিতেছিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন দেখলেন ?"

ইংরাজ-রমণী চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া, "The most wonderful man! He works miracles!"

শুনিয়া সুধাময় মুগ্ধ হইয়া পড়িল। তাহার পর দীর্ঘ অপেক্ষার পর যখন তাহার ডাক পড়িল, তখন মন্ত্রাভিভূতের মত সুধাময় স্বামীজির কক্ষে প্রবেশ করিল।

৩

একটি শ্বেত পাথরের টেবিলের সম্মুখে, চেয়ারের উপর বিমলানন্দ স্বামী বসিয়া আছেন। দীর্ঘ বলিষ্ঠ গৌরবর্ণ দেহ, চক্ষু দুটি দীপ্ত প্রভায় জ্বলিতেছে এবং সমস্ত মুখের মধ্যে ভীষণ প্রতিভার চিহ্ন পরিস্ফুট। সুধাময়ের মনে হইল, গভীর অন্তর্ভেদী দৃষ্টির দ্বারা স্বামীজি যেন তাহার

জীবনের সমস্ত অতীত এবং ভবিষ্যৎ ঘটনা দেখিয়া লইতেছেন—যেন সে অতলস্পর্শী দৃষ্টি হইতে কোন কিছু গোপন রাখিবার উপায় নাই। বিস্ময়ে ও সম্ভ্রমে সুধাময় স্বামীজিকে অভিবাদন করিতে ভুলিয়া গেল।

সুধাময়ের আপাদ-মস্তক গভীরভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বিমলানন্দ কহিলেন, "নাম ভাঁড়াইয়াছ কেন? তোমার যা' লক্ষণ এবং ইঙ্গিত, তাতে তোমার নাম বিনোদবিহারী গুপ্ত হতেই পারে না। তুমি আমাকে পরীক্ষা করিতে এসেছ দেখছি। কিন্তু বাপু তোমরা আধুনিক শিক্ষালাভ করে, astrologyকে যে লোক ঠকাবার একটা উপায় বলে মনে কর সেটা একটা মস্ত ভুল। আর সমস্ত উপায়েই লোক ঠকান যায়, শুধু জ্যোতিষ গণনার দ্বারা যায় না। কারণ যে তোমার অতীত জীবনের ঘটনা বলার স্পর্দ্ধা করছে, সে তোমাকে ঠকাচ্ছে কি ঠকাচ্ছে না, সে বিষয়ে তোমার কোন সংশয় থাকবার কারণ থাকে না।"

সুধাময় অপ্রতিভ হইয়া কহিল, "আমার অপরাধ হয়েছে। আমাকে ক্ষমা করুন। আমার নাম সুধাময় বসু।" বিস্ময়ে ও ভক্তিতে সুধাময় বিহ্বল হইয়া গিয়াছিল!

বিমলানন্দ মৃদু হাস্য করিয়া কহিলেন, "তুমি অপরাধ করনি। যারা জ্যোতিষ গণনায় ভুল করে তারাই অপরাধী। তাদের দোষেই জ্যোতিষ শাস্ত্রে লোকের আস্থা নেই। বোস।"

স্বামীজির সম্মুখে চেয়ারের উপর সুধাময় বসিল।

"কোষ্ঠি দেখাবে, না হাতের রেখা দেখব?"

সুধাময় কহিল, "আপনার যা ইচ্ছা কোষ্ঠিও এনেছি।"

স্বামীজি কহিলেন, "হাতই দেখি—কোষ্ঠির গণনার ভুল হতে পারে, হাতের রেখা মিথ্যা কথা বলে না।"

সুধাময় হাত বাড়াইয়া দিল। স্বামীজি হাতের রেখা দেখিয়া কাগজে গণনা করিতে লাগিলেন। প্রথমে জন্মরাশি নক্ষত্র, তাহার পর জন্মবৎসর, জন্মদিন সমস্ত গণনা করিলেন। তাহার পর জীবনের অতীত ঘটনা দুই একটি বলিতে লাগিলেন।

মুগ্ধ সুধাময় কহিল,"আপনি মহাত্মা ; আপনার গণনার কোন ভুল হয় নাই।"

স্বামীজি কহিলেন, "তুমি বিবাহিত, তোমার স্ত্রী জীবিত, কিন্তু তুমি নিঃসন্তান। তোমার সন্তান হয় নাই, কখন হইবেও না।"

সুধাময় একটু বিস্মিত হইয়া কহিল, "একটু ভুল হচ্ছে।"

স্বামীজি পুনরায় গণনা করিয়া কহিলেন, "না ভুল হয়নি। তোমার স্ত্রী জীবিত। কিন্তু তুমি নিঃসন্তান।"

সুধাময় একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, "আজ্ঞে আমার একটি মেয়ে আছে।"

"জীবিত ?"

"জীবিত।"

"প্রতারণা করো না।"

সুধাময় কহিল "আপনি সর্ব্বজ্ঞ। আপনার নিকট প্রতারণা করা বৃথা !"

বিমলানন্দ ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, "কই দেখি তোমার কোষ্ঠি।"

সুধাময় পকেট হইতে কোষ্ঠি বাহির করিয়া দিল। বিমলানন্দ কোষ্ঠি লইয়া গণনা আরম্ভ করিলেন। বিস্তৃত সূক্ষ্মভাবে গণনা করিতে লাগিলেন। দীর্ঘ সময়ের পর কোষ্ঠির গণনা শেষ হইলে, সুধাময়ের ললাটের রেখা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। তাহার পর একখণ্ড কাগজে কি লিখিয়া একটা খামে মুড়িয়া সুধাময়ের হস্তে দিয়া কহিলেন, "বাইরে গিয়ে পড়ো।" তাহার পর বেল বাজাইয়া দিলেন।

সুধাময় কহিল, "আমার একটা প্রশ্ন আছে।"

স্বামীজি মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "তা হলে কাল এস। আধঘণ্টার স্থলে তোমার প্রায় ৪০ মিনিট হয়ে গিয়েছে। আমার আপত্তি না থাকৃতে পারে, কিন্তু যাকে বসিয়ে রেখেছি তার আপত্তি থাকৃতে পারে।"

সুধাময় কহিল, "দু মিনিটের বেশী লাগবে না—"

কিন্তু ততক্ষণে কক্ষে আর এক ব্যক্তি আসিয়া প্রবেশ করিয়াছিল। স্বামীজি সুধাময়ের কথার উত্তর না দিয়া তাহার সহিত কথা আরম্ভ করিলেন।

তখন অগত্যা স্বামীজিকে অভিবাদন করিয়া সুধাময় বাহিরে ফুটপাতে আসিয়া দাঁড়াইল। খামখানা ছিঁড়িয়া কাগজ বাহির করিয়া গ্যাসের আলোকে পাঠ করিল। তাহাতে লেখা ছিল, "আমার গণনায় কোন ভুল নাই—তোমার ধারণায় ভুল।"

সেই খামের মধ্য হইতে কালসর্প বাহির হইয়া দংশন করিলেও বোধ হয় সুধাময় সেরূপ বিহ্বল হইত না। এই কয়েকটি অক্ষরের মধ্যে গুপ্তভাবে যে তীব্র বিষ সঞ্চিত ছিল, তাহার তাড়নায় সুধাময়ের সমস্ত দেহ ঝিম ঝিম করিয়া আসিল! গ্যাসের উজ্জ্বল আলোক তাহার চক্ষে নিমেষের মধ্যে স্তিমিত হইয়া গেল এবং তাহার ভাবহীন অনুদ্দিষ্ট দৃষ্টির সমক্ষে রাজপথ এবং নিউমার্কেটের দৃশ্যাবলী স্বপ্নরাজ্যের অর্থবিহীন নিঃশব্দতায় কেবল মাত্র নড়িতে লাগিল! তাহার সেই ভাব দেখিয়া সম্মুখস্থ ঠিকাগাড়ী হইতে দুইজন সহিস আসিয়া যখন "বাবু গাড়ী চাই, গাড়ী চাই" করিয়া চীৎকার আরম্ভ করিল, তখন সুধাময়ের চেতনা অল্প ফিরিয়া আসিল এবং কিছু মনে মনে স্থির না করিয়াই সহসা পশ্চিমদিক লক্ষ্য করিয়া সে চলিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু পায়ে যেন কেহ দশ মণ পাথর বাঁধিয়া দিয়াছে, কোনমতেই পা চলিতে চাহে না!

চৌরঙ্গীরোড পার হইয়া, ট্র্যামের রাস্তা পার হইয়া, পুস্করিণীর পাশ দিয়া, মাঠ ভাঙ্গিয়া সুধাময় পশ্চিমদিকে চলিতে লাগিল। পথ আর শেষ হয় না। শীতকালের অন্ধকার রাত্রি—মাঠে লোকজনের ভিড় নাই, সেই নির্জ্জন মাঠ ভাঙ্গিয়া সুধাময় কোথায় চলিয়াছিল, তাহা সে নিজেই জানে না। তাহার মনের মধ্যে যে উদ্দাম ঝটিকা গর্জ্জন করিতেছিল, তাহার ভীষণতার মধ্যে তাহার সমস্ত অনুভূতি ডুবিয়া

গিয়াছিল। অবশেষে দীর্ঘ সময় এবং দীর্ঘ পথ অতিবাহিত করিয়া, মাতালের মত টলিতে টলিতে সে যখন গঙ্গার ধারে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন রাত্রি ৮টা বাজিয়া গিয়াছে। সম্মুখে একটা জেটিতে একটি মাত্রও লোক ছিল না। সুধাময় তাহার উপর গিয়া বসিল। পায়ের নীচে গঙ্গা বহিয়া যাইতেছিল, মাথার উপর আকাশে অসংখ্য তারকারাজি হাসিতেছিল এবং শীতের তীব্র উত্তরে বাতাস সজোরে বহিতেছিল। সেইরূপ অবস্থায় বসিয়া প্রায় দুই ঘণ্টা সুধাময় কত কি ভাবিল, কিন্তু মনের অশান্তভাবের উপশম হইল না। বিমলানন্দ স্বামীর অভ্রান্ত জ্ঞান আজ তাহার সুখের মূলে যে নির্ম্মমভাবে দংশন করিয়াছে, তাহা হইতে আর কোন ক্রমে নিস্তার নাই! আমেরিকাবাসী পাদরীর কথা সুধাময়ের মনে পড়িল। "অঙ্ক কষার ভুল হইতে পারে, কিন্তু বিমলানন্দের গণনায় ভুল হইতে পারে না!"

অধীর হৃদয়ে সুধাময় সেখান হইতে উঠিয়া ষ্ট্রাণ্ডরোডে আসিয়া দাঁড়াইল। একটা খালি গাড়ী যাইতেছিল দেখিয়া তাহাতে চড়িয়া বসিল।

সুধাময় গৃহে পৌঁছিলে অরুণা কহিল, "কি কাণ্ড বল দেখি? সেই দুপুরবেলা বেরিয়েছ, আর এই দুপুর রাতে ফিরলে! আমাদের মনে কি ভাবনা হয় না?"

সুধাময় অস্পষ্ট স্বরে বিড় বিড় করিয়া কি বলিয়া সরিয়া গেল। অরুণা পিছনে পিছনে গিয়া কহিল, "কি হয়েছে তোমার, মুখ অত ভার কেন? অসুখ করেনি ত?"

কথার উত্তর না দিয়া সুধাময় একটা ইজিচেয়ারে শয়ন করিল।

অরুণা কহিল, "গণৎকার গুণে বুঝি কোন মন্দ খবর দিয়েছে? তাই যদি দিয়ে থাকে তাতে মন খারাপ করে কি হবে? ওদের সব কথাই মিথ্যা হয়।"

সুধাময় উচ্চকণ্ঠে কহিল, "যাও যাও! আমার সম্মুখ থেকে সরে যাও! বিরক্ত কোরো না!"

অরুণা এক মুহূর্ত্ত নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর ধীরে ধীরে সরিয়া গেল।

পরদিন প্রাতে করুণা তাহার জননীর মুর্ত্তি লক্ষ্য করিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল। মুখ রক্তবর্ণ, চক্ষুদুটা ফুলিয়াছে এবং সমস্ত শরীরে যন্ত্রণা এবং অশান্তির চিহ্ন ফুটিয়া উঠিয়াছে।

"কি হয়েছে মা তোমার?"

"কিছু হয় নি মা।"

"তবে জিনিস পত্তর গুছচ্চ কেন?"

অরুণার দুই চক্ষু হইতে রুদ্ধঅশ্রু ঝরঝর করিয়া ঝরিতে লাগিল। কাল রাত্রে যে ভীষণ অশ্রাব্য কথা শুনিয়া সে ভগবানের নিকট চির-বধিরতা প্রার্থনা করিয়াছিল, সেই শ্রবণ-পথে এই সুমধুর সহানুভূতির স্বর প্রবেশ করিয়া অরুণাকে বিহ্বল করিয়া দিল।

জননীর বেদনায় করুণার চক্ষে জল ভরিয়া আসিল। কহিল, "মা তুমি কাঁদছ কেন? শীঘ্র বল কি হয়েছে।"

অরুণা অশ্রু মুছিয়া কহিল, "করুণ, আমি কিছুদিনের মত এ বাড়ী ছেড়ে যাব। তুমি লক্ষ্মীমেয়ের মত তোমার বাবার খাওয়া পরা দেখো, সেবা যত্ন ক'রো। আমি জিনিষ পত্তর গুছিয়ে তোমাকে সব বুঝিয়ে দেব, আর তোমাকে চাবি দিয়ে যাব। তুমি এবার থেকে সব দেখবে শুনবে। বুঝলে ত?"

করুণা সজোরে মাথা নাড়িয়া কহিল, "আমি সে সব কথা শুনতে চাইনে, তুমি কেন যাচ্ছ বল।"

অরুণা কহিল, "ছেলেমানুষের সব কথা শুনতে নেই। এইটুকু জেনে রাখ, এখানে কোন কারণে আমার থাকা চলবে না। তোর মা যদি আর না ফেরে, হ্যা করুণ, তুইও কি তোর মাকে ভুলে যাবি?' অরুণা উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিতে লাগিল।

করুণা কাঁদ কাঁদ স্বরে কহিল, "যাও, তুমি যদি ওসব কথা বলবে

ত আমি বাবার কাছে গিয়ে জেনে আসব কি হয়েছে”—বলিয়া করুণা তাহার পিতার উদ্দেশে চলিল।"

অরুণা ব্যস্ত হইয়া ডাকিল, “করুণ, ও করুণ! শুনে যাও।” কিন্তু করুণা ফিরিল না—চলিয়া গেল।

পাঁচ মিনিট পরে করুণা ফিরিয়া আসিল। চক্ষে তাহার অশ্রুজল, অভিমানে তাহার কণ্ঠ নিরুদ্ধ।

অরুণা তাহাকে সাদরে বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, “করুণ, কি হয়েছে মা?”

করুণা জননীর বক্ষে মুখ লুকাইয়া ফুলিতে লাগিল। অরুণা তাহার মাথায় সস্নেহে হাত বুলাইয়া বুলাইয়া তাহাকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিল। তাহার পর কিছু পরে তাহার মুখ তুলিয়া ধরিয়া দেখিল, উচ্ছ্বসিত অশ্রুর প্রবাহে করুণার মুখখানি ভাসিয়া গিয়াছে।

“কি হয়েছে করুণ?”

করুণা কহিল, “মা আমিও তোমার সঙ্গে যাব।”

“কেন মা?”

“বাবা আমার মুখ দেখবে না বলেছে।”

এত দুঃখেও, ঘৃণায় ও ক্রোধে অরুণার চক্ষু অগ্নিকণিকার মত জ্বলিয়া উঠিল। কহিল, “যত দিন আমি না ফিরব, ছেড়ে থাক্‌তে পারবে?”

“পারব।”

“আচ্ছা, তবে তুমিও চল। তবে মনে রেখো করুণ, দুদিন পরে এখানে ফেরবার জন্যে অধীর হলে চলবে না।”

করুণা তাহাতে স্বীকৃত হইয়া কহিল, “মা তবে আমার জিনিস পত্তর গুছিয়ে নিই?”

অরুণা কহিল, "না না, সে হবে না। এখান থেকে কোন জিনিস নিয়ে যেতে পারবে না। পড়েছ ত, পরের দ্রব্য না বলে নিলে চুরী করা হয়।”

বেলা যখন নয়টা, তখন অরুণা কন্যাকে লইয়া সুধাময়ের নিকট উপস্থিত হইল। সুধাময় ইজি চেয়ারে শয়ন করিয়া, মাথামুণ্ডু কত কি ভাবিতেছিল। সারা রাত্রির অনিদ্রা ও উত্তেজনায় তাহার মূর্ত্তি উদ্‌ভ্রান্ত হইয়াছিল।

অরুণা ধীর অবিচলিত কণ্ঠে কহিল, "আমাদের গাড়ী এসেছে।" তাহার পর চাবির গুচ্ছ চেয়ারের হাতলের উপর রাখিয়া কহিল, "এই চাবির রিং রইল—এতে সব চাবি আছে। গহনার বাক্স লোহার সিন্দুকে রইল।" আর আমার কাছে সংসার খরচের যে নগদ টাকা ছিল, সে টাকা ও হিসাব দেরাজের মধ্যে রেখেছি।"

তাহার পর একটু থামিয়া কহিল, "করুণের আর আমার সেভিংস্ ব্যাঙ্কের পাশ-বুক্ লোহার সিন্দুকে রইল।"

তাহার পর স্বামীর প্রতি একবার গভীর মর্ম্মস্পর্শী দৃষ্টিপাত করিয়া গলবস্ত্র হইয়া প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

করুণা ঘাড় বাঁকাইয়া মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে প্রণাম করিল না। অভিমানে তাহার মন আচ্ছন্ন হইয়াছিল।

অরুণা কহিল, "এস করুণ, আর দেরী করা নয়।" শেষের কথা গুলি বলিতে অরুণার কণ্ঠ কাঁপিয়া গেল। প্রাণপণে যে শক্তির বলে সে এতক্ষণ নিজেকে সম্বরণ করিয়া রাখিয়াছিল, সহসা তাহা ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম করিল।

মাতা ও কন্যা উভয়ে নিঃশব্দে ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সুধাময় কাঠের মত ইজি চেয়ারে নীরব নিস্পন্দ হইয়া পড়িয়া রহিল। তাহার অন্তরের নিভৃত প্রদেশ হইতে দুইটি সামান্য কথা বারম্বার উঠিতেছিল 'শুনে যাও।' কিন্তু যেন যাদুমন্ত্রবলে তাহার জিহ্বা অসাড় হইয়া গিয়াছিল। কোনরূপেই মুখ দিয়া বাহির হইল না। শুধু মনে হইল, কে যেন তাহার হৃদয়ের মধ্যে গলিত লৌহ ঢালিয়া দিয়া চলিয়া গেল। অব্যক্ত অসহ্য যন্ত্রণায় হতচেতনের মত

সুধাময় পড়িয়া রহিল। তাহার পর কিছুক্ষণ পরে রাজপথে যখন গুম্‌গুম্‌ করিয়া গভীর মর্ম্মভেদী শব্দে একটা গাড়ী চলিয়া যাওয়ার শব্দ শুনা গেল, তখন সুধাময় দুই হস্তে সজোরে বুকের দুই দিক্‌ টিপিয়া ধরিল।

অরুণা প্রথমে বউবাজারে তাহার এক দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়ের বাড়ী গিয়া উঠিল। তাহার পর সেই দিনই তাহার পিতৃদত্ত একখানা অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া, তাহার এক আত্মীয়কে সঙ্গে লইয়া রাত্রের গাড়ীতে তাহার ভ্রাতার নিকট লাহোর যাত্রা করিল।

৫

বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন মনে করিল, সুধাময়ের মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটিয়াছে, নহিলে সহসা স্ত্রী কন্যা শ্যালকের নিকট পাঠাইয়া দিয়া দিবারাত্র জ্যোতিষ চর্চ্চা লইয়া সে উন্মত্ত হইবে কেন? শুধু আফিসের কাজটুকু ছাড়া আহার নিদ্রা প্রায় পরিত্যাগ করিয়া সে অহর্নিশি জ্যোতিষের পিছনে লাগিয়াছে। ক্লান্তি নাই, আলস্য নাই, বিরক্তি নাই, দিবারাত্র সুধাময় বহুবিধ পুস্তকের মধ্যে নিজেকে নিমজ্জিত করিয়া গণনা করিতেছে। বিলাত ও আমেরিকা হইতে এমন মেল আসিত না, যাহাতে তাহার পুস্তক না আসিত। এ সকল দেখিয়া লোকে মনে করিত সে নিশ্চয় পাগল হইবে। বিমলানন্দ স্বামী তাহার মনের মধ্যে যে কি আগুন জ্বালিয়া দিয়া গিয়াছিল, তাহার সন্ধান ত কেহ জানিত না।

একটা কথা মনে করিয়া সুধাময় কিছুই স্থির করিতে পারিত না। বিমলানন্দের গণনায় ভুল হইতে পারে এ কথা সেদিন তাহার মনে স্থান পায় নাই বটে, কিন্তু তথাপি অরুণার নিকট সুধাময় যে প্রস্তাব করিয়াছিল, তাহাতে অরুণা কোনমতেই স্বীকৃত হইল না কেন? সুধাময় যখন বিমলানন্দের গণনার সত্যাসত্য পরীক্ষা করিবার জন্য বিমলানন্দেরই দ্বারা অরুণার হস্তরেখা গণনা করাইবার প্রস্তাব করে,

তখন দৃপ্ততেজে জ্বলিয়া উঠিয়া অরুণা কহিয়াছিল, "আমাকে এত সামান্য মনে ক'রো না যে নিজেকে এরূপ ঘৃণিত ভাবে পরীক্ষায় ফেলে নিজের আত্মমর্য্যাদাকে অপমান করব! এর জন্য তুমি যদি আমাকে ত্যাগ কর, তাহাতেও আমি রাজি আছি!" অরুণা যে কেবল আত্মসম্ভ্রমেরই জ্ঞানে সে পরীক্ষায় সম্মত হয় নাই, সে কথা সুধাময় কল্পনা করিতে পারিত না।

এইরূপ ভাবে এক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে একবার সুধাময় তাহার শ্যালকের নামে কিছু টাকা পাঠাইয়াছিল। কুপনে সুধাময় লিখিয়াছিল 'কর্ত্তব্যের অনুরোধে মাসহারা।', কিন্তু সেই মণিঅর্ডার যখন পৃষ্ঠে তীব্র বিদ্রূপ ও তিরস্কার বহন করিয়া ফেরত আসিল তখন হইতে সুধাময় সম্পূর্ণভাবে নীরব হইয়া গিয়াছিল।

সেদিন আফিস হইতে আসিয়া সুধাময় দেখিল খামে মোড়া এক খানা চিঠি আসিয়াছে। ডাকমোহর লক্ষ্য করিয়া দেখিল লাহোরের ছাপ। একবার মনে হইল চিঠি খানা না খুলিয়া মনিঅর্ডার ফেরতের পাল্টা জবাব দিলে হয়! কিন্তু কি ভাবিয়া খাম খানা ছিঁড়িয়া চিঠি বাহির করিল। সুধাময় মনে যাহা অনুমান করিয়াছিল চিঠি খুলিয়া কিন্তু দেখিল তাহা নহে। সে চিঠি করুণার, অরুণার বা তাহার শ্যালকের নহে; একজন ইংরাজ ডাক্তারের। নিম্নে নাম সাক্ষর রহিয়াছে ই, এম, বেনেট্। পত্রের মর্ম্ম এইরূপ।

"আপনি বোধ হয় অবগত নহেন আপনার কন্যা মিস করুণা সাংঘাতিকভাবে ক্ষয়রোগে আক্রান্ত। জীবনের আশা তাহার নাই বলিলেই চলে। তবে কোন অবস্থাতেই রোগীকে পরিত্যাগ করা উচিৎ নহে বলিয়া আপনাকে এই পত্র লিখিতেছি; আপনি পত্র পাঠ আমার লিখিত মত ব্যবস্থা করিবেন বিলম্ব করিবেন না। আপনার কন্যার যে বিশেষ কারণে এবং বিশেষ প্রকারের ক্ষয়রোগ হইয়াছে বলিয়া আমি সন্দেহ করিতেছি তাহা কদাচিৎ কাহারও হইতে শুনা যায়। যদি আমার অনুমান সত্য হয় তাহা হইলে আমার অভিজ্ঞতায়

এই প্রথম। কোন ডাক্তারী বহিতে আমি ইহার উল্লেখ দেখিয়াছিলাম বলিয়া মনে পড়ে। আমার সন্দেহ হওয়ায় মিস করুণাকে রণ্ট্‌জেন-রের দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। তাহার শরীরের কোন একটা বিশেষ স্থলে একটা বিকৃতি আছে। সেই বিকৃতিই তাহার এই ক্ষয়রোগের মূল। এখন এই রোগের আর একটি বিশেষত্ব এই যে, এ রোগ যেমন কদাচিৎ হইতে দেখা যায়, তেমনি বংশানুগতভাবে ভিন্ন অন্যপ্রকারে প্রায় হয় না। অর্থাৎ যাহার এই রোগ হইবে বুঝিতে হইবে তাহার পিতার অথবা মাতার কাহারও এই রোগ নিশ্চয় ছিল। আপনার পত্নীকে রণ্টজেন-রে দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, তাঁহার কোন লক্ষণ নাই। আমার অনুমান সত্য হইলে আপনার শরীরে অল্পই হউক বা অধিকই হউক একটা নিদর্শন পাওয়া যাইবে। সেরূপ কিছু পাওয়া গেলে রোগ নির্ণয় সম্বন্ধে আমার আর কোন সন্দেহ থাকিবে না। বুঝিব আপনার নিকট হইতেই আপনার কন্যা এই বিকৃতি লইয়া জন্মিয়াছিল। তাহার পর মানসিক কষ্ট বা শারীরিক অসুস্থতা এমনই কোন কারণের জন্য সেই বিকৃতি সহসা বাড়িয়া উঠিয়া আপনার কন্যার স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়াছে, এবং তদনুযায়ী চিকিৎসা করিব। এই পত্রের সহিত ডাক্তারের অবগতির জন্য একটা নোট লিখিয়া পাঠাইলাম। আপনি অবিলম্বে মেডিকাল কলেজের কোন অভিজ্ঞ ডাক্তারের দ্বারা আপনার দেহ পরীক্ষা করাইয়া আমাকে ফলাফল জানাইবেন। বিলম্ব করিবেন না, মনে রাখিবেন আপনার কন্যার পক্ষে এখন একদিন এক বর্ষের অনুরূপ।"

পত্র পাঠ করিয়া সুধাময় কিছুক্ষণ দুই বাহুর মধ্যে মাথা গুঁজিয়া বসিয়া রহিল। এই মর্ম্মান্তিক ঘটনার মধ্য হইতে যে নিদারুণ সত্য নিজেকে প্রকাশ করিবার উপক্রম করিতেছিল তাহা যদি ঘটিয়া যায় তাহা হইলে? তাহা হইলে জ্যোতিষ শাস্ত্রের সমস্ত বহিতে আগুন লাগাইয়া নিজেকে পুড়াইয়া মরিলেও উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হইবে না! সুধাময় তখনি ডাক্তারের পত্র লইয়া বাহির হইয়া পড়িল। মেডিকাল

কলেজের একজন বিশিষ্ট অধ্যাপকের সহিত সাক্ষাত করিয়া পরদিন প্রাতে তাহার পরীক্ষার ব্যবস্থা করিয়া আসিল।

পরদিন প্রাতে ডাক্তার সুধাময়ের হস্তে পরীক্ষার রিপোর্ট দিয়া কহিলেন, "না, আমার কোন সন্দেহ নেই। আপনার নিকট হইতেই আপনার কন্যা এ রোগ সঞ্চয় করেছে।"

শুনিয়া সুধাময়ের হৃদয় নিস্পন্দ হইয়া আসিল। সে অধীরভাবে জিজ্ঞাসা করিল আমি যদি হঠাৎ কোন গুরুতর মনকষ্ট পাই আমার রোগও সাংঘাতিকভাবে বেড়ে যেতে পারে নাকি?"

ডাক্তার সুধাময়কে দুর্ব্বলচিত্ত মনে করিয়া একটু হাসিয়া কহিলেন, "না, আপনি সর্ব্বদা প্রফুল্লচিত্ত থাকিবেন।"

ডাক্তার রণ্টজেন-রের দ্বারা সুধাময়ের ব্যাধিরই সন্ধান পাইয়াছিলেন, সেই ব্যাধির আরও নিম্নস্তরে যে গভীর মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা নিহিত ছিল তাহার সন্ধান পান নাই!

এক বৎসর পূর্ব্বে নিউমার্কেটের সম্মুখে সন্ধ্যার সময় গ্যাসের আলোক সুধাময়ের চক্ষে ততটা নিষ্প্রভ মনে হয় নাই, যতটা আজ মেডিকাল কলেজ হইতে বাহির হইয়া দিবালোককে সে স্তিমিত দেখিল!

এই এক বৎসর কি অসহ্য যন্ত্রণার মধ্য দিয়া সে কাটাইয়াছে! নিরানন্দ স্নেহহীন, প্রেমহীন, জীবন মহাপাপের নির্ম্মম প্রায়শ্চিত্ত প্রতিনিয়ত ধীরে ধীরে করিয়া লইতেছিল; আজ সহসা নিদারুণ ভাবে সেই প্রায়শ্চিত্ত উদ্‌যাপনের অবস্থায় উপনীত হইয়াছে! যাহা অসত্য, যাহা অসম্ভব, যাহা অস্বাভাবিক তাহারই উপর নির্ভর করিয়া সুধাময় যাহাকে অস্বীকার করিয়াছিল, এইরূপ মর্ম্মান্তিক উপায়ে সে প্রমাণ করিতে বসিয়াছে যে সে সুধাময়ের পর নহে, সে তাহার নিতান্ত আপনার, সে তাহারই বক্ষের রক্তমাংসে গঠিত। শুধু তাহাই নহে একই ব্যাধির ছাপে সেই রক্তমাংস চিহ্নিত!

সেই দিনই আফিসে ছুটী লইয়া রাত্রের ট্রেনে সুধাময় লাহোর যাত্রা করিল।

কিন্তু তিন দিনের দীর্ঘ পথ কষ্টে এবং উদ্বেগে অতিক্রম করিয়া সুধাময় যখন করুণার রোগ-শয্যা পার্শ্বে উপনীত হইল তখন করুণার অভিমানক্লিষ্ট জীবনের দুঃখভোগের আর বেশী বাকী ছিল না।. সকল ব্যাধিকে যাহা নিরাময় করে, সকল যন্ত্রণার যাহাতে অবসান হয়, সেই মৃত্যুর মধুর আবেশে করুণা তখন জীবন পারের স্বপ্ন দেখিতেছিল!

সুধাময়কে দেখিয়া তাহার মুখে মৃদু হাসি এবং চক্ষে অশ্রু দেখা দিল। তাহাতে যে কতখানি অভিমান মিশাইয়া ছিল তাহা সুধাময় মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিল!

তাহার পর?—তাহার পর দুই ঘণ্টা পরে যখন করুণার ক্লান্ত নয়নদুটি সুগভীর নিদ্রাভরে ধীরে ধীরে মুদিত হইয়া গেল তখন অব্যক্ত অদ্ভুত বেদনায় সুধাময় ও অরুণা সেই নীরব নিস্পন্দ প্রাণহীন দেহকে জড়াইয়া ধরিয়া পরস্পর মিলিত হইল।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়,
ভাগলপুর।

অবসাদ

এই ত সেই তমাল তলে
মোহন মালা দিলে গলে,
আদর ক'রে কইলে কথা
ভিজিল মালা চোখের জলে।

সেই ত সেই মাধবী রাতে
জড়িয়ে নিলে বুকের পরে;
সকল সুখ সকল ব্যথা
গলিয়ে দিলে সোহাগ ভরে!

আজি বঁধু! কোথায় তুমি?
হা হা করে তমাল তাল!
কোথায় গেল মুখের হাসি,
কোথায় গেল চোখের জল।

সকলি শুষ্ক মরুভূমি,
হা হা করে হৃদয়-তল!
কেন নিলে প্রাণের হাসি?
কেন নিলে চোখের জল?

গান

এই যে ছিল কোথায় গেল!
কেন আমায় জাগালি!
এমন মধুর বঁধুর ঘুম!
কেন সে ঘুম ভাঙ্গালি!

অচেতনে ছিলেম ভাল
বুকে ক'রে বুকের আলো;
কেন তোরা এমন ক'রে
প্রাণের আলো নিবালি!

সেই যে তারে পেয়েছিলাম,
প্রাণের মাঝে ছুঁয়েছিলাম।
কেন চেতন বেদন দিয়ে
প্রাণের ব্যথা বাড়ালি!

সেই যে আমার বুকের মাঝে
বরণ-করা বনমালি!
স্বপন যদি দেখেছিলাম
কেন স্বপন ভাঙ্গালি!

মজার দেশ

একখানি ছেলেদের বইতে এক 'মজার দেশে'র কথা আছে। সেই দেশে "রাত্রিতে বেজায় রোদ্, দিনে চাঁদের আলো"! আর "আকাশ সেথা সবুজ বরণ, গাছের পাতা নীল"! একটি ছোট ছেলে কিছুতেই সেই মজার দেশটা কোথায় স্থির করিতে না পারিয়া আমাকে প্রশ্ন করিয়াছিল—"মজার দেশ কোথায়?" আমি তাহাকে উত্তর দিয়াছিলাম—"সেই অনেক দূরে!"

কিন্তু এখন নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করিতেছি—'মজার দেশ কোথায়?' নিজে তাহার উত্তর দিতেছি—'দেখিতে পারিলে অতি নিকটে,—আমাদের ভিতরে ও বাহিরে—আশে পাশে—চতুর্দ্দিকে!' এখন যেন আমার মনে হইতেছে বাস্তবিকই একটা মজার দেশ আছে। সে দেশটা আরোব্যোপন্যাসের দৈত্যনির্ম্মিত একটা মায়ারাজ্য নহে। আমরা এক মজার দেশেই বাস করিতেছি,—কিন্তু বুঝিতে পারিতেছি না যে ঠিক কোথায় আছি। আমরা যা'কে Uniformity of Nature এবং World of Sense and Experience বলি—তাহাতে বাস করা কখনই সম্ভবপব হইত না, যদি মধ্যে মধ্যে দু'একটা অসম্ভব ঘটনা না ঘটিত—মধ্যে মধ্যে আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞান ও বদ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে লুক্কায়িত ঐ মজার দেশের উজ্জ্বল ছবিখানি মুহূর্ত্তের জন্য ফুটিয়া উঠিয়া আবার মিলাইয়া না যাইত! বৈজ্ঞানিক তাহার ক্ষুদ্র laboratoryতে বসিয়া একটি material atom হইতে ফলেফুলে ভরা বিচিত্র জগৎটাকে গড়িয়া তুলিবে মনে করিয়াছিল,—সঙ্কীর্ণচেতা মনস্তত্ত্ববিৎ "স্বার্থপরতাই মানবজীবনের মূলমন্ত্র" ইত্যাদি ভয়ানক মিথ্যা বচন সত্য বলিয়া প্রচার করিতে চাহিয়াছিল,—কিন্তু সাধারণের চক্ষের সম্মুখে ঐ মজার দেশের ছবি ফুটিয়া উঠিল—জগৎ তাহাদের কথায় বিশ্বাস

স্থাপন করিল না। যাহারা তাহাদের কথায় মুগ্ধ হইল তাহারা সেই মজার দেশের ছবি দেখিতে পাইল না। তাহারা অন্ধ! মজার দেশ জীবনে কখনও দেখে নাই এমন হতভাগ্য ক'জন আছে?

আমরা জীবনে কখন্ যে সেই মজার দেশে থাকি—আবার কখন্ যে নিরানন্দ রাজ্যে বাস করি তাহা ঠিক করা কঠিন। শিশু যখন মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হয়, তখন সে যে কি মনে করিয়া কাঁদিয়া উঠে, তাহা আজ পর্য্যন্ত কেহ ঠিক করিয়া বলিতে পারিল না। এ জগৎ যদি সুখের হইত, তবে শিশু ইহার স্পর্শে কাঁদিয়া উঠিবে কেন? বোধ হয় সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থানে আসিয়া শিশু ভয়ে কাঁদিয়া উঠিল? কিন্তু তবে মার স্পর্শে—মার বুকের মাঝে লুকাইয়া সে শান্ত হইল কেন? এত শীঘ্র যদি সেই অজ্ঞান শিশু মাকে চিনিয়া লইতে পারিল—তাঁহার স্নেহকোমল মুখখানির দিকে তাকাইয়া এমন মধুর হাসিতে পারিল—তবে সে এই পৃথিবীকে চিনিতে এত বিলম্ব করিল কেন? মার সঙ্গে ইতিপূর্ব্বেই বুঝি তার আলাপ হইয়াছিল? বোধ হয় শিশু ঐ মজার দেশে বাস করিতেছিল,—মা তা'কে ডাকিয়া এই পৃথিবীতে লইয়া আসিল—বুকের অমৃত পান করাইয়া শিশুকে মানুষ করিয়া তুলিল,—পূর্ব্বস্মৃতি তাহার ভুলাইয়া তাহাকে পৃথিবীতে রাখিয়া মা একদিন হয় ত নিজে কোথায় চলিয়া গেল! শিশু তখন বড় হইয়াছে—নিজের পূর্ব্বস্মৃতি ভুলিয়াছে,—কিন্তু সে মাকে হারাইয়া কাঁদিল! ক্রমে সে বুঝিল যে এ সংসারের পাশাপাশি আর একটা সংসার আছে; এই দুই সংসারের মাঝে সেতু হচ্ছে 'মা'! মানুষ যখন এ সংসারে বড় আঘাত পায়, তখন সে ঐ অন্য সংসারটার কথা বুঝিতে পারে; মানুষ যখন আঘাত পায় তখনই সে কাতর-কণ্ঠে ডাকে 'মাগো!' মা! পৃথিবীতে বোধ হয় এ নামের মত মধুর নাম আর নাই—এ ডাকের মত সুধামাখা ডাক আর নাই। একা মাকে যে চিনিতে পারে সেই বুঝিতে পারে 'মজার দেশ' কোথায়; সেই বুঝিতে পারে, এই কঠিন জগৎটার অন্তরে মা'রূপ

কি এক অমৃতের উৎস আছে,—সেই জানে এ স্বার্থপর জগতেও ভালবাসা আছে, প্রেম আছে, আত্মবিসর্জ্জন আছে, শান্তি আছে! মজার দেশ না দেখিলে—এই বাহিরের জঙ্গল বা অট্টালিকাপূর্ণ জগ-তের উল্টো জগৎটাকে না বুঝিতে পারিলে—সে জগতের অস্তিত্বে বিশ্বাস না করিতে পারিলে,—মাকে বুঝিতে না পারিলে—শান্তি কোথায়? মার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ হইয়া যে সুখে রহিল—এ জগতে আসিয়া একবার ব্যথায় মাকে কাতরে ডাকিতে না পারিল—তাহার আবার মনুষ্যত্ব কোথায়—শান্তি কোথায়—তৃপ্তি কোথায়? যার দৃষ্টি বাহিরের এই World of Experienceকে ভেদ করিয়া মজার দেশে পৌঁছিতে পারিল না—যার চিন্তা এই Sense-impressionsএর হাত এড়াইয়া হৃদয়ের গভীর সাগরে ডুবিতে পারিল না,—তাহার জীবনের সার্থকতা কোথায়? যে অন্ধ সমস্ত জীবন এই বর্ণ-গন্ধ-গীতময় জগৎকে শুধু "a permanent possibility of sensations" বলিয়া জানিয়া পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করিল,—সে জীবনে সকল রসেই বঞ্চিত হইল। যে মূর্খ ঐ মজার দেশের অস্তিত্ব স্বীকার না করিয়া এ জড়জগৎটা লইয়াই তৃপ্ত রহিল,—সে রক্তমাংসের ক্ষুধা মিটাইতে পারিলেও কখনও আত্মার তৃষ্ণা নিবারণ করিতে পারে না।

আমাদের প্রাণের মাঝে একটা পাগল লুকাইয়া আছে। কাহারও অন্তরে এ পাগল একেবারে ঘুমাইয়া আছে—কাহাকেও মধ্যে মধ্যে বিরক্ত করিতেছে,—কিন্তু কাহারও অন্তরের এই পাগলটি সমস্ত লোকটাকে পাগল করিয়া তোলে। এই পাগল সর্ব্বদাই যেন জড়-জগতের ভোগবিলাসের দিকে রক্তচক্ষে তাকাইয়া থাকে। এই পাগলই হচ্ছে 'মজার দেশে'র লোক। যতক্ষণ আমরা এই পাগল সেজে থাকি ততক্ষণই মজার দেশে থাকি,—আবার যখন sober হই, তখনই এই জগতের হিসাবনিকাশ ও দেনাপাওনার খাতা লইয়া বসিয়া যাই। আমরা জানি এ পাগল আমাদের সর্ব্বনাশ করিবে—

আমাদের স্বার্থের হানি করিবে। আমরা বহুবার স্বার্থের জন্য ইহাকে গলা টিপিয়া মারিতে চেষ্টা করিয়াছি; কিন্তু পাগল মরে নাই। থাকিয়া থাকিয়া আমাদের প্রাণে সে এই জড়জগতের সঙ্গে তার বিবাদের কথাটা জানাইয়া দিতেছে। তাহার কথা সর্ব্বদা অবহেলা করিবার শক্তি আমাদের নাই। সাধারণ লোকে এই পাগলের সঙ্গে একটা বনিবনাও করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। তাহারা মনে করে যে সংসারের বাজারে তাহারাই জিতিয়া গেল! কাহারও মধ্যে যদি ঐ পাগলটাকে তাহারা জাগ্রত দেখিতে পায়, তবে তাহাকে "পাগল" বলিয়া থাকে। আমাদের স্বার্থান্ধ চক্ষে বুদ্ধ, যীশু, মহম্মদ, নিমাই—পাগল! কিন্তু তবু আমরা এসব পাগলের কথা না শুনিয়া পারি নাই। এসব পাগলই আমাদের জগতটাকে চালাইতেছে,—এসব পাগল না জন্মিলে বোধ হয় আমাদের পৃথিবীটা শূন্যপথে কবে পথ হারাইয়া ফেলিত—কিম্বা আপনার ক্ষোভে আপনি দগ্ধ হইতে হইতে অকস্মাৎ একদিন ভস্মে পরিণত হইত!

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এই পাগলই 'মজার দেশে'র অধিবাসী। আমরা এ রাজ্যে আলো করিবার জন্য কত Electric light, Gas light জ্বালি, কিন্তু সেই পাগলের দেশে কালরূপেই আলো করে! বহুদিন পূর্ব্বে ব্রজধামে এক পাগলের হাট বসিয়াছিল,—এক মহা-পাগলের বাঁশীর রব সকলের প্রাণকে আকুল করিয়া তুলিয়াছিল—ব্রজনারী সংসার ফেলিয়া সেই কাল পাগলটাকে দেখিয়া হৃদয়ের জ্বালা ভুলিতে ছুটিয়াছিল,—যমুনায় পাগ্‌লামির একটা বন্যা আসিয়া-ছিল,—কুঞ্জে কুঞ্জে ভ্রমর, কোকিল ও মলয় যে বার্ত্তা বহন করিয়া বেড়াইতেছিল, তাহাতে লোকের প্রাণে পাগ্‌লামিটাই জাগিয়া উঠিতে-ছিল! নবদ্বীপের উপর দিয়াও পাগ্‌লামির একটা বন্যা বহিয়া গিয়াছে,—সে বন্যায় জগাই মাধাই হরিনামের সমুদ্রের দিকে ভেলা ভাসাইয়া দিল! কয়েক বৎসর পূর্ব্বে দক্ষিণেশ্বরেও এম্‌নি একটা পাগ্‌লামির ঢেউ আসিয়া লাগিয়াছিল। তখন সেখানে যাহারা ছিল

তাহারাই পাগলের সঙ্গে মজার দেশের আনন্দ লাভ করিয়াছিল। সে ঢেউএর আন্দোলন আজ সমগ্র ভারতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। যুগে যুগে, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে পাগ্‌লামির ঢেউ এসে কখনও বা একটি লোকের প্রাণে—কখনও বা একটা জাতির প্রাণে আঘাত করে নাচিয়ে তোলে। ইতিহাসে—জাতির এবং ব্যক্তিবিশেষের—এমন পাগ্‌লামির বহু নিদর্শন আছে। এ আঘাত আমরা পাই বলেই আজ পর্য্যন্ত আমরা প্রাণটাকে সরস্ রাখ্‌তে পেরেছি। মজার দেশটা না দেখ্‌তে পেয়ে আমাদের প্রাণটা থেকে থেকে ব্যাকুল হয়ে উঠ্‌ছে বলেই আমাদের এখনও একটু বিশ্বাস আছে, নিষ্ঠা আছে, ভক্তি আছে। মধ্যে মধ্যে আমরা নিজেদের অপূর্ণতা—অভাব বুঝ্‌তে পারি বলেই আজ পর্য্যন্তও জগতে কর্ম্ম আছে—উদ্যম আছে—প্রাণ আছে। মধ্যে মধ্যে মজার দেশের ছবি—মানবজীবনের পূর্ণতার, সার্থকতার ছবি—আমাদের প্রাণে ভেসে উঠে বলেই আমরা এখনও মানুষ আছি। Wordsworth জগতের দিকে তাকিয়েই নিজের অন্তরে কি যেন "is now no more"—এই অভাবটুকু বুঝ্‌তে পেরেছিলেন। বুঝ্‌তে পেরেছিলেন বলেই immortalityর জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। সে অভাবটাকে সর্ব্বদাই জাগিয়ে রাখা দরকার —না হ'লে মজার দেশের কথা আমরা ভুলেই যাব। বল্‌তে হবে— "যেন ভুলে না যাই বেদনা পাই শয়নে স্বপনে!" সে মজার দেশে যাবার উপায় হচ্ছে 'মা'—জ্ঞানদায়িনী মা! সেখান থেকে এ জগতে ফিরে আস্‌বার উপায়ও হচ্ছে ঐ মা—মায়ারূপিণী মা!

মাগো! 'একবার আমায় বসিয়ে দেমা লক্ষ্মীছাড়ার সিংহাসনে'! আশীর্ব্বাদ কর আমার অন্তরের এই দীনতার মাঝে পাগ্‌লামির এক রত্ন-সিংহাসন আমি স্থাপন করব। সেই সিংহাসনে একবার এসে বস। কিন্তু তুমি না সাহায্য করলে যে আমি দীনতার কথা ভুলে গিয়ে মিথ্যা অহঙ্কারে ফুলে উঠি—পাগলকে যে ধরে রাখ্‌তে পারি না—তোমাকে চিন্‌তে পারি না। এ জগতে শুধু খেলনা দিয়েই

আমাকে ভুলিয়ে রেখ না ; একটু আমাকে বুঝ্‌তে দাও যে প্রকৃতির এ হাসি তোমারই স্নেহভরা প্রাণখানির ভাব ব্যক্ত করছে,—আকাশে বাতাসে, পত্রে, পুষ্পে যে সৌন্দর্য্য দেখে মুগ্ধ হচ্ছি, তাহা তোমারই রূপের আলো ! মা, একটি মুহূর্ত্তের জন্য ভাল করে বুঝিয়ে দাও যে 'জগত তোমাতে, তোমারি মায়াতে মোহিত জগতজন !' একবার আমাকে পাগল সাজিয়ে আমার হাত ধরে মজার দেশে নিয়ে চল মা ! এ রাজ্যে রক্তবর্ণ দেখিয়ে পরস্পর যুদ্ধ ঘোষণা করে—অসি দিয়ে ভাই ভাইয়ের মুণ্ডচ্ছেদ করে—রক্তবর্ণের মাল্য দিয়ে লোকে শত্রুতা বরণ করে। কিন্তু মা, তোমার ঐ মজার দেশে লাল হাতখানি তুলে আমার শঙ্কাকুল চিত্তটাকে শান্ত করে দিও—চাঞ্চল্য দূর ক'রো ; রক্তজবার মালাটি স্নেহভরে আমার কণ্ঠে পরিয়ে দিয়ে আমাকে কোলে নিয়ে চুমো খেও। তোমার ঐ বামহস্তের অসি দিয়ে আমার সকল সংশয়—ক্ষুদ্রতা-স্বার্থপরতার বন্ধন ছেদন করে দিও। যখন এ সংসারের জাগরণের রাজ্য পার হয়ে ঐ সুষুপ্তির রাজ্যেরও প্রান্তদেশে দাঁড়িয়ে তোমার ঐ মজার দেশের সোনার আশায় আলোর দিকে তাকাবো, তখন আশাময়ী মা আমার ! তোমার রক্তবস্ত্র পরে এসে আমাকে ভরসা দিও। এ রাজ্যে চক্ষু খুলে দেখ্‌তে হয়, কান দিয়ে শুন্‌তে হয়, চিন্তা করে অন্য বিষয় বুঝ্‌তে হয়,—কিন্তু ঐ মজার দেশে "নান্যৎ শৃণোতি, নান্যৎ পশ্যতি, নান্যৎ বিজানাতি" ! সেখানে চক্ষু কিছু দেখ্‌তে পাবে না, শ্রবণে কিছু শুন্‌তে পাব না, অন্য জ্ঞান থাক্‌বে না ! তোমার মজার দেশে যা' এক মুহূর্ত্তে জানা যায়, এ রাজ্যে তা' বুঝ্‌তে যুগ কেটে যায়। একটি তারার আলো সহস্র বৎসর পর এ রাজ্যে এসে পৌঁছায়। কিন্তু তোমার সেই দেশে ত কাল নাই—বৎসর নাই ; অতীত নাই, ভবিষ্যত নাই—আছে শুধু বর্ত্তমান ; দূর নাই,—আছে শুধু অতি-নিকট,—এত নিকট যে এ রাজ্যে থেকে তা' বুঝ্‌তে পারা যায় না। এ জগতে জ্ঞানলাভ করতে

হ'লে নিজেকে তফাৎ করতে হয়—অন্ততঃ দুই ছাড়া এ জগতে কিছু হয় না; কিন্তু মজার দেশে যে এক ছাড়া অন্য সংখ্যা নাই! সেখানে একটি কুঁড়ি ফোটা দেখ্‌বার জন্য অপেক্ষা করে বসে থাক্‌তে হয় না; শীতের প্রকোপে গৃহকোণে বসে বসন্তের চিন্তা কর্‌তে হয় না; গ্রীষ্মের জ্বালায় বর্ষার আগমন প্রতীক্ষায় দুয়ারে বসে থাক্‌তে হয় না। সেখানে বিরহে মিলনের আশা এসে কষ্ট দিতে পারে না—মিলনে বিরহের আশঙ্কার উদয় হয় না। সে রাজ্যে যেতে হ'লে আনন্দ-সমুদ্রের তরঙ্গের উপর দিয়ে যেতে হয়। আনন্দের সমুদ্রে সত্য, শিব ও সুন্দরের অনন্ত তরঙ্গের খেলা চলেছে! সমুদ্রের উপর হ'তে তীরভূমি দেখ্‌তে পাওয়া যায়—তখন মনে হয় ঐ কনকভূমিতে পা দিলেই অনন্ত শান্তি। কিন্তু কাছাকাছি হ'লে আর কিছুই দেখা যায় না—শোনা যায় না। আমাদের সমস্ত জীবনের মুখরতা কখন্ যে স্তব্ধ হয়ে যায়—জাগরণ কখন্ যে সুষুপ্তিতে—সুষুপ্তি হতে ভূমায়—ডুবে যায় আমরা জান্‌তেও পারি না। মজার দেশের দুয়ারে থাকে শুধু মা ও ছেলে—কিন্তু সে রাজ্যে প্রবেশ কর্‌লেই যে মা ছেলের প্রাণে মিশে যায়—ছেলে মার বুকে আশ্রয় পায়! মা! সেই ত আনন্দ! সেখানে আমি তোমার বুকে মিশে যাব, তুমি স্নেহ হয়ে গলে আমার সর্ব্বাঙ্গে মিলিয়ে যাবে! এ সংসারের অল্প নিয়ে আমাকে সুখী থাক্‌তে দিও না। আমার প্রাণে মজার দেশের কথা যেন জেগে থাকে,—বিরহ ও ব্যাকুলতা যেন জেগে থাকে। যখন তোমাকে ভুলে আমি আশার সরস মেঘে হৃদয়টাকে ভরে তুল্‌বো—সর্ব্বনাশী মা আমার! তুমি তখন সে আশায় তোমার বজ্রানল জ্বেলে দিও, আমার চক্ষু দিয়ে শ্রাবণের ধারার মত অশ্রু বর্ষণ করিয়ে আমাকে বুঝিয়ে দিও—কি আমার চাই,—সূর্য্যালোক কেমন! 'কি বসন্তে কি শরতে' আমার প্রাণে যেন তোমার মূর্ত্তিখানি অধিষ্ঠিত থাকে! মাঝে মাঝে আমাকে এ সংসার হতে অবসর দিও—আমি যেন

অন্তরের মাঝে তোমাকে একটু দেখ্‌তে পারি—আমার সকল ব্যথা ভুলতে পারি। যেন আমি বল্‌তে পারি—বাস্তবিকই—

"চোখ্‌ খুল্‌লে যায় না দেখা মুদ্‌লে পরিষ্কার!"

একবার আমি চক্ষু মুদে তোমার প্রকৃত রূপ দেখি—বাহিরের মত্ত কোলাহল থেকে দূরে গিয়ে একটু মধুর বাণী কানে শুনি—এ জড় জগতের আলিঙ্গন-পাশ কেটে একবার তোমার কোমল স্পর্শের মাঝে আমার জন্মজন্মান্তরের হৃদয়ের জ্বালা ভুলে পুলকে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠি—একবার নিজেকে ছোট করে বিরাটের সঙ্গে মিশে যাই—নিজেকে কঠিন করে কোমলের সঙ্গে মিশে যাই—একবার তোমার জন্য প্রাণভরে কেঁদে অনন্তকালের মত হাসি—একবার আমি মরে বেঁচে উঠি! একবার আমি ডাকি—মাগো—মা!

শ্রীচারুচন্দ্র ঘোষ।

(ঢাকা)
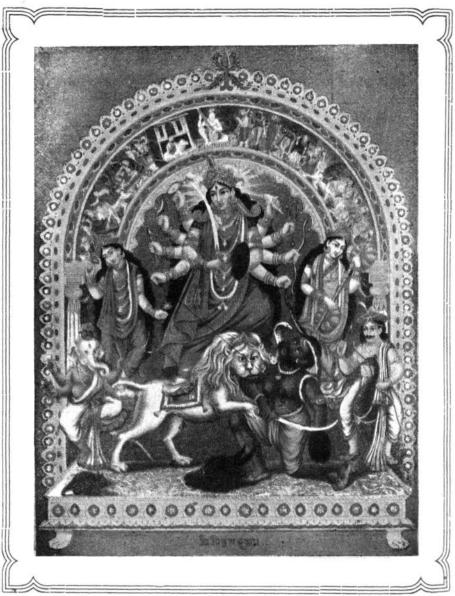
শ্রীশ্রীদুর্গা।

Bjoiya Press, Calcutta.

শ্রীশ্রীদুর্গোৎসব

নবরাত্র।

নবরাত্রির উৎসব ভারতবর্ষের সকল প্রদেশে, সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে হইয়া থাকে। সুদূর ত্রিবাঙ্কুড় হইতে কাশ্মীর পর্য্যন্ত; গান্ধার হইতে আসাম পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশের দশকর্ম্মান্বিত হিন্দুমাত্রেরই গৃহে আশ্বিনের শুক্লা প্রতিপদ হইতে নবমী তিথির শেষ যাম পর্য্যন্ত এই নয় রাত্রের জন্য চণ্ডিকার ঘট স্থাপিত হয়; যন্ত্রে দেবীর পূজা হয় এবং দুর্গাপাঠ অর্থাৎ মার্কণ্ডেয় চণ্ডীপাঠ হইয়া থাকে। বৈষ্ণব, সৌর, গাণপত্য, শৈব,—এমন কি রামানুজাচার্য্যের, বল্লভাচার্য্যের, নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণও নবরাত্রের ব্রত এবং উৎসব করিয়া থাকেন। দেবীর মৃণ্ময়ী প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া কোথায়ও পূজা হয় না; সর্ব্বত্র যন্ত্রে এবং ঘটে দেবী পূজিত হইয়া থাকেন। কাশী, জ্বালামুখী, হিঙ্গলাজ, কামরূপ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্রে, যেখানে দেবীর যন্ত্র এবং পীঠ প্রতিষ্ঠিত আছে, সকল সম্প্রদায়ের হিন্দু, মন্দিরে যাইয়া সঙ্কল্প করিয়া দুর্গাপাঠ বা চণ্ডীপাঠ করিয়া আসেন। যাঁহারা পাঠ করিতে পারেন না, তাঁহারা শ্রবণ করেন। এমন সম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে সর্ব্বব্যাপী উৎসব আর আছে কিনা বলিতে পারি না। ইহার এতটা ব্যাপ্তি কেন হইল, কিসের জন্য হইল তাহাও বলিতে পারি না। ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের হিন্দু গৃহস্থের ধারণা যে, নবরাত্রের সময়ে গৃহে চণ্ডীপাঠ না হইলে গৃহে অমঙ্গল ঘটে। বিশেষতঃ কুলাঙ্গনাগণ ত দুর্গাপাঠের ব্যবস্থা করিবেনই; তাঁহাদের বিশ্বাস যে, ভবানীর কল্যাণে পুত্রকন্যা নীরোগে এবং সুখে থাকে। অতএব শত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তাঁহারা গৃহে নবরাত্রের ঘট বসাইবেনই।

কাশ্মীর, কান্যকুব্জ, মিথিলা এবং বাঙ্গলার শাক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে নবরাত্রের উৎসবের একটু বিশিষ্টতা আছে। গুর্জ্জর বা লাট-প্রদেশের শাক্তগণও একটু বিশেষভাবে এই উৎসব করিয়া থাকেন। যে দেশে দেবী যে নামে পরিচিতা, সেই দেশে নবরাত্রের উৎসব শাক্তগণের মধ্যে সেই দেবীর নামেই পরিচিত। যথা, কাশ্মীরে অম্বাদেবীর পূজা, রাজপুতানায় বিশেষতঃ মিবারে ভবানীদেবীর পূজা, গুজরাটে এবং হিঙ্গলাজে হিঙ্গলা বা রুদ্রাণীর পূজা, কান্যকুব্জে কল্যাণীর উৎসব ও পূজা, মিথিলায় উমার পূজা, বাঙ্গলায় শ্রীদুর্গা বা ভদ্রকালীর পূজা প্রসিদ্ধ। দাক্ষিণাত্যের প্রায় সকল প্রদেশেই অম্বা বা অম্বিকার পূজা বলিয়া নবরাত্রের উৎসব বিখ্যাত। অবশ্য কামরূপে কামাখ্যাদেবী ছাড়া অন্য কাহারও পূজা হয় না। কালী-ঘাটে, মায়ের চক্রের মধ্যে যাঁহারা বাস করেন তাঁহারা কেহই স্বতন্ত্র ভাবে মৃণ্ময়ী প্রতিমা গড়িয়া মায়ের পূজা করিতে পারেন না, প্রত্যেক গৃহস্থকেই মায়ের মন্দিরে পূজা পাঠাইয়া দিতে হয়। কাশীতেও তেমনি অন্নপূর্ণার চক্রের মধ্যে বা দুর্গাবাড়ীর আয়তনের ভিতরে যাঁহারা বাস করেন তাঁহারা নিজ নিজ গৃহে ঘট স্থাপন পর্য্যন্ত করেন না। তন্ত্রের নির্দ্দেশই এই যে, মহাপীঠস্থানে, যেখানে শক্তির সিদ্ধ যন্ত্রসকল অনাদিকাল হইতে প্রতিষ্ঠিত, সেখানে স্বতন্ত্র ভাবে মায়ের বোধনের প্রয়োজন নাই। এইখানে বলিয়া রাখা ভাল যে, ভারতবর্ষব্যাপী সকল শক্তিতীর্থ সাধনার স্থান বলিয়া, গুরু-পরম্পরার সিদ্ধিলাভের প্রসিদ্ধ ক্ষেত্র বলিয়া পরিচিত, অর্চ্চিত এবং পূজ্য। এক-একস্থানে এক-একটা শাক্ত যন্ত্র সিদ্ধ পীঠ বলিয়া রক্ষিত আছে। পরে ভক্ত ভাবুকগণ সেই পীঠ বা যন্ত্রের উপর এক-একটা শক্তি-মূর্ত্তির পরিকল্পনা করিয়া মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এক-একখানা কষ্টি-পাথরের খণ্ডের উপর যন্ত্র অঙ্কিত আছে, সেই যন্ত্রের উপরে সোনার বা রূপার মুখ ও হাত-পা বসাইয়া প্রতিমা খাড়া করা হইয়াছে। অথবা সেই প্রস্তরখণ্ডের

উপর একটা মুখ খুঁদিয়া খাড়া করিয়া রাখা হইয়াছে। মূর্ত্তি বা প্রতিমা অপেক্ষাকৃত আধুনিক, যন্ত্র বা আসন স্মরণাতীত কাল হইতে বিরাজিত। কাশী, গয়া, প্রয়াগ, কামরূপ প্রভৃতি স্থান তীর্থ নাম কেন ধারণ করিল, কোন্ পদ্ধতি অনুসারে ভারতবর্ষের শাক্ত, বৈষ্ণব ও শৈব তীর্থসকল প্রতিষ্ঠিত, তাহার আলোচনা সময়ান্তরে করিতে পারি। তবে এখন এইটুকু বলিয়া রাখা ভাল যে, এই তীর্থ সকলের পশ্চাতে ভারতবর্ষের হিন্দুজাতির অনেকটা বিস্মৃত ইতিহাস-কথা, সমাজ ও ধর্ম্মের উত্থান-পতনের কথা লুকান আছে। তন্ত্র যে ভাবে তীর্থতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা হইতে একটা কি দুইটা স্তরের খবর পাওয়া যায়; দুইটা কি তিনটা যুগের পরিচয় পাওয়া যায়; কিন্তু তাহা ছাড়া আরও অতীত যুগের আরও অনেক কথা যে এক-একটা তীর্থের সহিত সংলগ্ন আছে, তাহা একটু তলাইয়া বুঝিবার চেষ্টা করিলেই অনুমানে জানা যায়।

কেবলই তীর্থক্ষেত্র কেন, প্রত্যেক উৎসবের অন্তরালে ভারতবর্ষের বহু অতীত যুগের বিস্মৃত ইতিহাস লুকান আছে। এই নবরাত্রের উৎসবে দাক্ষিণাত্যের হিন্দুগণ ঘটের মুখে ধান্যের শীর্ষ গুচ্ছে গুচ্ছে বসাইয়া দেবীকে ধান্যক্ষেত্রের ঈশ্বরী হিসাবে অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। রাজপুতানার বৈশ্য কৃষকগণও ঠিক এই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া দেবীর পূজা করেন। আবার কাশ্মীরে এবং পঞ্জাবে বাসন্তী নবরাত্রের সময়ে যব ও গোধূমের শীর্ষসহ মহালক্ষ্মীর পূজা হইয়া থাকে। বলিতে ভুলিয়াছি যে, নবরাত্রের উৎসব দুইটা আছে; একটা শরৎকালে, অন্যটা বসন্তকালে বাসন্তী নবরাত্র। ইহা দেখিয়া ম্যাক্সমুলার সাহেব লিখিয়া গিয়াছেন যে, নবরাত্রের উৎসব আর কিছুই নহে, অতি পুরাকালের Harvest-ceremo·y, যুগে যুগে নূতন নূতন ধর্ম্ম ও সম্প্রদায়ের হাতে পড়িয়া নূতন নূতন আকার ধারণ করিয়াছে। এ কথার আলোচনা, যাঁহারা comparative mythologyর চর্চ্চা করেন, তাঁহারাই করিবেন। তবে নবরাত্রের

ব্রত এবং উৎসব যে ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রদেশব্যাপী উৎসব, তাহা যিনি হিন্দুগৃহস্থের ব্রত নিয়মের সমাচার রাখেন, তিনিই স্বীকার করিবেন। কিন্তু বাঙ্গলার দুর্গোৎসব বড়ই জাঁকাল ব্যাপার, এত বড় জাঁকাল কাণ্ড ভারতবর্ষের আর কোন প্রদেশে আছে কিনা বলিতে পারি না। এত অর্থব্যয়, এমন গ্রামে গ্রামে দীয়তাং ভুজ্যতাং রব, এমন ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে সকলের নববস্ত্র গ্রহণের ব্যবস্থা হিন্দুর অন্য কোন উৎসবে হয় কি না, জানি না। হিন্দুস্থানের হোলি উৎসব সর্ব্বজনীন উৎসব বটে, কিন্তু তাহাতে এতটা জাঁক নাই, এমন অর্থব্যয় নাই, এমন নানা ভাবের সমাহার নাই। বসন্তের হোলি উৎসব এক-রসপ্রধান, কেবল আদিরসের অভিব্যঞ্জনা মাত্র; কেন না উহা যে পুরাকালের মদনোৎসবের আকারান্তর। যাউক অন্য কথা, এইবার বাঙ্গলার শ্লাঘা, বাঙ্গালীর গর্ব্ব এই দুর্গোৎসব বুঝিবার চেষ্টা করিব।

দুর্গোৎসব

বাঙ্গলার দুর্গোৎসবের তিনটা স্তর আছে। একটা খাঁটী তন্ত্রের বা শক্তি আরাধনার স্তর; দ্বিতীয় শাক্ত পুরাণের স্তর; তৃতীয় সামাজিক স্তর। তিনটি পুরাণ দুর্গাপূজায় মান্য; অর্থাৎ তিনটি পুরাণের কোন একটি পুরাণের পদ্ধতি মান্য করিয়া বাঙ্গলার গৃহস্থগণ দুর্গোৎসব করিয়া থাকেন। প্রথম বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরাণোক্ত পদ্ধতি, দ্বিতীয় দেবী পুরাণোক্ত পদ্ধতি, তৃতীয় কালিকা পুরাণোক্ত পদ্ধতি। গৃহস্থের দীক্ষামন্ত্রের অনুসারে পূজার পদ্ধতি নির্ণীত হইয়া থাকে। যাহারা বৈষ্ণব তাঁহারা প্রায়ই বৃহন্নন্দিকেশ্বরের পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া থাকেন। যাঁহারা শৈব বা স্মৃতি-শাস্ত্রদ্বারা পূর্ণভাবে শাসিত, তাঁহারা দেবীপুরাণ মান্য করেন, এবং ঘোর শাক্ত যাঁহারা তাঁহারা কালিকা পুরাণের পদ্ধতি অবলম্বন করেন। অথবা পুরুষপরম্পরায় যাঁহারা যে পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া পূজা করিয়াছেন, তাঁহারা সেই পদ্ধতি অনুসারেই কাজ করেন। এই তিন পদ্ধতির মধ্যে মন্ত্রের, পূজার ক্রমের এবং আরাধনার অনেক

পার্থক্য আছে। যাঁহার নামে সঙ্কল্প হয়, তিনি ব্রাহ্মণ হইলে পূজা তাঁহাকেই করিতে হয়। সকল সময়ে গৃহস্থ এতবড় কাজ করিয়া উঠিতে পারেন না বলিয়াই গুরু বা পুরোহিতকে প্রতিনিধিরূপে নিযুক্ত করা হয়। দুর্গোৎসব প্রত্যেক গৃহস্থেরই কর্ত্তব্য; ইহা ঠিক কাম্য কর্ম্ম নহে, অনেকটা নিত্যকর্ম্মের মতন। যাঁহার যেমন সামর্থ্য তিনি তদনুসারে পূজা করিবেন। নবরাত্রের ব্রত ভারতবর্ষের অন্য সকল প্রদেশের প্রত্যেক হিন্দু গৃহস্থেরই কর্ত্তব্য, দুর্গোৎসবও নবরাত্রের মতন বাঙ্গলার হিন্দু গৃহস্থ মাত্রেরই কর্ত্তব্য। ঘটে পটে মায়ের পূজা হয়, শুদ্ধ গঙ্গোদকে বিল্বদলে মায়ের পূজা হয়; কেবল ইষ্টমন্ত্র জপ করিয়া নিয়মিত চণ্ডীপাঠ করিলেও মায়ের পূজা হয়। এই পূজার তিনটি প্রধান অঙ্গ। প্রথম বোধন, দ্বিতীয় সম্বর্দ্ধনা, তৃতীয় বিসর্জ্জন। কল্পারম্ভ বা বোধন সাত রকমের,—নবম্যাদি কল্প, অর্থাৎ অপর পক্ষের কৃষ্ণা নবমী তিথিতে কল্পারম্ভ করিয়া একমাস কাল মাতাকে জাগাইয়া রাখিতে হইবে; প্রতিপদাদি কল্প, ষষ্ঠ্যাদি কল্প, সপ্তম্যাদি, মহা অষ্টমী ও কেবল মহানবমীর কল্প বা বোধন আছে। অন্ততঃ একদিনের জন্যও মায়ের বোধন করিতে হইবে। তান্ত্রিক শক্তি আরাধনার হিসাবে দেবীপূজা করিতে হইলে কঠোর ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করিয়া গৃহস্থকে স্বয়ং কুণ্ডলিনীকে জাগরণ করাইতে হয়। তান্ত্রিক সাধকের পক্ষে নবম্যাদি কল্পই প্রশস্ত; প্রতিপদ্ আদি কল্পও সাধনার পক্ষে অপ্রশস্ত নহে। ইহা উৎসব নহে, সাধনা; এ সাধনা বিল্বমূলে বসিয়া গোপনে করিতে হয়।

শক্তি আরাধনা

শরৎকালের দুর্গোৎসব দক্ষিণায়নে, দেবনিদ্রার কালে হইয়া থাকে। আষাড় মাসের শয়ন-একাদশী হইতে উত্থান-একাদশী পর্য্যন্ত দেবনিদ্রার কাল; এ সময়ে সূর্য্য অয়নের দক্ষিণাংশে মকর রাশির দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন; এ সময় বৈদিক যাগ-যজ্ঞের প্রশস্ত সময় নহে, তন্ত্রের আরাধনাও এই সময়ে করিতে নাই। ইহাকে

অকাল বলে, পিতৃপক্ষের কালও বলে। এই অকালে দেবীর পূজা করিতে হয় বলিয়া, এ পূজায় বোধনের আড়ম্বর খুব বেশী। কারণ, দেবনিদ্রার কালে দেহস্থা কুণ্ডলিনী শক্তিও নিদ্রিতা থাকেন, তাঁহাকে জাগাইয়া তোলাই শরৎকালের দুর্গোৎসবের প্রধান অঙ্গ। তন্ত্র বলেন যে, ব্রহ্মাণ্ডে যাহা আছে, মনুষ্য-দেহভাণ্ডেও তাহাই আছে, এবং যাহা নাই দেহভাণ্ডে তাহা নাই ব্রহ্মাণ্ডে। তন্ত্র বলেন, দেহস্থা কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগাইয়া ব্রহ্মাণ্ডব্যাপিনা কুণ্ডলিনীর সহিত মিলাইতে পারিলেই সাধনায় সিদ্ধিলাভ হইল, মুক্তির পথ প্রশস্ত হইল। দেহস্থ আত্মাই যে বিশ্বব্যাপী আত্মা, সাধনার দ্বারা ইহা বুঝিতে পারিলেই পরমানন্দ লাভ হইতে পারে। এই হেতু তন্ত্র বাহিরের দেবতা মানেন না। তন্ত্র বলেন, তোমার আত্মাই তোমার ইষ্ট, তোমার পরমেশ্বর, তোমার পূজ্য এবং আরাধ্য। আত্মা ছাড়া দেহে যেমন অন্য শক্তি নাই, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেও তেমনি পরমাত্মা ছাড়া অন্য শক্তির খেলা হয় না। দেহস্থ আত্মার সহিত বিশ্বব্যাপী আত্মাকে মিলাইতে পারিলেই সাধকের ইষ্টসিদ্ধি হইয়া থাকে। সে আত্মাকে পাইতে হইলে কুণ্ডলিনীকে জাগাইতে হইবে। এই জাগারণকেই বোধন বলে। তন্ত্র আরও একটা কথা বলেন। তন্ত্র বলেন যে, বাহ্য প্রকৃতির সহিত দেহগত অন্তঃপ্রকৃতির পূর্ণ সমতা আছে। বাহিরের জগতে যদি ছয়টা ঋতু থাকে, অর্থাৎ ছয় প্রকারের পরিবর্ত্তন থাকে, তাহা হইলে যে দেশে ছয় ঋতুর প্রভাব আছে সেই দেশবাসী নরনারীর দেহেও ছয় ঋতুর বিকাশ হইবেই। বাহিরে উত্তরায়ণ দক্ষিণায়ন আছে, দেহের মধ্যেও উত্তরায়ণ দক্ষিণায়ন থাকিবেই। যে দেহে বাহ্য প্রকৃতির সহিত এইরূপ সমতা নাই সে দেহ রুগ্ন;—শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্—ধর্ম্মসাধনের পক্ষে মনুষ্য-শরীরই প্রথম ও প্রধান অবলম্বন, অতএব রুগ্ন ও দুর্ব্বল দেহের দ্বারা তন্ত্রসাধনা ত হয়ই না, কোন ধর্ম্মসাধনই সম্ভবপর নহে। দেহটাকে শক্তি আরাধনার উপযোগী করিবার জন্য ব্রত-পক্ষ হইতে সাধককে উদ্‌যোগ

আয়োজন করিতে হয়। ব্রত-পক্ষের বিধিনিষেধের মধ্যে পক্ষকাল থাকিলে দেহগত বহু অসামঞ্জস্য নষ্ট হয়; তাহার পর পিতৃপক্ষ বা তর্পণ পক্ষ। দেবনিদ্রার কালে পিতৃগণ জাগিয়া থাকেন; এ সময়ে দেবতার সাহায্যলাভ সুবিধাজনক নহে, অতএব পিতৃগণের আরাধনা করিয়া, তাঁহাদের কৃপায় কতকটা শক্তি সঞ্চয় করিতে পারা যায়। বিশেষতঃ তন্ত্র বলেন, শক্তি সাধনা করিতে হইলে, বংশের ধারা পবিত্র রাখিতে পারিলে অনেকটা সুবিধা হয়; পিতৃকুল এবং মাতৃকুলের মধ্যে সিদ্ধ সাধক কেহ থাকিলে তাঁহার প্রভাবে সাধক অনেকটা অগ্রসর হইতে পারেন। কারণ, যে দেহ লইয়া সাধনা করিতে হইবে, যাঁহাদের কৃপায় সেই দেহ লাভ করিয়াছ তাঁহাদিগকে আহ্বান করিতে পারিলে, তাঁহাদের আশীর্ব্বাদে বহু বাধাবিঘ্ন দূর হয়। শক্তি আরাধনায় পিতৃগণই প্রধান অবলম্বন। তাই তর্পণপক্ষে পিতৃপুরুষগণকে পরিতৃপ্ত করিয়া, তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ মাথায় করিয়া দেবীপক্ষের প্রতিপদ হইতে মায়ের বোধন আরম্ভ করিতে হয়। তাই দেবী পক্ষের পূর্ব্বেই পিতৃপক্ষ এবং পিতৃপক্ষের পূর্ব্বেই ব্রতপক্ষ; ব্রত-পক্ষে এবং পিতৃপক্ষে সকল কর্ত্তব্য সাধন করিতে পারিলে তবে দেবীপক্ষে মায়ের আরাধনা করিবার অধিকার হয়। পূর্ব্বে বলি-য়াছি যাঁহারা শাক্ত তাঁহারা নবম্যাদি কল্প করিয়া থাকেন, অর্থাৎ পিতৃপক্ষের নবমী তিথি হইতে তাঁহারা বোধন বসাইয়া থাকেন; তাঁহারা একমাসকাল দেবীর পূজা করেন। নবম্যাদি কল্পকে সাক্ষী বোধন বলে, অর্থাৎ তিলাঞ্জলি পরিতৃপ্ত পিতৃগণ উপস্থিত থাকিয়া এই কল্পের সহায়তা করেন; তাঁহারা যেন দাঁড়াইয়া থাকিয়া কুণ্ডলিনী জাগরণের সুবিধা করিয়া দেন। বংশানুক্রমের প্রভাবে (Heredity) এ দেহ ত তাঁহাদেরই, তাঁহাদের পাপপুণ্য, দোষগুণ এবং অন্য বিশিষ্টতা সকলই এ দেহে সূক্ষ্ম বা প্রকট ভাবে বিরাজ করিতেছে; তাঁহারা উপস্থিত থাকিয়া বোধনের সহা-য়তা করিলে মা আমার দেহঘটে এবং বিশ্বঘটে স্বেচ্ছায় জাগিয়া

বসেন ; তিনি জাগিলে আমার সকল সাধ পূর্ণ হয়, আমার সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ পরমাত্ম স্বরূপের দর্শন হয়। এই জাগরণই দুর্গোৎসবের সাধনা, আসল পূজা, আসল আরাধনা। এই জাগরণ দেহভাণ্ডে এবং ব্রহ্মাণ্ডে, ঘটে এবং পটে সাধন করিতে হয়। এই জাগরণই বোধন, এই জাগরণই আগমনী, এই জাগরণই প্রতিমার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা—দেবীর আগমন এবং নির্গমন। প্রতিবর্ষে পঞ্জিকাতে লেখা থাকে যে, এবার দেবীর দোলায় আগমন বা নৌকায় আগমন, তাহা জাগরণের ভঙ্গীর ইঙ্গিত মাত্র। বাহ্যপ্রকৃতির যেমন অবস্থা থাকিবে, দেহভাণ্ডে কুণ্ডলিনীর তেমনই ভাবে—তেমনই প্রকারের গতিতে জাগরণ বা উদ্বোধন হইবে। হস্তি, অশ্ব, নৌকা, দোলা প্রভৃতির গতির অনুরূপ গতিতে মায়ের উদ্বোধন হইলে, রূপকের ভাষায় পঞ্জিকাকারগণ তাহা ব্যক্ত করিয়া থাকেন।

বোধন ও জাগরণ

বোধন দুই প্রকারের ; প্রথম সাধনার বোধন, দ্বিতীয় উৎসবের বোধন। তন্ত্র বলেন যে, দেবনিদ্রাকালে বিল্ববৃক্ষমূলে শিব ও দুর্গা শয়ন করিয়া থাকেন ; এই জন্য ঐ সময়ে বিল্বমূল খনন করিতে নাই। দেহতত্ত্বের দিক দিয়া এ কথাটা বুঝিতে হইলে বুঝিতে হইবে যে, পুরাণের ভাষায় বিল্ববৃক্ষ দেহের মেরুদণ্ডকেই বলা হইয়া থাকে। এই বিল্বমূলে—মূলাধারে কুণ্ডলিনী নিদ্রিতা রহিয়াছেন ; কাজেই তাঁহাকে জাগাইতে হইলে—মূলাধারে, বিল্বমূলে যাইয়া তাঁহার বোধন করিতে হইবে। তন্ত্রোক্ত ষট্‌চক্রভেদ বুঝিতে না পারিলে, অন্ততঃ সে Theory না জানিলে দুর্গোৎসবের প্রকরণ ও পদ্ধতি বুঝিয়া উঠা কঠিন হইবে। কারণ তন্ত্রোক্ত সকল পূজা ও উপাসনার দুইটা দিক্ আছে, একটা ষট্‌চক্রভেদের—দেহতত্ত্বের দিক্, অন্যটা উৎসবের—ভাবের ও সমাজের দিক্। দেহতত্ত্বের অংশটা না বুঝিলে ভাবের দিকের ঠিক মজাটা পাওয়া যায় না।

বোধন করিবার পূর্ব্বে সঙ্কল্প করিতে হয়; সে সঙ্কল্পের মন্ত্রে আছে—

"আশ্বিনে মাসি কৃষ্ণেপক্ষে নবম্যাস্তিথাবারভ্য মহানবমীং যাবৎ অমুক গোত্রঃ সদারাপত্যঃ শ্রী অমুক দেবশর্ম্মা শ্রীভগবদ্দুর্গা-প্রীতি-কামঃ প্রত্যহং বার্ষিক শরৎকালীন শ্রীভগবদ্দুর্গা পূজাকর্ম্মাহং করিষ্যে।"

এই সঙ্কল্পের মন্ত্র হইতে বুঝা যায় যে, শ্রীদুর্গাপূজা বার্ষিক পূজা—নিত্যকর্ম্মতুল্য অবশ্যকর্ত্তব্য পূজা, কারণ গোড়ার সঙ্কল্পে কোন কামনার উল্লেখ নাই; এবং এই পূজা সদারাপত্য—স্ত্রীপুত্রকন্যা-সমেত সকলে মিলিয়া করিতে হয়। অধিবাসের সঙ্কল্প করিবার বচনে "স্বকর্ত্তব্য-বার্ষিক শরৎকালীন" এইটুকু স্পষ্ট করিয়া বলা আছে। কাজেই বলিতে হইবে, সামাজিক হিসাবে দুর্গোৎসব নিত্য-কর্ম্ম তুল্য অবশ্যকর্ত্তব্য। এইখানেই নবরাত্রের ব্রতের সহিত দুর্গোৎ-সবের সমতা রক্ষিত হইয়াছে। বোধনের পূর্ব্বে কুণ্ডলিনী কবচ পাঠ করিতে হয়। দেহের কোন্ অংশে তিনি কোন্ রূপে এবং কেমন ভাবে বিরাজ করিতেছেন, তাহার বর্ণনা এই কবচে আছে। গৃহস্থ পূজক কেবল কুণ্ডলিনী কবচ পাঠ করিয়া সঙ্কল্প করেন। সাধক যিনি, তিনি ঐ কবচের নির্দ্দেশ অনুসারে ষট্চক্রে দেবীর ছয়টা রূপ ধ্যান করিয়া মূলাধারে যাইয়া তাঁহাকে উদ্বুদ্ধ করিবার চেষ্টা করেন। যে সিদ্ধ সাধক কুণ্ডলিনীকে উদ্বোধন করিতে পারেন তাঁহার পূজা সিদ্ধ হয়, তিনি দেহমাতৃকাকে বিশ্বমাতা বিশ্ব-ময়ী রূপে দেখিতে পান—বুঝিতে পারেন। তিনি মহানবমী পর্য্যন্ত মানস পূজায় মায়ের অর্চ্চনা করিতে থাকেন। গৃহস্থ এই সাধ-নার অনুকল্প করে। তিনি বোধনের ঘট বিল্বমূলে বসাইয়া বলেন —"ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ ভগবদ্দুর্গে দেবি ইহ গচ্ছ ইহ গচ্ছ।" পরে "ওঁ দক্ষযজ্ঞবিনাশিন্যৈ মহাঘোরায়ৈ যোগিনীকোটি পরিবৃতায়ৈ ভদ্রকাল্যৈ হ্রীং ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ"—এই মন্ত্র পাঠ করিয়া তাঁহাকে

ঘটস্থ এবং আসনস্থ করিতে হয়। এই সঙ্গে "উভে যদিন্দ্র রোদসী আপপ্রাথ উষা ইব, মহান্তং ত্বামহীনাং দেবী সম্রাজং ভর্ষণীনাং" ইত্যাদি বেদ সূক্ত পাঠ করিতে হয়। দুর্গোৎসবের মন্ত্রের মধ্যে প্রায় বার আনা বেদোক্ত মন্ত্র ও ঋচার আবৃত্তি করিতে হয়, বাকী তন্ত্রের মন্ত্র এবং পুরাণের শ্লোক। বোধনের শেষে এই শ্লোকটার আবৃত্তি করিতে হয়—

"রাবণস্য বধার্থায় রামস্যানুগ্রহায় চ।
অকালে ব্রহ্মণা বোধো দেব্যাস্ত্বয়ি কৃতঃপুরা॥

* * * * *

দেবি চণ্ডাত্মিকে চণ্ডি চণ্ডবিগ্রহকারিণি।
বিল্বশাখাং সমাশ্রিত্য তিষ্ঠ দেবি যথাসুখম্॥"

ইহা ভাবের হিসাবে বলিতে হয়; কেহ কেহ গোড়ার অংশটুকু বলেন না। বোধনের পর অধিবাস; অধিবাসে দশদিক্‌পাল আদিত্যাদি নবগ্রহের এবং গণেশ, শিব, ভাস্কর, অগ্নি, কেশব, কৌশিকী আদি দেবতার অর্চ্চনা করিতে হয়। শেষে "মেরুমন্দর" আদি মন্ত্রের দ্বারা বিল্ববৃক্ষের আরাধনা করিয়া, নৈঋত কোণ ছাড়া অন্য দিকের ফলযুগলযুক্তা একটি শাখা কাটিয়া—"চণ্ডিকারোপণার্থায় ত্বামহং বরয়ে প্রভো" বলিয়া প্রতিমা-সন্নিধানে রম্ভাতরুসহ নবপত্রিকার স্থাপন করিতে হয়। ইহাই কলা-বৌ; ইহাই আসল, ইহাই বোধনের আধার, দেবীর আবাহনের ঘটস্থাপনের আশ্রয়। ইহা কলাবধূ নহে, গণেশের পত্নীও নহে। দেহতত্ত্বের হিসাবে ইহাই হইল মেরুদণ্ডের অনুকল্প ষট্‌চক্রভেদের নিদর্শন মাত্র। খোস্‌খেয়ালের কাব্য জড়াইয়া এই মহামহোৎসবের ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিলেই অজ্ঞতা এবং মূর্খতা আপনা-আপনি ফুটিয়া উঠিবে। অনেকে এবম্প্রকারের উদ্ভট ব্যাখ্যা করিয়া দুর্গোৎসবের প্রকৃত মাহাত্ম্যের অপহ্নব ঘটাইয়াছেন। তাই এই প্রতিবাদটুকু এইখানে করিয়া রাখিতে হইল।

আগমনী

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, দুর্গোৎসবে তন্ত্রের সাধনপদ্ধতি আছে, পুরাণ আছে এবং সমাজতত্ব আছে। তন্ত্রের সাধনপদ্ধতির একটু ইঙ্গিত করিয়া রাখিলাম, এই সঙ্গে আরও একটু বলিয়া রাখিতে হইবে। তন্ত্র বলিয়াছেন ব্রহ্মাণ্ডে যাহা আছে, দেহভাণ্ডে তাহাই আছে; বিশেষতঃ এই মেদিনীমণ্ডল—পৃথিবী সূক্ষ্মভাবে দেহের মধ্যে বিরাজ করিতেছে। পৃথিবীতে কৈলাস, হিমালয়, সপ্তসমুদ্র, অষ্ট কুলাচল আছে; দেহের ভিতরেও সেই সকলই আছে। দেহের কোন অংশ কৈলাস, কোন অংশ হিমালয় তাহার নির্দ্দেশ তন্ত্র করিয়া দিয়াছেন। উমা, গৌরী, পার্ব্বতী হিমালয়ের কন্যা; দেহের মধ্যের হিমালয়ে জাতা কুণ্ডলিনী পর্ব্বে পর্ব্বে ভবা তাই তিনি পার্ব্বতী। সেই পার্ব্বতী কৈলাসে শিবের পার্শ্বে নিদ্রিতা, তাঁহাকে জাগাইয়া হিমালয়ে আনিয়া আত্মজা কন্যারূপে নবরাত্রের কয়দিন সাধক তাঁহাকে লইয়া মেয়ের সুখ ভোগ করিতে চাহেন। একাদশ আসক্তির মধ্যে বাৎসল্যাসক্তিকে প্রবল করিয়া ইষ্টদেবীকে কন্যা-রূপে তাঁহার সাযুজ্য ও সামীপ্য সুখ অনুভব করিবার জন্যই দুর্গার পূজা ও বোধন। এই সাধনতত্বটুকু পুরাণ এক সুন্দর কাহিনীতে পরিণত করিয়াছেন। পুরাণের এই ভাবগত উমামহেশ্বরের আখ্যা-য়িকা অবলম্বনে আগমনীর উৎপত্তি। আগমনী বোধনের—কুণ্ডলিনীর জাগরণের emotional অংশ, বাৎসল্যাসক্তিমণ্ডিত মধুর গাথা। এই আগমনীর মধ্যে বাঙ্গালীর গার্হস্থ্য জীবনের একটি অতি সুন্দর ছবি ফুটান আছে; ঝী জামাইয়ের আদর, ঝীয়ের বাপের বাড়ীর প্রতি মমতার বোধ, মায়ের কন্যার প্রতি প্রবল স্নেহ—বাঙ্গালীর বাঙ্গালিত্বের ইহাই বিশিষ্টতা। এই বিশিষ্টতাকে পুরাণের গল্পের সহিত মিশাইয়া বাঙ্গালী কবিগণ এক অপূর্ব্ব, অতুল্য কাব্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই অপূর্ব্ব কাব্য—আগমনী। Emotional devo-tion যেন ষোলকলায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভিতরে রসতত্ব এবং

সাধনতত্ত্ব আছে ; পদে পদে, কথায় কথায় সে তত্ত্বের প্রতি সাধক কবিগণ ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন বটে, পরন্তু ভাবটা—কাব্যটা অতি জাঁকাল ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ষট্চক্রভেদে, কুণ্ডলিনীর জাগরণে প্রথমে আসক্তি পুরুষকারকে সাধনায় তৎপর করে। আগমনীতেও সেই পদ্ধতি অবলম্বিত। আসক্তি মেনকা—জননী পার্শ্বের সম্মূঢ় পুরুষকে বলিতেছেন—

"গিরি, গৌরী আমার এসেছিল,
স্বপ্নে দেখা দিয়ে, চৈতন্য করিয়ে,
চৈতন্যরূপিণী কোথায় লুকাল।"

মা বলিতেছেন—ওগো, আমার মেয়ে বুঝি শ্বশুর বাড়ীতে কষ্টে আছে! আজ রাত্রে স্বপ্নঘোরে তাহাকে দেখিয়াছি। যখন স্বপ্নে দেখা দিয়াছে তখন নিশ্চয় সে আমাদের কথা ভাবিতেছে, এখানে আসিবার জন্য আকাঙ্ক্ষা করিতেছে। উঠ, উঠ,—জাগ, জাগ—তোমারও ত কন্যা, কেবল আমার ত নহে, তাহাকে লইয়া আইস। অন্যপক্ষে কুণ্ডলিনী এই দেবনিদ্রার কালে বিদ্যুদ্বিকাশের মতন এক-একবার চমকিয়া উঠিতেছেন, অতএব যে চৈতন্যরূপিণীকে এখন জাগাইলে তিনি জাগিবেন। পুরুষ তুমি, উদ্বোধন কার্য্যে প্রবৃত্ত হও। যখন বোধন সিদ্ধ হয় তখন মাতৃশক্তির বিকাশ হয়; উমার রূপের আলোতে দেহস্থ হিমালয়-প্রদেশটা যেন কোটিবিদ্যুদ্দামে বিকশিত হইয়া উঠে,—তখন,

"গা তোল গা তোল
বাঁধ মা কুন্তল
এল বুঝি তোর ঈশানী—
ওমা পাষাণী।"

যখন সাধনের ত্রুটিতে উদ্বোধনে বিলম্ব ঘটে তখন বাৎসল্যাসক্তি মেনকা অভিমান করিয়া বলেন,

"এবার আমার উমা এলে
আর আমি পাঠাব না,
বলে বলবে লোকে মন্দ
কারু কথা শুনব না।
"আমি শুনেছি নারদের মুখে
উমা আমার থাকে দুঃখে,
শিব শ্মশানে মশানে ঘোরে
ঘরের ভাবনা ভাবে না।
যদি আসেন মৃত্যুঞ্জয়
উমা নেবার কথা কয়,
তখন—মায়ে ঝীয়ে করবো ঝগড়া,
জামাই বলে মানবো না।"

কি মধুর, কি সুন্দর, বাঙ্গালী জননীর কি অপূর্ব্ব চিত্র! যখন সমাজ সজীব ছিল, পল্লী সমাজ অক্ষুণ্ণ ছিল, তখন অপর পক্ষের গোড়া হইতে বাড়ী-বাড়ী আগমনী গান হইত। এই আগমনী গানে বৈষ্ণব শাক্ত সবাই সমান ভাবে যোগ দিত। সে গান শুনিতে শুনিতে ভাবে প্রাণ ভরিয়া উঠিত। আবার বিজয়ার দিন বিসর্জ্জনের বিদায়ের গান শুনিলে দুঃখে কষ্টে প্রাণ ফাটিয়া যাইত। যেন সত্যই মনে হইত ঘরের মেয়ে ঘরে আসিয়াছিল, নবমীর পরদিন পরের বাড়ী চলিয়া গেল। কাহারও বা রথের দিন হইতে, কাহাদেরও বা জন্মাষ্টমীর দিন হইতে দুর্গোৎসবের আড়ম্বর আরম্ভ হইত। যে দিন কাঠাম ধৌত করিয়া বাড়ীর কুলাঙ্গনাগণ শাঁখ বাজাইয়া প্রদক্ষিণ করিয়া কাঠামতে 'সিন্দুর' লেপন করিতেন, এবং উদ্দেশে বলিতেন, "এস মা, এবার ভালমুখে, হাঁসিমুখে এস মা; তোমার কল্যাণে আমাদের বাছাদের কল্যাণ হউক"—সেই দিন হইতে মায়ের আগমনের প্রতীক্ষা করিতাম, সেই দিন হইতে বাড়ীতে পূজার আয়োজন আরম্ভ

হইত, সেই দিন হইতে আগমনীর ঝঙ্কার কানে আসিয়া বাজিত। সমগ্র সমাজটাকে, সমগ্র দেশটাকে দুই মাসকাল একভাবে ভাবুক, এক রসে রসিক করিয়া রাখা হইত। গ্রামে গ্রামে গ্রাম্য কবিগণ প্রতি-বৎসর নূতন নূতন আগমনী গান রচনা করিতেন; বাঙ্গলাদেশে এমন লক্ষ লক্ষ আগমনী সঙ্গীত প্রতিবৎসরে রচিত হইত। সে একটা বিরাট Literature হইয়া উঠিয়াছিল। অজ্ঞতার উপেক্ষায় আমরা তাহা হারাইয়াছি। দুই একজন মহাকবি ও সিদ্ধ সাধকের ছিটে ফোঁটার মতন দুই চারিটা যে আগমনী গান এখনও প্রচলিত আছে, তাহার সৌন্দর্য্যে এবং রসমাধুর্য্যে বিস্ময়ে অবাক্ হইতে হয়। অকাল বোধন বলিয়া, নিদ্রিতা শক্তিকে জাগাইতে হয় বলিয়া, শারদোৎসবে আগমনীর এতটা বাহার, এমন অপূর্ব্ব প্রভাব। বাসন্তী-পূজায়—চৈত্রমাসের দুর্গোৎসবে আগমনী নাই বলিলেও হয়; কারণ তখন যে জাগ্রতা মায়ের পূজা, বোধনে তেমন আয়াস স্বীকার করিতে হয় না। কারণ, তখনকার মাতা হৈমবতী নহেন, দক্ষ-সুতা—সপ্তবিংশ-ত্রিনয়নী, দাক্ষায়ণী।

প্রতিমার কথা।

দুর্গা-প্রতিমার সহিত দুর্গা আরাধনা এবং পূজার খুব অল্প সম্বন্ধ। এক সিংহবাহিনী মূর্ত্তিরই যে কত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাহা বলা যায় না। ঐ সিংহবাহিনী প্রতিমার ভিতরে সহস্র বৎসরের বাঙ্গালী জাতির ইতিহাস লুকান আছে। সিংহবাহিনী মূর্ত্তি চতুর্ভুজা, অষ্ট-ভুজা, দশভুজা এবং অষ্টাদশ ভুজার হয়। বাঙ্গালী দশভুজা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে, এখনও অষ্টাদশ ভুজার প্রতিমা গড়াইয়া পূজা করে নাই। পূর্ব্বে সিংহবাহিনী, মহিষাসুরমর্দ্দিনী মূর্ত্তিতে লক্ষ্মী সরস্বতী, কার্ত্তিক গণেশ কিছুই থাকিত না। কেবল মায়ের মূর্ত্তি, আর মহিষাসুরের বধ। সে সিংহবাহিনীর সিংহ আর এক রকমের ছিল, এখনকার African Lionএর নকল ছিল না। সে অলৌকিক সিংহ,

ঘাড় খুব লম্বা, মুখখানা কতকটা ঘোড়ার মতন, কতকটা মকরের মতন, শাদা, রোগা, টানা ও লম্বা এক অপূর্ব্ব জানোয়ার। বারেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতির চিত্রশালায় প্রায় সহস্র বৎসরের পুরাতন এক সিংহবাহিনীর মূর্ত্তি আছে। তাহার চিত্রসহ বর্ণনা গত বৎসরের "সাহিত্যে" শ্রীযুত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রকাশ করিয়াছিলেন। হাজার বৎসরের পূর্ব্বেকার বাঙ্গালী এবং এখনকার বাঙ্গালীর মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ, তাই এখনকার সিংহবাহিনী এবং তখনকার সিংহবাহিনীতে আকাশ-পাতালের পার্থক্য ঘটিয়াছে। এ মূর্ত্তি যে বাঙ্গলাদেশে কবে হইতে প্রচলিত হইল তাহাও ভাবিয়া পাই না। কোন মূর্ত্তিই তন্ত্রোক্ত ধ্যানের সহিত মিলান নহে। অমন টেড়ী-কাটা, তাজপরা বাবু কার্ত্তিক পুরাণতন্ত্রের কোন পৃষ্ঠায় নাই। লক্ষ্মী সরস্বতীর অমন রূপ ত কোথাও দেখিতে পাই না, তন্ত্রের ধ্যানে নাই, পুরাণের স্তবস্তোত্রে নাই। তাহার পর যে ভাবে মহিষাসুরমর্দ্দন হইতেছে সে ভাবটাও—সে ভঙ্গীটাও পুরাণ ও তন্ত্রের কুত্রাপি খুঁজিয়া পাইবে না। তাহার পর চালচিত্র বা সূর্য্য-মুখ-ছটা যাহা পিছনে থাকে, তাহারও বিন্যাস এক অপূর্ব্ব পদ্ধতিতে করা হইয়াছে। প্রবাদ এই যে ভাদুরিয়ার জমীদার প্রথমে প্রতিমা গড়িয়া দুর্গোৎসব করেন। সে আজ আট নয় শত বৎসরের কথা। পূর্ব্বে বাঙ্গলায়, ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশের মত, ঘটস্থাপন করিয়া, যন্ত্রের উপর হোম করিয়া নবরাত্রের উৎসব হইত। সে উৎসব হিন্দুমাত্রকেই করিতে হইত। তাহার পর এই প্রকারের প্রতিমা গড়াইয়া কবে হইতে যে এত ধূমধামের সহিত পূজা আরম্ভ হইয়াছে, তাহা আজ পর্য্যন্ত কেহ নির্দ্ধারিতভাবে বলিতে পারেন নাই। কবিকঙ্কণের চণ্ডীতে দুর্গোৎসবের কথা আছে, দশভুজা মূর্ত্তির, এমন আধুনিক প্রতিমার মহামহোৎসবসহ পূজার বর্ণনা নাই। শ্রীচৈতন্যের সময়ে যে দুর্গোৎসব হইত তাহার অনেক উল্লেখ পাওয়া যায়; কিন্তু ঠিক আধুনিক ভাবের পূজা হইত কি

না, তাহা কেহ বলিতে পারে না, তেমন পরিষ্কার বর্ণনা কোন গ্রন্থ বা পুঁথিতে পাওয়া যায় না। আশ্বিনে অম্বিকা পূজা—সে কি কেবল ঘটস্থাপনা করিয়া, চণ্ডীর পূজার মতন পূজা ছিল? নবরাত্রের উৎসব ছিল? না, এখনকার মত পূজা ছিল? আমি যতদূর অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিয়াছি তাহাতে এইটুকু জোর করিয়া বলিতে পারি যে, মাটির প্রতিমা গড়িয়া আধুনিক পদ্ধতি ক্রমে দুর্গোৎসব আড়াইশত বৎসরের অধিক পুরাতন উৎসব নহে। সে প্রতিমাও এখনকার অনুরূপ প্রতিমা নহে। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময় হইতে আধুনিক পদ্ধতিটা একটু প্রবল হইয়াছে; ইংরেজের আমল হইতে এই উৎসব ও পূজা প্রকটভাবে সমাজে চলিয়াছে। এখনকার প্রতিমার প্রতি অভিনিবেশ পূর্ব্বক চাহিয়া দেখিলে উহাতে ইংরেজি সভ্যতার চিহ্ন অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা হউক, আধুনিক দুর্গা-প্রতিমার পুরাতন ইতিহাস এবং পর্য্যায়ক্রমে উন্মেষ পদ্ধতি অনুসন্ধানযোগ্য; উহার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন প্রকৃত ইতিহাস বাহির করিতে পারিলে বাঙ্গালী জাতির সামাজিক ও ধর্ম্মগত ইতিহাসের একটা অঙ্গ পরিষ্কার হইয়া যাইবে।

ভাবের দিকটা ফুটাইয়া তুলিবার জন্যই প্রতিমার প্রতিষ্ঠা; সমাজের সকলকে লইয়া সম্মিলিত ভাবে উৎসব করিবার উদ্দেশ্যেই প্রতিমার প্রতিষ্ঠা। নবপত্রিকা-প্রবেশের সময়ে বলিতে হয়—

"ওঁ চণ্ডিকে চল, চল চালয় শীঘ্রং ত্বমম্বিকে পূজালয়ং প্রবিশ। * * * * ত্বং পরা পরমা শক্তি স্ত্বমেব শিববল্লভা,—ত্রৈলোক্য উদ্ধারহেতুস্ত্বমবতীর্ণা যুগে যুগে।"

দেবীপুরাণোক্ত পদ্ধতি মতেও

"ওঁ আগচ্ছ মদ্‌গৃহে দেবি অষ্টাভিঃ শক্তিভিঃ সহ। * * * বিল্বশাখাং সমাশ্রিত্য তিষ্ঠ যজ্ঞে সুরেশ্বরি॥ দেবি ত্বং জগতাং মাতঃ সৃষ্টিসংহারকারিণী, পত্রিকাসু সমপ্তাসু সান্নিধ্যমিহ কল্পয়।"

এই সব মন্ত্রে লক্ষ্মী সরস্বতীর, কার্ত্তিক গণেশের নাম মাত্র

নাই; উহাদের বোধনও নাই। তবে উহাদের অর্চ্চনা করিতে হয়, এক একটা পাদ্যর্ঘ্য দিয়া উহাদের সম্বর্দ্ধনা করিতে হয়। গণপতির পূজা না হইলে কোন পূজাই হয় না, সেই হিসাবে গণেশের পূজা হয়—গণেশের প্রতিমূর্ত্তির নহে। চণ্ডিকা সকল আয়ুধ-সম্পন্না, তাই আয়ুধানের পূজা করিতে হয়;—সেটা শক্তিপূজার অঙ্গস্বরূপ। প্রকৃতপক্ষে তাহাই অস্ত্রপূজা, শক্তি আরাধনার প্রতীক অর্চ্চনা মাত্র। আসল কথা এই যে, যে প্রতিমা গড়া থাকে, তাহার যখন ধ্যান করিতে হয় না, তখন তাহা প্রকৃতপক্ষে উপাস্য নহে। প্রতিমাটা পৌরাণিক ও সামাজিক অংশের অঙ্গীভূত; উহার সাহায্যে ভাব ফুটে, উহার সাহায্যে সমাজে সম্মেলন সম্ভবপর হয়, উহা সর্ব্বজনীন উৎসবের সহায়, তাই উহার প্রতিষ্ঠা। এখনও অনেক গৃহস্থ নিজের খেয়ালের মত প্রতিমা গড়িয়া থাকে; সকল বাড়ীর সকল প্রতিমা একরকমের নহে; অনেকে সিংহবাহিনীই গড়েন না, কেবল উমা মহেশ্বর গড়িয়া দুর্গোৎসব করেন। এখন ত দুর্গোৎসব ঢের কমিয়াছে, তথাপি বিজয়ার দিন কলিকাতার ঘাটে ঘাটে বেড়াইলে কত রকমের কত মজার প্রতিমা দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব বুঝিতে হইবে যে, প্রতিমা আরাধ্য নহে, উহা ঘর-সাজান সামগ্রী।

ভাব ও ভক্তি

বলিয়াছি যে, দুর্গোৎসবের ভাবাংশটুকু অতিই মধুর, অতীব সুন্দর। আত্মজা—আত্মশক্তিময়ী—কুণ্ডলিনী ভদ্রকালী, কাজেই তিনি মেয়ের মতন—মেয়ে ত বটেনই। আত্মজ ও আত্মজা যেমন জনকের জাতি, কুল, গোত্র, প্রবর, বেদ, শাখা পাইয়া থাকে, পিতৃপরিচয়ে পরিচিত হইয়া থাকে; আত্মজা উমাও তেমনি যাহার বাড়ীতে, যাহার ঘটে উদ্বুদ্ধা হইয়া নবরাত্র যাপন করেন, তাহারই জাতি, কুল, গোত্র, প্রবর, লাভ করেন। তিনি তাহার কন্যারূপে বিরাজ করেন। তন্ত্রের ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্ত। ইহার মধ্যে অনেক

কথা লুকান আছে তাহা পরে বলিব। তাই কায়স্থের বাড়ীর দেবতাকে ব্রাহ্মণে নমস্কার করে না, শূদ্রের প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহকে ব্রাহ্মণে প্রণাম করে না।* তবে শিব নাকি ব্রাহ্মণ, তাঁহার সঙ্গিনী শিবানী ব্রাহ্মণী বটেন; সেইজন্য কায়স্থ পূজক মাকে অন্নভোগ দেয় না, জামাইয়ের জাতি মারা যাইবার আশ-ঙ্কায়। কিন্তু যাহারা সিদ্ধ-সাধক, তাহারা শিবের ভাবনা ভাবে না, কন্যারূপে মাকে গৃহে আনিয়া কন্যার মতনই তাঁহার সহিত ব্যবহার করে; নিজে যাহা খায়, যাহা ভালবাসে, তাহারই ভোগ চড়ায়। আত্মতুষ্টি যাহাতে, আত্মজা উমার তুষ্টি তাহাতেই। এই কন্যাভাবের কথা লইয়া শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব একটি সুন্দর গীত রচনা করিয়াছিলেন—

"মেয়ের বিয়ে দিতে বড় বাসনা,
সকল যোগাড় আছে আমার
মেয়ে কিন্তু হ'ল না।"

আদ্যাশক্তি কুল-কুণ্ডলিনীকে কন্যারূপে জাগাইয়া তুলিতে না পারিলে তিনি ত কন্যারূপে দেখা দেন না, কাজেই মেয়ে হয় না। শক্তি সাধনা ভাবের ও ভক্তির সাধনা, রসের এবং প্রেমের নহে। ভক্তির এমন বিকাশ আর কোন জাতির মধ্যে হইয়াছিল কি না বলা যায় না; আদ্যাশক্তিকে মা বলিয়া, মেয়ে বলিয়া ভক্তির এমন বিকাশ কোন জাতির কোন সাহিত্যে হয় নাই। বাঙ্গালী যেমন গালভরা, বুকপোরা মা নামে ডাকিয়া থাকে, আব্রহ্মতৃণস্তম্ব পর্য্যন্ত সকলকে মা বলিয়া মাধুরীমণ্ডিত করিয়া লয়; এমনটি—এমন মাতৃ-ভাবের অভিব্যক্তি আর কোন জাতি করিতে পারে নাই। মায়ের ঘর-সংসার পাতাইয়া মায়ের ছেলে হইয়া কেমন করিয়া থাকিতে

* এ কথাটা কলিকাতা অঞ্চলের কথা। আমরা জানি পূর্ব্ববঙ্গের অনেক স্থানে দেবদেবী-পূজায় এ জাতিভেদ নাই।—নারায়ণ সং।

হয়, তাহা বাঙ্গালীই শিখিয়াছিল, বাঙ্গালীই পারিয়াছিল। এই ভাব ও ভক্তি ফুটাইবার জন্য পুরাণ সকলের সৃষ্টি, এই ভাব ও ভক্তির পুষ্টির জন্য এককালে বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে নিত্য চণ্ডী-পাঠ হইত; এই ভাব ও ভক্তিকে আচণ্ডালে বিলাইবার জন্য মুকুন্দরাম হইতে ভারতচন্দ্র পর্য্যন্ত বাঙ্গলার মহাকবিগণ মহাকাব্য সকল রচনা করিয়া গিয়াছেন। সে ভাব ও ভক্তি হারাইয়াছি, তাই সে সব কথা আমরা আর তেমন করিয়া বুঝিতে পারি না; বুঝাইবার জন্য এতটা প্রয়াস পাইতে হয়। কিন্তু তাহা ত বুঝাইবার নহে। যে মায়ের স্নেহ পায় নাই, কন্যাকে আদর করে নাই, সে বাঙ্গালীর দুর্গোৎসব কেমন করিয়া বুঝিবে! বাঙ্গলার মায়ের স্নেহ বুঝা চাই, প্রাণে প্রাণে অনুভব করা চাই, বাঙ্গালীর গৃহের কুমারী কন্যার আদর সোহাগ বুঝা চাই, যত্ন আবদার জানা চাই, তবে ইষ্টদেবতার উপর সেই ভাবের আরোপের মহিমা বুঝিতে পারিবে। যিনি জগন্ময়ী, আত্মাশক্তিস্বরূপিণী, যিনি

"যচ্চ কিঞ্চিৎ ক্কচিদ্বস্তু সদসৎ বাখিলাত্মিকে।
তস্য সর্ব্বস্য যা শক্তিঃ সা ত্বং কিংস্তুয়সেতদা॥"

তাঁহাকে মায়ের আসনে বসাইয়া, অথবা মেয়ের সাজে সাজাইয়া আদর সোহাগ করিলে কত মিষ্ট হয়, কত মধুর হয়, জীবনটা কি মজার সুখে ও আনন্দে পূর্ণ হয়, তাহা যে ভাবারোপের পদ্ধতি জানে না, তাহাকে কেমন করিয়া বুঝাইব! ভাবারোপ ভক্তি সাধনার একটা অপূর্ব্ব পদ্ধতি। শ্রীভগবানকে প্রভু, রাজা, দণ্ডধর, পিতা বলিয়া উপাসনা করিলে তেমন মজা পাওয়া যায় না; সে যেন একটু দূরে দূরে, ভয়ে ভয়ে থাকিতে হয়। পরন্তু তিনি জননী—মা, তাঁহার কাছে কোন কিছু গোপন করিবার নাই। সকল আব্দার, সকল আদর তাঁহার কাছে করিতে পারিব—ইহা কতটা মধুর, কত মোলায়েম, কতই মিষ্ট! আবার ছোট খাট মেয়েটি হইলে, তাহাকে মা বলিয়া ত ডাকাই চলে, সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে ঘাড়ে

পিঠে কর, আদর সোহাগ কর, আমোদ-আহ্লাদ কর—সে আরও মধুর, আরও সুন্দর, আরও কোমল। বাঙ্গালী এককালে জগদম্বাকে একাধারে মা ও মেয়ে সাজাইয়া মানবজন্ম ধন্য করিয়াছিল, দুঃখের জীবনকে সুখময়, স্নেহময়, মধুময় মোহময় করিয়া তুলিয়াছিল। এই মোহময় জীবন ছিল বলিয়াই বাঙ্গালার শ্যামাবিষয়ক গান অপূর্ব্ব, অতুল্য, অসাধারণ এবং অদ্ভুত। এই শ্যামাবিষয়ক গানের পথে ভাবের একটা দিক পদ্মার ভাদ্রের স্রোতের মতন দুই কূল উপ্‌চাইয়া প্রবল তরঙ্গে বহিয়া গিয়াছে।

জাঁকের পূজা

এইবার পূজার বিবরণ একটু দিব। বোধন কতকটা গোপনে, বিল্ববৃক্ষমূলে করিতে হয়; সপ্তমী হইতে নবমী পূজাটা বেজায় জাঁকের, বেজায় প্রকাশ্যভাবে করিতে হয়। নানা বাদ্যভাণ্ডসহ পূজা করিতে হয়, পরন্তু বংশীরব সহ মায়ের পূজা করিতে নাই, রস-বিপর্য্যয় ঘটে। যাঁহারা ভাল গৃহস্থ, যাঁহারা তন্ত্রের নির্দ্দেশ মানিয়া দুর্গোৎসব করিয়া থাকেন, তাঁহারা তুরী ভেরী শঙ্খনাদ সহ, ক্কাড়া নাগড়া ঢাক ঢোল সহ পূজা করিবেন, কিন্তু কখনই পূজাগৃহে বংশীরব করিতে দিবেন না। মা আমার ষোড়শী ভুবনেশ্বরী, তিনি জগৎপ্রসূতি, জগৎসবিত্রী; তাঁহার সম্মুখে বংশীরব করিলে রসবিপর্য্যয় ঘটিবার সম্ভাবনা, তাই দুর্গোৎসবে বংশীরব নিষিদ্ধ। বিশেষতঃ দুর্গোৎসব সাময়িক পূজা,—রণচণ্ডীর পূজা, সুতরাং এ পূজায় সমরসময়োপযোগী বাদ্যভাণ্ড ব্যবহার করিতে হয়।

দুর্গোৎসবের প্রথম ও প্রধান অঙ্গস্নান—প্রথমে নবপত্রিকার স্নান, তাহার পর দেবীর স্নান। তাহাকে মহাস্নান বলে। সে স্নান তিন প্রস্তে তিন ভাবে করিতে হয়। প্রথমে সর্ব্বতীর্থের জলে স্নান করাইতে হয়—

"আত্রেয়ী ভারতী গঙ্গা যমুনা চ সরস্বতী।
সরয়ূর্গণ্ডকা পুণ্যা শ্বেত গঙ্গাচ কৌশিকা॥

ভোগবতী চ পাতালে স্বর্গে মন্দাকিনী তথা।
সর্ব্বাঃ সুমনসো ভূত্বা ভৃঙ্গারৈঃ স্নাপযন্তু তাঃ॥"

এই ভাবে মন্ত্র পড়িয়া ভারতবর্ষের যত নদ নদী, হ্রদ, সাগর, তড়াগ, পল্বল সর্ব্বতীর্থের নাম করিয়া ভৃঙ্গারে তাহাদের আবাহন করিতে হয়। তাহার পর বৃষ্টির জল, শিশিরসঞ্চিত জল, উষ্ণ প্রস্রবণের জল, গন্ধোদক, শঙ্খোদক, গঙ্গোদক এবং শুদ্ধ জলে দেবীর স্নান করাইতে হয়। স্নানের সময়ে "ওঁ আপোহিষ্ঠা" মূলক বৈদিক মন্ত্র পাঠ করিতে হয়; "ওঁ অগ্নিমীলে পুরোহিতং" মন্ত্রেরও আবৃত্তি করিতে হয়। শেষে সাগরজলে আসন শোধন করিয়া লইতে হয়। আজকাল আর মহাস্নানের ঠিকমত ব্যবস্থা হয় না, পুরোহিত মহাশয় প্রায়ই অনুকল্পে কাজ সারিয়া লন। পঞ্চগব্যে শোধনটাও ভাল করিয়া হয় না। তাহার পর পঞ্চ শস্যের জলে, রজতের জলে, স্বর্ণোদকে, মুক্তার জলে, নারিকেল জলে, সর্ব্বৌষধি ও মহৌষধির জলে, চন্দনজলে স্নান করাইতে হয়। পুরাণে দুর্গোৎসবের যে পদ্ধতির নির্দ্দেশ আছে, সেই পদ্ধতি অনুসারে কাজ করিতে হইলে সম্রাট অথবা অতিবড় ধনী ছাড়া আর কেহ যথারীতি দুর্গোৎসব করিতে পারে না। প্রবাদ এই কলিযুগে অশ্বমেধ যজ্ঞ রহিত হওয়াতে এই দুর্গোৎসব প্রচলিত হইয়াছে; দুর্গোৎসব কলিযুগে অশ্বমেধের অনুকল্প স্বরূপ। সুতরাং রাজা-মহারাজা ধনকুবের ছাড়া আর কেহ ঠিকমত দুর্গোৎসব করিতে পারে না। তবে তন্ত্রোক্ত শক্তির আরাধনা সাধকমাত্রেরই আয়ত্তের মধ্যে আছে। স্নানের পূর্ব্বে, গজদন্ত-মৃত্তিকায়, বরাহদন্ত-মৃত্তিকায়, বৃষ-শৃঙ্গ-মৃত্তিকায়, বেশ্যাদ্বার-মৃত্তিকায় সাগরতল-মৃত্তিকায়, গঙ্গার দুই কূলের মৃত্তিকায় দেবীপাঠ বা ঘটকে পবিত্র করিয়া লইতে হয়। যে দেশে স্বচ্ছন্দে বন্য বরাহ, মত্ত মাতঙ্গ, বন্য বৃষ বিচরণ করে না, যে দেশে অজাগরের গর্ত্তের মাটি পাওয়া যায় না, সে দেশে এই সকল শুদ্ধি মৃত্তিকা সংগ্রহ করাই কঠিন। অনন্তর অষ্টকলস জলে মহা-

স্নান শেষ করিতে হইবে; সে অষ্ট কলসে, গঙ্গার জল, বৃষ্টির জল, সরস্বতী সলিল, সাগরজল, পদ্মরেণুসমন্বিত জল, নির্ঝর জল, সর্ব্বতীর্থ জল ও চন্দন জল—এই অষ্ট প্রকারের জল পূর্ণ থাকিবে। নবপত্রিকার এবং দেবীর যন্ত্রের স্নান ত করাইবেই, যে সাধক মায়ের বোধন করিয়াছেন, তাঁহার দেহ-ঘটে ও বাহিরের ঘটে মাতৃশক্তির বিকাশ হইয়াছে এই বিবেচনায়, তাঁহাকেও স্নান করাইতে হইবে। পূর্ণাঙ্গে তিনবার স্নান ও শুদ্ধি হইলে তবে মায়ের সপ্তমী হইতে নবমী পর্য্যন্ত পূজা চলিবে। স্নানের পর গন্ধানুলেপ,—সেও এক অপূর্ব্ব ব্যাপার। চন্দন, কুঙ্কুম কস্তুরি—প্রসাধন কলায় যাহা যাহা গন্ধদ্রব্য বলিয়া পরিচিত সে সবই একটু একটু করিয়া ব্যবহাব করিতে হয়। বাহিরে এইভাবে স্নান করাইয়া, সঙ্গে সঙ্গে মানস-পূজায় মনে মনে সেই স্নানের অভিনয়টি করিতে হইবে। ভাবিতে হইবে মেয়েটি আমার চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখে আসিয়া বসিয়াছে. আমি স্বয়ং তাহার গাত্রমার্জ্জন করিয়া, তৈলাদি লেপন করিয়া, তাহাকে স্নান করাইতেছি। পুরাণে যে ক্রম লেখা আছে ঠিক সেই ক্রম অনুসারে তাঁহার স্নান করাইতে হইবে। চঞ্চলা-চপলা মেয়ে মাঝে মাঝে পীড়ি হইতে উঠিয়া পলাইতে চাহিবে, তুমি তাহাকে ধরিয়া আদর করিয়া যেন বসাইবে, তোমার আদর-যত্ন শুনিয়া মা হাসিতে হাসিতে আবার আসিয়া বসিবেন, তুমি মহাস্নান কার্য্য নিরাপদে শেষ করিবে। তাহার পর মেয়েটিকে কাপড় পরাইয়া দিবে, গন্ধদ্রব্যের দ্বারা তাঁহার দেহের অঙ্গরাগ বৰ্দ্ধিত করিবে, শেষে নানা মণিমুক্তার মহামূল্যবান অলঙ্কার পরাইয়া মেয়েটিকে রাজরাজেশ্বরী রূপে সাজাইয়া বেদীর উপর বসাইবে। বেদীর উপর বসাইবার সময়ে মনে হইবে তোমার সদ্যস্নাতা কন্যা উমা সিংহবাহিনী প্রতিমার সঙ্গে যেন এক হইয়া গেলেন। ইহাই মানস পূজার প্রাণপ্রতিষ্ঠা। এইটুকু না হইলে চণ্ডীমণ্ডপে দেবভাব পূর্ণ হয় না।

স্নানের পর ভূতশুদ্ধি এবং ভূতাপসরণ মন্ত্রপাঠ করিয়া সকল

দিক পবিত্র ও সকল বাধাবিঘ্ন দূর করিয়া লইতে হয়। তাহার পর মাকে কিসের জন্য ডাকিতেছি তাহা মন খুলিয়া বলিতে হয়।

"আবহয়ামি দেবিত্বাং মৃণ্ময়ে শ্রীফলেঽপিচ।
কৈলাসশিখরাদ্দেবি বিন্ধ্যাদ্রেহিমপর্ব্বতাৎ।
আগত্য বিল্বশাখায়াং চণ্ডিকে কুরু সন্নিধিম্।

এইভাবে নবপত্রিকার পূজা, ঘটে ও যন্ত্রে মায়েরর বোধন শেষ করিয়া, শেষে মহিষাসুরাদি প্রতিমাস্থ দেবতার সামান্য অর্চ্চনা করিতে হয়। তাহার পর বাসুদেব, নীলকণ্ঠ, দশাবতার, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, অষ্টবসু, চতুর্ব্বেদ প্রভৃতি সকল দেব, সকল দেবার রীতিমত অর্চ্চনা করিতে হয়। শেষে অস্ত্রসকলের পূজা করিতে হয়। যুদ্ধে যে সকল অস্ত্র ব্যবহৃত হয়, প্রতিমার দশ হস্তে যে সকল অস্ত্র থাকে সে সকলের পূজা করিতে হয়। পূজা অর্চ্চনা পরিসমাপ্ত করিলে হোম করিতে হয়, যন্ত্র অঙ্কিত করিয়া হোম করিতে হয়। এই হোমে বৈদিক এবং তান্ত্রিক দুইপ্রকারের মন্ত্র এবং পদ্ধতি নির্দ্দিষ্ট আছে। নিযমিত আদ্যাশক্তির বৈদিক হোম করিতে হইলে বহু অর্থ ব্যয় করিতে হয়। এখন তেমন যোগাড় হয় না, বাঙ্গালার পুরোহিতগণ সে হোম ঠিকমত করিতে পারেন না। তাই হোমটা অনুকল্পে সাধিতে হয়। অথচ হোমই হইল আসল পূজা। স্নান, অভিষেক, পূজা—এ সকলই বহিরঙ্গ, ভাবপুষ্টির এবং ভাবোন্মেষের একটা উপায় মাত্র; হোমই হইল যজ্ঞ, হোমই হইল কর্ম্ম। বাহ্যিক হোম করিয়া, মানস হোম করিতে হয়; মানস হোমের বর্ণনা তন্ত্রে সবিস্তর লিখিত আছে। প্রবাদ আছে, যে, নাটোরের রাজা রামকৃষ্ণ এবং কৃষ্ণনগরের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র জীবনের মধ্যে চারি পাঁচবার পূর্ণাঙ্গে দুর্গোৎসবের হোম করিতে পারিয়াছিলেন। এখন বুঝা গেল যে, দুর্গোৎসবের তিনটি প্রধান অঙ্গ;—প্রথম বিল্বমূলে বোধন, দ্বিতীয় বিল্বশাখা ও কদলীবৃক্ষসহ দেহস্থ কুণ্ডলিনীর অনুকল্পে কুণ্ডলিনীর প্রতিষ্ঠা, তৃতীয় হোম। এই তিন

অঙ্গ বাহ্যিক ভাবে ফুটাইতে হইবে আবার মানস-ক্ষেত্রে ভাবের বিকাশ করিয়া মনে মনে তাহার অনুবৃত্তি করিতে হইবে। ইহাই ভদ্রকালীর আরাধনা, বাকী যাহা কিছু তাহা উৎসবের অঙ্গ। এই ভাবে সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীর পূজা করিতে হয়; মহাষ্টমী এবং মহানবমীতে মন্ত্রের বচনের একটু পার্থক্য আছে, তাহার জন্য মূল পূজাপদ্ধতির কোন ব্যতিক্রম ঘটে না। তবে সন্ধি-পূজায় একটু মজা আছে। বোধনের পর জাগরিতা কুণ্ডলিনীর উপচয় ঘটে, মা জাগিয়া উঠিয়া হৃদয় জুড়িয়া এবং দালান জুড়িয়া বসিয়া থাকেন, সন্ধি-পূজার সময় হইতে সে বিকশিত শক্তির অপচয় আরম্ভ হয়, সন্ধি-পূজার পর হইতে বিজয়ার সূত্রপাত হয়। তাই সন্ধি-পূজা মজার পূজা; উহা বাহ্যিকও বটে, মানসও বটে। বাহিরে যেমন একশত আটটা দীপ জ্বালিয়া পূজা ও আরতি করিতে হয়, মনোময়ী চিন্ময়ী দেবীকে তেমনি ষড়রিপু, একাদশ আসক্তি, চতুঃষষ্টি রস এবং সাতাইশটা ভাব জ্বালিয়া হৃদয়মন্দিরকে সাজাইতে হয় এবং গমনোন্মুখী দেবীকে পূজা অর্চ্চনা এবং আরতি করিতে হয়। বিজয়ার কথাটা এখন আর বলিব না, বলিতে নাই বলিয়া বলিব না; পরে কখনও উহার ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিব। দুর্গোৎসবে যেমন বাহ্যিক ধূমধাম আছে, তেমনই প্রগাঢ় আধ্যাত্মিকতা আছে, আর পুরাণের হিসাবে ভাব ও রস আছে। দুর্গোৎসবের সঙ্গে বাঙ্গালিত্ব—বাঙ্গলার হিন্দুর বিশিষ্টতা যেন জড়ান মাখান আছে।

বলিদান ও দয়াধর্ম্ম

বলিদানের তত্ত্বটা আমাদের সমাজের মধ্যে অনেকেই ঠিকভাবে বুঝেন না, সবাই আংশিক ভাবে উহার আলোচনা করিয়া থাকেন। যে তিনটা পুরাণের পদ্ধতিক্রমে দুর্গোৎসব হইয়া থাকে, তাহার মধ্যে কালিকা পুরাণেই বলির একটু জাঁকজমক আছে, বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরাণেও মাসকলাই বলির অনুকল্প করা হইয়াছে; দেবীপুরাণেও

বলির প্রাধান্য তেমন দেওয়া হয় নাই। মহানির্ব্বাণতন্ত্রে স্পষ্টই লেখা আছে যে, ষড়রিপুকেই মায়ের দুয়ারে বলি দিতে হয়, সকল আসক্তির পুষ্প লইয়া পূজা করিতে হয়। অথচ সেই মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রে পঞ্চতত্ত্বের কথা লইয়া নানা মাংসের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, মৎস্যের ব্যবহারও করিতে বলা হইয়াছে। যেখানে আরাধনা, যেখানে ষট্‌চক্রভেদ, সেখানে বলিদান নাই, মেষ, ছাগ, মহিষের বধ-কার্য্য নাই; কিন্তু যেখানে যজ্ঞ, যেখানে সামাজিক উৎসবের কাজ, সেখানে বলিদান আছে, ভোগরাগ আছে, প্রসাদ-বিতরণ আছে, উৎসব আনন্দ আছে। সমাজের সকলেই কিছু আর শাক পাতা খাইয়াই থাকিতে পারে না, সমাজের মধ্যে মাংসাশী থাকিবেই, ভাল খাইবার, ভাল পরিবার লোক থাকিবেই। তাহাদের বাদ দিলে ত চলিবে না, সকলকে লইয়া উৎসব আনন্দে মাতিতে হইবে, কাজেই সকলের রুচি অনুসারে কাজ করিতেই হয়। তাহার পর তন্ত্রে একটা বড় কথা আছে। তন্ত্র বলেন, তোমার আত্মাই যখন তোমার ইষ্টদেবী, তখন সেই আত্মার তুষ্টি-পুষ্টির জন্য যাহা কিছু ভোগরাগের প্রয়োজন হইবে, তাহা দেবতাকে দিতে হইবে। বাঙ্গালী হিন্দু, জাতিগত বিশিষ্টতা বজায় রাখিয়া, সামাজিক বিধি নিষেধ মানিয়া যে সকল খাদ্য খাইতে পারে, যে সকল ভোজ্য উপভোগ করিতে পারে, তাহাই কুণ্ডলিনী দেবীকে সমর্পণ করিয়া, তাঁহার প্রসাদ খাইবে। তুমি তৃপ্তির সহিত যাহা খাও, তাহাই মাকে ভোগ চড়াইতে পার। বিন্ধ্যবাসিনীর মন্দিরের সম্মুখে তাই সাঁওতাল ও কোলগণ মুর্গী বলিদান দিয়া থাকে। আমি যাহা খাইব, তাহা দেবীর প্রসাদ করিয়া লইয়া খাইবার উদ্দেশ্যেই বলি দিয়া থাকি। তুমি যেমন, তোমার ইষ্টদেবতাও তেমনি হইবে; তোমার রুচি, তোমার প্রবৃত্তি অনুসারে তোমার দেবতার রুচি-প্রকৃতি নির্দ্ধারিত হয়। যে দেবী তোমার জাতি, কুল, গোত্র, প্রবর গ্রহণ করেন, সে দেবী তোমার আচার ব্যবহার, ভক্ষ্য ভোজ্য

গ্রহণ করিবেন না কেন? যদি বল, দেবতাকে মাংসভোগ দিতে ইচ্ছা করে না, তাহা যদি সত্য হয়, morbid sentimentalism না হয়, তাহা হইলে তোমারও মাংসভোজন পরিহার করিতেই হইবে। না করিলে, তোমার সাধনায় ব্যাঘাত ঘটিবে। এই ত গেল বাহিরের ভাবের কথা। ইহা ছাড়া বলিদানতত্ত্বের ভিতরে একটা গুপ্ত কথা আছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদেও সে কথার স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। তন্ত্র বলেন, দেহস্থ আত্মা উষ্ণ শোণিতের দ্বারা সঞ্জীবিত থাকেন; শোণিত ঠাণ্ডা হইলে আত্মাকেও দেহত্যাগ করিতে হয়, অতএব উষ্ণ শোণিত আত্মার খাদ্য, যাহার সাহায্যে শোণিতের উষ্ণতা বৃদ্ধি পায় তাহাই আত্মার খাদ্য। সুতরাং আত্মাকে ভোগ দিতে হইলে উষ্ণ শোণিতই প্রশস্ত ভোগ। এই সঙ্গে তন্ত্র বলেন, তোমরা যে দয়াপরবশ হইয়া ছাগবধ করিতে বাধা দেও—কেন? বৎসকে বঞ্চিত রাখিয়া তাহার মাতৃদুগ্ধ অপহরণ করা নির্দ্দয়তা নহে? দুগ্ধের পায়স পিষ্টক রচনা করিয়া দেবতাকে ভোগ দিলে তাহা দোষের হয় না? বৃক্ষ লতা গুল্ম সবাই সজীব, সকলেরই বেদনাবোধ আছে। বৃক্ষের ফুল ছিঁড়িয়া, ফল ছিঁড়িয়া দেবতাকে উপঢৌকন দেও যে, তাহাতে নির্দ্দয়তা প্রকাশ পায় না? সেটা কি জীবহত্যা নহে? আব্রহ্মতৃণ-স্তম্ব পর্য্যন্ত সর্ব্বস্বে ও সর্ব্বত্র জীবনদায়িনী কুণ্ডলিনী শক্তি বিরাজ করিতেছেন। বিশ্বব্যাপী পরমাত্মা অণুতে আছেন, পর্ব্বতেও আছেন। গোধূম, যব, ধান্য প্রভৃতি যাহা গুঁড়া করিয়া, সিদ্ধ করিয়া খাও—তাহা মাটিতে পুঁতিলেই গাছ হইবে, অতএব বুঝিতে হইবে সে সকলে প্রাণ আছে; তাহাদের প্রাণশক্তি সম্মূঢ় করিয়া নানা খাদ্যদ্রব্য তৈয়ার করিয়া দেবতার ভোগ দিলে কোন দোষের হয় না; কেন না বৃক্ষ লতা গুল্ম, গোধূম ব্রিহী ধান্য প্রভৃতি শস্য সকল ত পাঁঠার মতন চেঁচাইতে জানে না, তোমাদের করুণা ও অনুকম্পা আকর্ষণ করিতে পারে না, তাই অন্নভোগ দোষের নহে, তাহা নিরামিষ ও পবিত্র, আর পাঁঠা ও মাছ মারিয়া ভোগ দিলেই যত দোষ! তন্ত্র

এই দয়া ধর্ম্মের, এই ঘাস খাওয়ার গোঁড়ামীর বেজায় নিন্দা করিয়াছেন। যে যাহা খাইয়া তৃপ্তিবোধ করে, পুষ্টিলাভ করে, তাহার নিন্দা করার অধিকার তোমার নাই। তোমার পক্ষে যাহা ভাল, যাহা উপযোগী, তাহা অন্যের পক্ষে ভাল বা উপযোগী না হইতে পারে। এইটুকু বলিয়া তন্ত্র একটা বড় কথা বলিয়াছেন।

তন্ত্র বলেন—হিংসা হইতেই সৃষ্টি ; হিংসা ছাড়া সৃষ্টি হইতেই পারে না। স্থাবর জঙ্গম—সৃষ্টির যেদিকে তাকাও সেই দিকেই হিংসার বিকাশ। Biologyর হিসাবে কথাটা সত্য, তন্ত্রের হিসাবেও কথাটা সত্য। এই হিংসা শব্দ হইতে সিংহ শব্দের উদ্ভব। যেখানে দেহ, যেখানে দেহী, যেখানে শক্তির বিকাশ এবং বিভূতির অভিব্যঞ্জনা, সেইখানেই হিংসা,—সেইখানেই এক অপরকে চাপিয়া রাখিতে চাহে, দুর্ব্বল জীবদেহের দ্বারা প্রবল জীব পুষ্ট হইয়া থাকিতে চাহে—সেইখানেই, দেহে দেহে, স্থূলে সূক্ষ্মে, জীবে জীবে, ঘটে ঘটে, হিংসা সিংহরূপে বিদ্যমান, আর দেবী কুলকুণ্ডলিনী সিংহবাহিনীরূপে সিংহরূপী হিংসাকে বশে আনিয়া সৃষ্টির সামঞ্জস্য রক্ষা করিতেছেন। এই সিংহবাহিনী মায়ের কোলে যাইতে পারিলে, মায়ের ছেলে হইতে পারিলে, নগ্ন দিগম্বররূপে মাতার চরণে সর্ব্বস্ব অর্পণ করিতে পারিলে, তবে তেমন সাধক, তেমন মায়ের ছেলে "অহিংসা পরম ধর্ম্ম" এই মহাবাক্যের সার্থকতা সাধন করিতে পারে। নহিলে পাঁঠা ছাড়িয়া কেবল ঘাস খাইলে অহিংসার পুষ্টি হয় না ; মশা ছারপোকা না মারিয়া সামাজিক মনুষ্যের সর্ব্বনাশ সাধন করিলে অহিংসার উপচয় ঘটে না। যে ষট্‌চক্রভেদ করিতে পারিয়াছে, যে ইষ্টদেবীকে সর্ব্বস্ব অর্পণ করিতে পারিয়াছে, যাহার নিজের বলিবার কিছু নাই, যে মা-ছাড়া কিছু জানে না, জগৎ সংসার মা-ময় দেখে, সেই অহিংসা পরম ধর্ম্ম এই মহাবাক্যের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছে। তন্ত্র বলেন, মানুষকে যেমন পাইবে, তাহাকে তেমনই ভাবে লইবে, পরে ধীরে ধীরে সাধনার বকযন্ত্রে তাহাকে চোলাই করিয়া তাহার দেহস্থ আত্মশক্তি—

মনুষ্যত্বের সারকে বাহির করিয়া মাতৃপদে বিশ্বব্যাপী পরমাত্মার সহিত মিশাইয়া দিবে। প্রবৃত্তিমার্গের উপাসনায় মানুষ যেমন তাহার উপাসনা পদ্ধতি তেমনিই হইবে। যাহার যাহাতে অধিকার সে তাহা লইয়া ইষ্টের আরাধনা করিবে। ইহাতে ভাল মন্দ নাই, নিন্দা খ্যাতি নাই। যাঁহারা সিদ্ধ সাধক, তাঁহারা সকলেই এই ভাব লইয়া সংসারের সহিত ব্যবহার করেন। যাঁহারা সাধুসঙ্গ করিয়াছেন, প্রকৃত সদ্গুরু পাইয়াছেন, তাঁহারা তন্ত্রের এই বিচারের যাথার্থতা স্বীকার করিবেনই।

শেষ কথা

গত কুড়ি বৎসরকাল সমাচারপত্র সকলের সহিত সংবদ্ধ হইয়া আমি প্রতি বর্ষে দুর্গোৎসবের কথা লিখিতেছি। প্রতিবর্ষেই যতগুলি লিখিয়াছি সবই নূতন কথায় পূর্ণ করিয়া লিখিবার চেষ্টা করিয়াছি; তথাপি আজ পর্য্যন্ত আমার সকল কথা বলা হইল না। ইহা ছাড়া তন্ত্রতত্ত্ব বুঝাইবার জন্য গত চারিবৎসরকাল তন্ত্রকথা নিয়মিত ব্যাখ্যা করিতেছি। তন্ত্রের কোট্যংশের এক অংশ বলিতে পারিয়াছি কি না সন্দেহ। সেই তন্ত্রের ভাবের ও সাধনার নির্য্যাস আমাদের এই দুর্গোৎসবে নিহিত রহিয়াছে; স্তরে স্তরে বাঙ্গলার ইতিহাস, বাঙ্গালী জাতির উত্থান-পতনের কাহিনী এই উৎসবে লুকান আছে। উহার পূজাপদ্ধতিতে, উহার প্রতিমা নির্ম্মাণে, উহার উৎসব আনন্দে এক এক যুগের উপাখ্যান লুকান আছে। দুর্গোৎসব বুঝিতে পারিলে বাঙ্গলা দেশকে ও বাঙ্গালী জাতিকে বুঝিতে পারা যাইবে; উহা বাঙ্গালীর নিজস্ব, বাঙ্গালীর মনীষা ও প্রতিভা, প্রতিষ্ঠা ও বিশিষ্টতা উহার সাহায্যেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। উহার অধঃপতনে বাঙ্গলার অধঃপতন, বাঙ্গালিত্বের অপচয় ঘটিয়াছে। একবার এই দুর্গোৎসবকে বুঝিতে পারিলে, তোমার কাছে তোমার আত্ম পরিচয় ফুটিয়া উঠিবে, সে পূজা এবং সে উৎসব বুঝিবার চেষ্টা করিবে না কি? ভাব লইয়া সংসার, ভাব লইয়াই জাতির পুষ্টি এবং অভ্যুদয়, সেই ভাবের

মহাসাগর দুর্গোৎসব; সে দুর্গোৎসব, ঠিকমত বুঝিতে পারিলে তুমি নিজেকে নিজে চিনিতে পারিবে, তোমার পিতৃপরিচয় অব্যাহত রাখিবার জন্য পুরুষকার প্রয়োগ করিতে পারিবে। যে সভ্যতার বিকাশে বাঙ্গলার একদিকে শ্যাম, অন্যদিকে শ্যামা, এই দুই নীলকমল ভাব সরোবরে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, সে সভ্যতা নাই বটে, কিন্তু এমন দিন আসিতেছে যখন তৃপ্তি, শান্তি, তুষ্টিলাভ করিতে হইলে আবার সেই হারাণ সভ্যতার অন্বেষণ করিতে হইবে। তাই বলিতে ইচ্ছা করে,—একবার দেখ না, একবার বুঝ না,—তোমার যাহা নিজস্ব ছিল, তোমার যাহা বিশিষ্টতার শ্লাঘা ছিল,—তাহা একবার আবার তলাইয়া বুঝিবার চেষ্টা কর। হয় ত কিছু মঙ্গল হইতে পারে, হয় ত কিছু কল্যাণ হইতে পারে!

দুর্গোৎসবের দুই চারিটা কথা বলিতেই পুঁথী বাড়িয়া গিয়াছে, দুর্গোৎসবের ভাবাংশের সার মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর কথা বলিতে পারি নাই। সেও ত এক নিশ্বাসে বলিবার নহে। আজ তোমরা গীতা গীতা করিতেছ; সকলেই নিয়মিত গীতা পড় আর নাই পড়, গীতার নিষ্কাম ধর্ম্মের দোহাই দিতে তোমরা ছাড়না; নিষ্কামধর্ম্মটা যে কি, তাহা সকামা, বিষয়া, সংসারমায়ামুগ্ধ জীব আমরা কেমন করিয়া বুঝিব। কিন্তু ছিল একদিন, যেদিন বাঙ্গলার গৃহে গৃহে নিত্য চণ্ডী পঠিত হইত; ধনং দেহি, রূপং দেহি, যশো দেহি দ্বিষো জহি বলিয়া বাঙ্গালী সত্যের আদর করিয়া তৃপ্তিলাভ করিত। তখন বাঙ্গালী অন্য কাহারও কাছে কিছু চাহিত না; রাজার দ্বারে যাইয়া ধনৈশ্বর্য্য যাচ্ঞা করিত না, অর্থের আকাঙ্ক্ষায় পূর্ব্বপরিচয় লোপ করিয়া হাটে মামা হারাইত না, তখন বাঙ্গালীর যাহা চাহিবার ছিল, যাহা চাহিতে হইত তাহা ইষ্টদেবীর কাছেই চাহিত। তখন বাঙ্গালীর সকল আকাঙ্ক্ষা চণ্ডীর নিত্য পঠনপাঠনেই পূর্ণ ও পরিতৃপ্ত হইত। তাই বাঙ্গালী তখন বাঁচিতে জানিত, বাঁচিয়া থাকিতেও পারিত। তারাপুরের বামা ক্ষেপা একবার বলিয়াছিলেন—"ওরে পাগলা, মা

থাকতে কি ছেলে মরে ? মায়ের ছেলে হইয়া মায়ের কোলে বসিতে পারিলে, মারে কাহার বাপের সাধ্য। পুরাতন হইলে খোলস বদলাইতে পারে, বংশের ধারা, জাতির ধারা অক্ষুণ্ণ থাকে। মায়ের ছেলে মরে না।" ভাবের কথা, ভাবের ভাষায় ব্যক্ত, কিন্তু কথাটার মধ্যে একটা প্রগাঢ় সত্য নিহিত রহিয়াছে। মায়ের ছেলে হইয়া যতদিন আমরা ছিলাম, ততদিন আমরা বাঙ্গালী ছিলাম। মা কোল পাতিয়াই বসিয়া আছেন, বর্ষে বর্ষে এমনই ভাবে কোল ছড়াইয়া ছেলেদের সে ক্রোড়ে ডাকিবার জন্য আসিতেছেন। একবার মায়ের ক্রোড়ে উঠনা! উঠিয়া সে ক্রোড়ে আবার বসিতে পারিলে সুখ পাইবে, শান্তি পাইবে, তৃপ্তি পাইবে, হারানিধি আবার খুঁজিয়া পাইবে। সে হারানিধি কি জান ? সামাজিক উল্লাস এবং গৃহস্থলীর সুখ ও স্বস্তি। এখনও সে সব পুরাতন কথা মনে পড়ে,—দুর্গোৎসবের সামাজিক আমোদ আহ্লাদ, সজীবতা ও উল্লাস, কুলাঙ্গনাদিগের সে সরল হাসিমাখা মুখে পূজার আয়োজনের আনন্দ—বরণ করিবার শোভা, ভোগ রাঁধিবার আনন্দ,—আর বিজয়ার দিন সে পাঁজর ভাঙ্গা রোদন। "আবার আসিস্ মা" বলিয়া মায়ের পায়ে অঞ্চল জড়াইয়া গৃহিণীদের সে রোদন যে দেখিয়াছে, সে তাহার মাধুর্য্য, তাহার পবিত্রতা কখনই ভুলিতে পারিবে না। আমরা ত মাটির পুঁতুল পূজা করিতাম না, জীয়ন্ত মাকে লইয়া কয়েকদিন আমোদ-উৎসব করিতাম; তাই বিসর্জ্জনের দিন শ্বশুরবাড়ী মেয়ে পাঠাইবার বেদনা গৃহে গৃহে ফুটিয়া উঠিত। বিশ্বাসের সে সজীবতা, ভাবের সে মাধুর্য্য, ভক্তির সে প্রগাঢ়তা আর পাইব কি ? পাইতে হইলে আবার দুর্গোৎসব করিতে হইবে, আবার তেমনি আগমনীর সুরে সুর মিলাইয়া ডাকিতে হইবে—

"আয় মা আয়, আমার সতী আয়,
আমার কোলে আয়।"

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভ্রান্তি

স্তব্ধ হয়ে গেছে মোর যত সুখ দুখ।
আমি ভ্রান্ত, আমি ক্লান্ত! সব ব্যথাভার
নেমে গেছে, থেমে গেছে সঙ্গীত ঝঙ্কার।
শান্ত আজি ভ্রান্ত যত মিথ্যা ধুক্‌ধুক্‌!
শূন্যে মিলায়েছে মোর যত ভুলচুক।
ধূলিতে মিশায়ে গেছে সর্ব্ব অহঙ্কার
গর্ব্ব মম। অশ্রু যেন জমাট তুষার!
এ কি নীরবতা রাজে, ভরি মোর বুক!

হে মরণ, একি তুমি? চারিদিকে দেখি,
হে শূন্য বিরাট্‌, তব স্পন্দহীন ছায়া!
জীবন যৌবন আজি স্বপ্নসম; সে কি,
হে রহস্য ভাষাহীন, তোমারই কায়া?
সব যার অবসান হয়ে গেছে—এ কি,
ভুলায় তাহারে কেন আজি তব মায়া!

শ্রী——

অভিসারিকা

কবে কোন্ বসন্তের ঘুমন্ত নিশীথে,
শ্যামাঞ্চল বক্ষে টানি', কানন কুন্তলে
জড়াইয়া পুষ্পগুচ্ছ, মোহিনীর বেশে
অভিসারে বাহিরিলে বিশ্বপথ মাঝে,
অয়ি মুগ্ধা বসুন্ধরা! যাঁর প্রেমে ভুলি'
নিঃসঙ্গিনী লঘুপায় চলেছ তরুণি,
এতদিনে নাহি পেলে সন্ধান তাঁহার?
পথ ভুলি' ফেলিলে কি আপনা হারায়ে?
বাঞ্ছিতের লাগি' তাই সাগর-কল্লোলে
অস্ফুট ক্রন্দন তব উঠে কি গুমরি'?
থাকি' থাকি' হিয়া তব তাই উঠে কাঁপি?
যুগযুগান্তর গেল, আজো তব যাত্রা
নাহি হ'ল শেষ? তাই ভাবি, অয়ি মুগ্ধে,
কি নিবিড় প্রেম তব, কি মৌন বেদনা!

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত।

দুর্গোৎসবে নবপত্রিকা

আমাদের দেশের লোকের সংস্কার আছে যে দুর্গোৎসব বসন্ত-কালেই হইত। রামচন্দ্র রাবণবধের সময় শরৎকালে দুর্গার পূজা করিয়াছিলেন। শরৎকাল দক্ষিণায়ন—দক্ষিণায়ন দেবতাদের রাত্রি—সে সময় দেবতারা নিদ্রিত থাকেন। সেই জন্য শরৎকালে দুর্গাপূজার পূর্ব্বে বোধন করিতে হয়। এই বোধন দালানে হয় না,—চণ্ডীমণ্ডপে হয় না। একটি বেলগাছের তলায় হয়। বেলগাছের তলায় বেদী করিতে হয়। বেদীর উপর ঘটস্থাপন করিতে হয়। তখন ঘটই দেবীর প্রতিমা। বেলতলায় ঘটে দুর্গাদেবীর 'আমন্ত্রণ' ও 'অধিবাস' করিতে হয়। এ 'আমন্ত্রণ' 'আবাহন' নহে। আবাহনের মন্ত্র স্বতন্ত্র, আমন্ত্রণের মন্ত্র স্বতন্ত্র—আবাহনের ক্রিয়া স্বতন্ত্র,—আমন্ত্রণের ক্রিয়াও স্বতন্ত্র। এই সময়ে অধিবাসে নবপত্রিকার আবশ্যক হয়।—

"রম্ভা, কচ্চী, হরিদ্রা চ জয়ন্তী বিল্বদাড়িমৌ
"অশোকো মানকশ্চৈব ধান্যঞ্চ নবপত্রিকা।"

এই নবপত্রিকারও অধিবাস করিতে হয়। কলাগাছ, গুঁড়ি-কচুর গাছ, হলুদগাছ, জয়ন্তীর ডাল, বেলের ডাল, দাড়িম গাছ, অশোকের ডাল, মানকচুর গাছ ও ধানের গাছ। দুর্গার যেমন অধি-বাস করিতে হয় তেমনি এই নয়টি গাছেরও অধিবাস করিতে হয়। তখন এ গাছগুলি আর গাছ থাকেন না—দেবতা হইয়া যান। কলা-গাছ হন ব্রহ্মাণী ; কচু হন কালিকা ; হরিদ্রা হন দুর্গা ; জয়ন্তী হন কার্ত্তিকী ; বেল হন শিবা ; দাড়িম হন রক্তদন্তিকা ; অশোকা হন শোকরহিতা ; মানকচু হন চামুণ্ডা ; আর ধান হন লক্ষ্মী। দুর্গার পূজা আরম্ভ হয় সপ্তমীর দিন, আর বোধন হয় ষষ্ঠীর দিন সন্ধ্যার সময়। সপ্তমীর দিন প্রত্যূষে পূজার প্রথম কাজ নবপত্রিকার স্নান। ঐ নয়টি গাছ কলার খোলায় মুড়িয়া নয় গাছা পাটের দড়ী দিয়া বাঁধিতে

হয়। পাট শব্দের অর্থ রেশম। এখন একটু রেশম দেয়, বাকীটা পাটের দড়ী দিয়াই সারে। স্নানের ঘাটে নবপত্রিকা লইয়া যাইবার পূর্ব্বে বোধন তলার বেলগাছের ঈশান কোণে যে শাখায় যোড়া বেল থাকে সেই শাখাটি ছেদন করিতে হয়—ছেদন করিয়া নবপত্রিকার মধ্যে এমন ভাবে বসাইতে হয় যে বেলদুটি উপরে দেখা যায়। অনেকে কলার খোলায় নবপত্রিকা বসাইবার পূর্ব্বে একটি শ্বেত অপরাজিতার লতায় ঐ নয়টি গাছ বাঁধিয়া দেন। অপরাজিতার লতার ডগাটিও উপর হইতে দেখা যায়।

নবপত্রিকার স্নান একটা বৃহৎ ব্যাপার। সাধারণ লোকে উহাকে বলে 'কলাবৌ' নাওয়ান। নানারূপ বাজনা বাজাইয়া নবপত্রিকা লইয়া ঘাটে যায়। সেখানে প্রত্যেক গাছের দেবতাকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মন্ত্র পড়িয়া স্নান করাইতে হয়। রাজার অভিষেকে যেমন নানা সমুদ্র, নানা নদীর জল দিয়া অভিষেক করিতে হয়, নবপত্রিকার স্নানেও সেইরূপ নানা নদীর নানা সমুদ্রের জল লাগে। কিন্তু অত জল ত সংগ্রহ করিতে পারা যায় না। সেইজন্য যে কয় প্রকারের জল পাওয়া যায়, তাহাতেই কাজ সারিতে হয়। ইহা ছাড়া উগ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা, চামুণ্ডা, চণ্ডোগ্রা, চণ্ডনায়িকা, চণ্ডিকা, কাত্যায়নী, ভগবতী, ব্রহ্মাণী, মাহেশ্বরী, বৈষ্ণবী, নারসিংহী, ডাকিনী, শাকিনী, এই সকল দেবীরও স্নান করাইতে হয়। প্রত্যেক দেবীর স্নানের দ্রব্য স্বতন্ত্র। যথা, উগ্রচণ্ডার চন্দন জল, প্রচণ্ডার সুবর্ণ জল, চামুণ্ডার কর্পূর জল, চণ্ডোগ্রার অগুরুর জল, চণ্ডনায়িকার নদজল, চণ্ডিকার মধুর জল, কাত্যায়নীর মধুপর্কের জল, ভগবতীর শিশির জল, ব্রহ্মাণীর হাতীর দাঁতে যে মাটি ওঠে সেই মাটিগোলা জল, মাহেশ্বরীর শূয়োরের দাঁতে যে মাটি ওঠে সেই মাটিগোলা জল, বৈষ্ণবীর আদালতের গেটের মাটিগোলা জল, নারসিংহীর বেশ্যার দুয়ারের মাটিগোলা জল, ডাকিনীর চৌমাথার মাটিগোলা জল, আর শাকিনী নদীর উভয় কূলের মাটিগোলা জল।

ইহার পর আবার আটটি ঘটের জলে নবপত্রিকাকে স্নান করাইতে হয়। প্রথম ঘটে গঙ্গার জল—এই জলে স্নান করাইবার সময় মালব রাগে বাজনা বাজাইতে হয়। দ্বিতীয় ঘটে বৃষ্টির জল—বাজনা ললিত রাগে, তৃতীয় ঘটে সরস্বতীর জল (প্রভাসের জল)—বিভাস রাগে দুন্দুভি বাজনা; চতুর্থে সাগর জল—ভৈরবী রাগ, ভীমবাদ্য; পঞ্চমে পদ্মপরাগমিশ্রিত জল—গৌড়রাগ মহেন্দ্রাভিষেক বাদ্য; ষষ্ঠে ঝরণার জল—বড়ারি রাগ শঙ্খবাদ্য; সপ্তমে সর্ব্বতীর্থের জল—বসন্তরাগ, শঙ্খবাদ্য; অষ্টমে তীর্থের জল—ধানসী রাগ, ভৈরবীবাদ্য।

এইরূপে নবপত্রিকাকে স্নান করাইয়া গা মুছাইয়া দালানের সম্মুখে আলিপনা দেওয়া পিঁড়ীর উপর বসাইয়া তাহাতে দুর্ব্বা, আলো-চাল, ফুল, চন্দন ইত্যাদি দিয়া নবপত্রিকার পূজা করিতে হয়। এই সময়ে 'ভূতাপসরণ' করাইতে হয়; তাহার পর খই, দুর্ব্বা, আলোচাল, চন্দন, শাদা সরিষা ছড়াইতে ছড়াইতে নবপত্রিকাকে পিঁড়ী হইতে উঠাইয়া দালানে দুর্গা-প্রতিমার ডাইন দিকে বসাইতে হয়। এই নবপত্রিকাকেই লোকে 'কলাবৌ' বলে। কিন্তু লোকে গণেশের পাশে বসেন বলিয়া নবপত্রিকাকে গণেশের 'কলাবৌ' বলে কিন্তু ইনি গণেশের বৌ নন। হইলে ইনি গণেশের বামে বসিতেন—ডাহিনে বসিতেন না।

নবপত্রিকার যে নয়টি দেবী আছেন, সপ্তমী অষ্টমী নবমী তিন দিনই ষোড়শোপচারে তাঁহাদের পূজা করিতে হয়। তবে মানকচুর দেবতা যে চামুণ্ডা তাঁহার একটা বিশেষ পূজা আছে তাহার নাম 'সন্ধিপূজা'। সন্ধিপূজায় অন্য কোন দেবতার অধিকার নাই, কেবল চামুণ্ডারই অধিকার। অষ্টমী ও নবমীর সন্ধিক্ষণেই সন্ধিপূজা হয়।

দেবীর বিসর্জ্জন হইয়া গেলে স্বতন্ত্রভাবে নবপত্রিকার বিসর্জ্জন করিতে হয়।

দুর্গার বসন্তকালে পূজা হইত। রামচন্দ্র শরৎকালে সেই পূজা আরম্ভ করেন ইহাই আমাদের দেশের সংস্কার। এ সংস্কারের কি

মূল তাহা জানি না। বাল্মীকি রামায়ণে রাবণবধের পূর্ব্বে দুর্গা-পূজার কোন কথাই নাই। 'কুম্ভঘোণমের' ছাপান রামায়ণ দেখিলাম তাহাতে নাই। তুলসীদাসে নাই, রামরসায়নে নাই—আছে কেবল কৃত্তিবাসে। চণ্ডীতে এ পূজা শরৎকালের পূজা বলিয়াই বর্ণনা আছে।—

"শরৎকালে মহাপূজা ক্রিয়তে যা চ বার্ষিকী।
"তস্যাংমমৈতন্মাহাত্ম্যং শ্রুত্বা ভক্তিসমন্বিতঃ॥
"সর্ব্বাবাধাবিনির্মুক্তো ধনধান্যসুতান্বিতঃ।
"মনুষ্যো মৎপ্রসাদেন ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥"

এইটি চণ্ডীর শেষ অধ্যায়ে আছে। দেবী নিজেই বলিতেছেন শরৎকালে একটি মহাপূজা হইয়া থাকে। তাহাতেই দুর্গামাহাত্ম্য পাঠ করিতে হইবে। তিনি আরও বলিতেছেন, বৎসরের মধ্যে একবার নানা পুষ্প ধূপ, দীপ নৈবেদ্য দিয়া পূজা করিলে আমার প্রীতি হয়—সেই সময়ে আমার মাহাত্ম্য পাঠ করিতে হয়। ইহার একটু পরেই আছে যে সুরথ রাজা ও সমাধি নামে বৈশ্য দুইজনে নদীর চড়ায় মাটির ঠাকুর গড়িয়া তিন বৎসর পূজা করিয়াছিলেন। মাটির ঠাকুর গড়িয়া পূজার কথা এইখানেই পাওয়া যাইতেছে। নদীর চড়ায় মাটির ঠাকুর তিন বৎসর থাকা অসম্ভব, তাহাতেই বোধ হয় যে সুরথ রাজা শারদীয়া পূজাই করিয়াছিলেন এবং তিন দিন পূজা করিয়াই বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। এইরূপে তিন বৎসর পূজা হইয়াছিল।

এই ত দুর্গোৎসবের ব্যাপার। আসল কথা হইতেছে যে বহু-কাল ধরিয়া শরৎকালে একটি মহাপূজা হইত। যখন দেবীর মুখ হইতে এরূপ কথা বাহির হইয়াছে, তখন তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। কিন্তু সে পূজাটি যে কি তাহা দেবী বলেন নাই। আমার মনে হয় সেটি 'নবপত্রিকা' পূজা। মেধস ঋষির কথা শুনিয়া সুরথরাজা মাটির মূর্ত্তি গড়িয়া পূজা করিতে আরম্ভ করেন।

সে মুর্ত্তি যে কি তাহা ঋষি বলেন নাই। সে মুর্ত্তি দশভুজা—কি না—তাহা আমরা জানি না—সে মুর্ত্তির সহিত লক্ষ্মী সরস্বতী কার্ত্তিক গণেশ থাকিতেন কি না—তাহাও আমরা জানি না। তবে শারদীয়া পূজায় মুর্ত্তি-পূজা এই আরম্ভ।

আমাদের এই দুর্গোৎসব কতদিন আরম্ভ হইয়াছে একথার বিচার করিতে গেলে আমরা দেখিতে পাই ইহা বেশী দিনের নহে। ডাকিনী শাকিনীর পূজা খৃষ্টীয় আট শতকের পূর্ব্বে ছিল বোধ হয় না। কারণ মহাযান ও মন্ত্রযানের পরে বজ্রযান সহজযান ও কালচক্রযানেই ডাক্ ডাকিনী শাক শাকিনী প্রভৃতি উপদেবতার পূজার কথা পাওয়া যায়। দুর্গোৎসবের পুঁথি খুঁজিতে গেলেও আমরা দেখিতে পাই যে আমরা দুর্গোৎসব সম্বন্ধে যে প্রাচীন পুস্তক পাইয়াছি তাহা মহামহোপাধ্যায় শূলপাণির লেখা। মহামহোপাধ্যায় শূলপাণি তাঁহার গ্রন্থে মাধবাচার্য্যের মত উদ্ধার করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাকে ১৩৫০এর পূর্ব্বে ফেলা যায় না। তিনি তাঁহার পুস্তকে দুর্গোৎসব সম্বন্ধে জিকন ও ধনঞ্জয়ের মত তুলিয়াছেন। জিকন ও ধনঞ্জয় এগার শতকের লোক হইতে পারেন, কারণ দ্বাদশ শতকের দায়ভাগকার জীমূতবাহন জিকনের মত উদ্ধার করিয়াছেন। রায়মুকুট ১৪৩১ খৃঃ অব্দে তাঁহার পুস্তকাদি লেখেন, তিনি কিন্তু দুর্গোৎসবের কথা বলেন নাই। তাঁহার স্মৃতির পুস্তকে বরং জগদ্ধাত্রী পূজার কথা আছে, কিন্তু দুর্গোৎসবের কথা নাই। তাহাতে বোধ হয় সে সময়ে দুর্গোৎসবের এত প্রচার হয় নাই। রঘুনন্দন ১৬ শতকের প্রথম অর্দ্ধে তাঁহার 'তত্ত্ব' রচনা করেন। তিনি তিথি-তত্ত্বের মধ্যে দুর্গোৎসবের সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়া গিয়াছেন। তাহাতেও নবপত্রিকা পূজার খুব বাহুল্য আছে। রঘুনন্দনের সময় হইতে এ পর্য্যন্ত দুর্গোৎসব খুব চলিয়া আসিতেছে। ইংরাজীশিক্ষা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে অনেকে মনে করিতেন দুর্গোৎসব অবশ্য কর্ত্তব্য। সকল ব্রাহ্মণের বাড়ীই দুর্গোৎসব হইত। রঘুনন্দন বলিয়া গিয়াছেন প্রতি বৎসরই দুর্গাপূজা করিতে হইবে।

তুর্গোৎসবের প্রধান কার্য্য নবপত্রিকা পূজা। মাটির ঠাকুর গড়িয়া তিন দিন পূজা করিয়া পরে বিসর্জ্জন দেওয়া কেবল বাঙ্গলাতেই আছে, আর কোন দেশে নাই। বাঙ্গালীরাই ঐ পূজা করিয়া থাকে, আর কোন দেশের লোকে করে না। কিন্তু নবরাত্র-পালন ও নবপত্রিকা-পূজা অনেক দেশে হইয়া থাকে। আমাদের দেশে কল্পারম্ভ হয়, অপর পক্ষের নবমীতে নয়, দেবীপক্ষের প্রতিপদে, না হয়, দেবীপক্ষের ষষ্ঠী তিথিতে। কিন্তু অন্যান্য স্থানে প্রতিপদ হইতে নয় দিন পূজা অর্চ্চনা হয়। এইজন্য উহাকে 'নবরাত্র' বলে। উহাতেও নবপত্রিকার পূজা করিতে হয়। সুতরাং শরৎকালে নবপত্রিকার পূজাটা অনেক দেশেই আছে এবং সেইটাই ঠিক শারদীয়া পূজা।

অতি প্রাচীনকালে ঋতু পরিবর্ত্তনের সময় লোকে একটা না একটা উৎসব করিত। মন্দ ঋতু হইতে যখন ভাল ঋতু আসে তখন উৎসবের মাত্রাটা বাড়িয়া যায়। বর্ষা একটা মন্দ ঋতু, কেন না বর্ষায় লোকে ঘরের বাহির হইতে পারে না, একগ্রাম হইতে অন্য গ্রামে যাওয়া তুর্ঘট হয়, অনেক সময় বাড়ীর বাহির হওয়া যায় না। যাওয়া-আসা বন্ধ হইয়া যায়। বৌদ্ধরা আপন আপন বিহারে আবদ্ধ থাকিতেন। ব্রাহ্মণদেরও মতে নারায়ণ এই সময় শুইয়া থাকেন। রাজা-রাজড়ারা সৈন্য সামন্ত লইয়া বাহির হইতে পারিতেন না। তাঁহাদের বিজয়যাত্রা বন্ধ হইয়া যাইত। সুতরাং বর্ষা যে মন্দ ঋতু ও কষ্টকর ঋতু সেবিষয়ে সন্দেহ নাই। তাহাতে আবার বর্ষাকালে খাওয়া-দাওয়ার জিনিস পাওয়া যায় না। বাঙ্গলা দেশে পাড়াগাঁয়ে বর্ষাকালের আহারের মধ্যে সঞ্চিত অড়হরের দাল আর ঝুনো নারিকেল ভাজা, কারণ নারিকেল গাছ বর্ষাকালে ভাদ্র মাসেই ঝাড়াইতে হয়। বর্ষা ঋতু চলিয়া গেল, আকাশ পরিষ্কার হইল, লোকে সূর্য্যদেবের মুখ দেখিতে পাইল, পথের কাদা শুকাইয়া আসিতে লাগিল। কুমড়া, শশা, লাউ, চেঁড়োষ, বাতাবী নেবু, বরবটি, আর ক্রমে কড়াইশুটি নটে শাক প্রভৃতি নানারূপ তরিতরকারী তৈয়ার হইতে লাগিল। বাঙ্গলায় একটা অসাধারণ

খাস্ত খেজুর গুড় এই সময় হইতে জন্মিতে থাকে। আউশ ধান্য উঠিয়া গিয়াছে, আমন্ ধান ফুলিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই ত একটা মস্ত উৎসবের সময়।

কিন্তু কি লইয়া উৎসব করিবে। প্রাচীন কালের লোকেরা ত আর ঠাকুর গড়িতে পারিত না, কুম্ভকার শিল্পের ত তখন তত উন্নতি হয় নাই। তাহারা গাছপালা লতাপাতা লইয়াই উৎসব করিত। সকল দেশেই গাছপালা লতাপাতা লইয়া উৎসব আছে। আর এদেশের প্রাচীন লোকে নয়টি গাছ লইয়া উৎসব করিত, শরৎকালেই এই নয়টি গাছে খুব পাতা বাহির হয়। কলাপাতার এমন শ্রীবৃদ্ধি আর কোন সময় হয় না। এই সময়েই কলাগাছের চারিদিকে তেউড় বাহির হইতে থাকে ; পাতাগুলি সবল সতেজ ও সবুজ হইয়া উঠে। গুঁড়ি কচু চাষের এই সময়। এই সময় গুঁড়ি কচুর পাতাগুলি কেমন নধর হইয়া উঠে। হলুদের গাছ বর্ষার প্রথমেই পাতা ছাড়িতে আরম্ভ করে এবং শরৎকালের প্রথমে সে পাতায় হলুদের ক্ষেত্ বন হইয়া যায়, পাতাও বেশ লম্বা চওড়া হয়। সেকালে জয়ন্তী ফুলের গাছ সকল ব্রাহ্মণের বাটীতেই থাকিত, তান্ত্রিক পূজায় জয়ন্তীফুলের বড়ই আদর। জয়ন্তীর ফুল বসন্তকালেই হয়। শরতের প্রথমে জয়ন্তী গাছ পাতায় ভরিয়া যায়। বসন্তে বেলের পাতাগুলি সব পড়িয়া যায়, নূতন পাতা গজাইতে থাকে, বেল পাকিয়া গেলে সেই পাতার বাহার বাড়িতে থাকে। শরতে তাহার খুব বাহার হয়। দাড়িমগাছের পাতাও এই সময়ে খুব বাড়িতে থাকে। অশোকের ফুল ফোটে বসন্তে, নূতন পাতাও হয় বসন্তে, কিন্তু সে পাতার পূর্ণ যৌবন শরৎকালে। এই সময়ে পাতার খুব বাহার হয়, খুব সবুজ হয় এবং খুব পুরু হয় ও খুব বাড়িতে থাকে। শরতে মানপাতার যত বাহার এত বোধ হয় আর কোন পাতারই নয়। শীতের শেষে মান পাতা পচিয়া যায়। গ্রীষ্মে পাতাই থাকে না, বর্ষায় একটু একটু পাতা বাহির হইতে থাকে, শরতে সেই পাতা ফুলিয়া প্রকাণ্ড হইয়া উঠে। একটা একটা

মানপাতা লম্বে ৪।৫ ফুট ও আড়ে ৩।৪ ফুট দেখিতে পাওয়া যায় আর শরতের আমন ধান, এখনও ধান ফুলে নাই কিন্তু চরম বাড় বাড়িয়া উঠিয়াছে, এবং ঘোরাল মেঘের মত রঙ্গ হইয়াছে; সুতরাং এই নয়টি পাতা একত্র করিয়া অপরাজিতা লতায় বাঁধিয়া তাহা লইয়া লোকে যে উৎসব করিবে তাহার আর বিচিত্র কি?

এখন কথা হইতেছে যে যদি নবপত্রিকা পূজাই দুর্গোৎসবের আসল পূজা হয়, তাহা হইলে বাসন্তী পূজাকে শরতে আনিয়া যে দুর্গোৎসব হইয়াছে বলিয়া প্রবাদ আছে, সেটা কিরূপ সম্ভব হইতে পারে? আর কৃত্তিবাস যে বলিয়া গিয়াছেন, বসন্তকালে দেবীর যে পূজা ছিল তাহাই রামচন্দ্র শরৎকালে করিয়াছেন একথাই কিরূপে সম্ভবপর হয়? নবপত্রিকার অনেক পত্রই ত বাসন্তী পূজার সময় পাওয়া যায় না। গুঁড়ি কচুর গাছ একবারেই মিলে না। হলুদের পাতা একবারেই থাকে না। জয়ন্তী ডাঁটাসার হইয়া যায়, বেলও তাই। মানপাতার অবস্থা আরও শোচনীয়, যদিও পাওয়া যায় সে কুলপাতার মত। ধানের ত কথাই নাই, না আমন না আউস্ না বোরো; সুতরাং নবপত্রিকা এ সময়ে পাওয়াই যায় না। যাহারা বাসন্তী পূজা করেন তাহারাই জানেন নবপত্রিকা সংগ্রহ করিতে কি বেগ পাইতে হয়।

প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, অতি প্রাচীনকালের লোকে সর্ব্বত্রই দেবতা বা Spirit দেখিতে পাইত। তাহারা মনে করিত, জগতের সকল বস্তুতেই অদৃশ্য, অপ্রত্যক্ষ দেবতা বাস করেন। এই যে গাছপালা গজায়, উহার ফুল ফুটে, ফল হয়, এ সবই দেবতার খেলা। প্রথম প্রথম তাহারা গাছপালাকেই দেবতা বলিত, তাহার পর তাহাদের মনে হইল যে, গাছপালা ত দেবতা হইতে পারে না, উহা জড়পদার্থ; কোন দেবতা উহার মধ্যে আছেন। তাহারা গাছপালার নামেই ঐ দেবতার নাম দিত। আমাদের ও অন্য প্রাচীন গ্রন্থে "বৃক্ষাভিমানিনী দেবতা" "পর্ব্বতাভিমানিনী দেবতা" প্রভৃতি অভিমানিনী দেবতার নাম পাওয়া যায়। ক্রমে যখন আরও মাথা

পরিষ্কার হইল, জগতে কার্য্যকারণভাবের উদ্বোধ হইল, তখন "অভিমানিনী দেবতা" আর পছন্দ হইল না। দেবতা গাছ বলিয়া আপনাকে মনে করেন—এই ত অভিমানিনী দেবতার মানে—ইহা তাঁহাদের অসঙ্গত বোধ হওয়ায় তাঁহারা অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কল্পনা করিলেন। দেবতারা আপনাদের গাছ বলিয়া মনে করেন না, কিন্তু গাছের মঙ্গলামঙ্গল দেখিতে একজন দেবতা আছেন—তিনিই হইলেন গাছের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।

অতিপ্রাচীনেরা বর্ষার পর শরৎ আসিলেই, শরতের ভাল ভাল গাছপালা তুলিয়া, তাহাই লইয়া উৎসব করিতেন; মনে করিতেন ইহাতে শরৎ প্রসন্ন হইবেন, আমরা আনন্দে থাকিব, শরতের সহিত আমাদের বেশ একটি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, বিশেষ আত্মীয়তা জন্মিয়া যাইবে। কিন্তু ক্রমে যতই তাহাদের বুদ্ধির বিকাশ হইতে লাগিল, ততই দেখিতে লাগিলেন যে গাছপালা পূজা করিয়া আর কি হইবে? পুরোহিত ঠাকুরেরা সর্ব্বত্রই আছেন। তাঁহারা অমনি বলিয়া দিলেন যে উহা ত আর গাছপালার পূজা নয়, উহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদের পূজা। গাছপালা দেবতাগণের বিভূতি। সেই সময়ে নবপত্রিকার অধিষ্ঠাত্রী নয়টি দেবীর কল্পনা করা হইল।

নবপত্রিকার প্রথম গাছ কলাগাছ, প্রথম দেবতা ব্রাহ্মী, অর্থাৎ ব্রহ্মার শক্তি; সুতরাং তিনিই প্রথম, কলাগাছের সহিত কাজেই তাহার সম্পর্ক। ব্রহ্মাণী রাঙা, অনেক কলাগাছ ত রাঙাই আছে, তাহার মোচা ত ঘোরাল রাঙা। সুতরাং কলাগাছই ব্রহ্মাণীর বিভূতি হইতে পারে। ব্রহ্মাণীর চারিটি মুখ, কলাগাছেরও চারিদিকেই পাতা, উহা ঠিক মুখের মতই দেখায়। ব্রহ্মাণী হংসের উপর বসেন, হংসটি শাদা, কলাগাছও শাদা এঁটেটির উপরে বসেন।

অতি প্রাচীনেরা দেবতার সহিত তাঁহার বিভূতির কিরূপ মিল দেখিতেন আমরা তাহা জানি না। আমাদের সে চক্ষু নাই। তাহার পর আবার তাঁহারা যে বিভূতির যে দেবতা করিয়াছিলেন আজও যে

সেই বিভূতির সেই দেবতা ঠিক আছেন তাহা বিবেচনা হয় না। কারণ পুরোহিত মহাশয়েরা অনেক বার পূজার সংস্কার করিয়াছেন। গ্রন্থকার মহাশয়েরা অনেক নূতন নূতন পদ্ধতি লিখিয়াছেন। সাত নকলে যে আসল খাস্তা হইয়া গিয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই দেখুন না কলাগাছ যে ব্রহ্মাণীর বিভূতি ইহা আমরা বেশ দেখিতে পাইতেছি। বিশেষ অগ্নীশ্বর কলার গাছ সব রাঙ্গা—পাতার ডাঁটাটি পর্য্যন্ত রাঙ্গা, ছোবড়াটি ছাড়াইয়া ফেলিলে কলার শাঁসটি পর্য্যন্ত রাঙ্গা। এ কলাগাছকে ব্রহ্মাণীর বিভূতি বলিতে কাহারও বিশেষ আপত্তি হইবে না। কিন্তু গুড়িকচু গাছের অধিষ্ঠাত্রী কালিকা কেমন করিয়া হইলেন বলা একটু কঠিন। কালিকা কাল, গুঁড়ি কচুর গাছ ত ঘোরাল সবুজ। ঘোরাল হইলেই কালর দিকেই টানে। কচুর পাতাগুলি কালীর জিবের মত, কিন্তু তবুও কালীর সঙ্গে উহার যে বিশেষ তুলনা হইতে পারে, তাহা বোধ হয় না। তাই দুর্গাপূজা-পদ্ধতিকার লিখিয়াছেন যে কালিকাদেবী বক্ররূপ ধারণ করিয়া মহিষা-সুর যুদ্ধে অসুর বধ করিয়াছিলেন। এইরূপ চক্ষে দেখিয়াও কিছু তুলনার সামগ্রী পাওয়া যায় না। একটা প্রবাদ লইয়া দেবীও তাঁহার বিভূতির একটা সম্পর্ক বাধাইয়া দিলেন।

হলুদ গাছের অধিষ্ঠাত্রী—দুর্গা। রঙ্গ দুয়েরই এক। শরতে হলুদ গাছের পূর্ণযৌবন। নবযৌবনসম্পন্না দুর্গারই পূজা হইয়া থাকে। যেমন মৃণালের গেঁড় হইতে মৃণালগুলি বাহির হয়, তেমনি দুর্গার শরীর হইতে দুর্গার দশটি হাত বাহির হইয়াছে। হলুদেরও গেঁড় হইতে বহুসংখ্যক হলুদ বাহির হয়, সুতরাং এখানেও বেশ একটা তুলনা হইতে পারে।

তারপর জয়ন্তীগাছ। জয়ন্তীর অধিষ্ঠাত্রী কার্ত্তিকী। কার্ত্তিক হইতেই দেবতাদের জয়; সুতরাং কার্ত্তিকের শক্তিকে অনায়াসে জয়ন্তী বলা যায়। সে জয়ন্তীর বিভূতি জয়ন্তীগাছ কেন হইবে না। পদ্ধতিকার কার্ত্তিকীর যে নমস্কারের মন্ত্র দিয়াছেন, তাহাতে বলিয়াছেন

যে শুম্ভনিশুম্ভের সহিত যুদ্ধকালে জয়ন্তীর পূজা হইয়াছিল। জয়ন্তী ফুলের রং কাল, নীল আর রাঙ্গা তিনে এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে। এরূপ শোভা ময়ূরের গলায়ই দেখা যায়। ফুলের উপরকার পাতাটি যে ভাবে গুটাইয়া যায় তাহাতে ময়ূর পুচ্ছের সহিত বেশ তুলনা হইতে পারে, তাই বোধ হয় কোন অতি প্রাচীন কবি ময়ূরের রঙের সহিত জয়ন্তীর রঙের তুলনা দেখিয়া কার্ত্তিকীকে জয়ন্তীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী করিয়াছেন।

তারপর বেলগাছ। বেলগাছ শিবের বড় প্রিয়। সুতরাং বেলের অধিষ্ঠাত্রী যে 'শিবা' হইবেন তাহাতে বিচিত্র কিছুই নাই। দাড়িমের অধিষ্ঠাত্রী রক্তদন্তিকা। দাড়িমের ফুল দেখিলেই রক্তদন্তিকার সহিত তাঁহার যে বেশ তুলনা হয়, সেটা বুঝিতে আর বাকী থাকে না। দাড়িম দানার সঙ্গেও লোকে দাঁতের তুলনা করিয়া থাকে। কিন্তু এখানে বোধ হয় ফুলের সহিতই তুলনা করিয়াই দাড়িমের অধিষ্ঠাত্রী দেবী রক্তদন্তিকা করিয়াছেন। চণ্ডীতে আছে—

"ভক্ষয়ন্ত্যাশ্চ তান উগ্রান বৈপ্রচিত্তান্মহাসুরান।
"রক্ত দন্তা ভবিষ্যন্তি দাড়িমীকুসুমোপমাঃ॥
"ততো মাং দেবতাঃ স্বর্গে মর্ত্ত্যলোকে চ মানবাঃ।
"স্তুবন্তো ব্যাহরিষ্যন্তি সততং রক্তদন্তিকাং॥"

অশোক গাছের অধিষ্ঠাত্রী দেবী শোকরহিতা। দেবী ও তাঁহার বিভূতির সম্বন্ধ নামেই প্রকাশ—ইনিও অশোক; উনিও শোকরহিতা। তারপর মানগাছের অধিষ্ঠাত্রী চামুণ্ডা। শুম্ভ ও নিশুম্ভর সহিত যুদ্ধকালে শুম্ভ নিশুম্ভ রক্তবীজ নামক এক অসুরকে দেবীর সহিত যুদ্ধ করিতে পাঠাইয়াছিলেন। তাহার একবিন্দু রক্ত মাটিতে পড়িলেই আবার রক্তবীজ জন্মাইত। দেবী তাহাকে যতই আঘাত করিতে লাগিলেন ততই নূতন নূতন রক্তবীজের আবির্ভাব হইতে লাগিল। দেবী মহাবিপদে পড়িয়া কালীকে বলিলেন—তুমি হাঁ কর। কালী হাঁ করিয়া রহিলেন। রক্তবীজের সমস্ত রক্ত তাঁহার মুখে পড়িতে

লাগিল, আর নূতন রক্তবীজ হইতে পারিল না। পুরাণ রক্তবীজ অনায়াসে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল। চামুণ্ডা হইলেন—হাঁ-করা দেবতা। সে দেবতার হাঁর সহিত মানপাতার বেশ তুলনা হইতে পারে। যদি হাঁর সহিত না হয়—তাঁহার জিবের সহিত মানপাতার বেশ তুলনা হইতে পারে। সুতরাং মানপাতার সহিত চামুণ্ডার বেশ একটা সম্বন্ধ পাতান যাইতে পারে।

ধানের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মী। এখানে দেবী ও বিভূতির সম্বন্ধ বেশী বলিয়া দিতে হইবে না। ধানই লক্ষ্মী—লক্ষ্মীই ধান।

এইরূপে দেখা গেল শরৎকালের নয়টি গাছ হইতে নয়টি দেবীর সৃষ্টি হইল। আমার এক একবার বোধ হয় যে শুম্ভ নিশুম্ভ বধকালে দেবী যে অষ্টনায়িকা ও চামুণ্ডার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাঁহারাই পরিণামে নবপত্রিকার অধিষ্ঠাত্রী হইয়াছিলেন। কিন্তু সে কথা জোর করিয়া বলিবার যো নাই। কারণ অষ্ট-নায়িকার নাম—ব্রহ্মাণী, মাহেশ্বরী, বৈষ্ণবী, বারাহী, নারসিংহী, কৌমারী, ঐন্দ্রী, দেবী দুর্গা নিজে। চামুণ্ডা তাহার উপর। কিন্তু দুর্গোৎসবের পদ্ধতিতে নবপত্রিকার অধিষ্ঠাত্রী নয়টি দেবতার নাম ব্রাহ্মী, কালিকা, দুর্গা, জয়ন্তী, কার্ত্তিকী, শিবা, রক্তদন্তিকা, শোকরহিতা, চামুণ্ডা ও লক্ষ্মী। দুর্গোৎসবের পদ্ধতি যে দেবীমাহাত্ম্যের উপরই নির্ভর করে সে বিষয়ে সন্দেহ অতি কম। সুতরাং দেবীমাহাত্ম্যের সহিত যেখানে পদ্ধতির অমিল সেখানে পদ্ধতির মধ্যেই কিছু গোল আছে বলিয়া মনে হয়। নবপত্রিকার অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদের মূর্ত্তি গড়া হয় না, কিন্তু বোধ হয় ঐ অধিষ্ঠাত্রীদের সহিত দুর্গার পরিবারের মিল করাইয়া দুর্গোৎসবের মৃণ্ময় মূর্ত্তি সকল গড়া হয়। এই সকল মৃণ্ময় মূর্ত্তিতে কখনও বা দেবতা নিজে থাকেন, কখনও বা তাঁহার শক্তি থাকেন, কখনও বা দুইই থাকেন। চালচিত্রে শিব থাকেন। তাঁহার শক্তি দুর্গা—দুর্গোৎসবের প্রধান দেবতা। কার্ত্তিকেয়ী শক্তি, তাঁহার দেবতা কার্ত্তিক, তিনি নিজে থাকেন তাঁহার শক্তি থাকে না। বিষ্ণুর শক্তি লক্ষ্মী, তিনি দুর্গার

ডাহিনে থাকেন। ব্রহ্মাণীর আর এক নাম সরস্বতী, তিনি দুর্গার বামে থাকেন। পুরাপুরি নয়টি দেবী না থাকিলেও, উঁহাদের চারিটি যে দুর্গোৎসবের মূর্ত্তিতে আছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা দুর্গোৎসবের মূর্ত্তিগুলিকে নবপত্রিকার অধিষ্ঠাত্রীগণের মূর্ত্তি বলিয়া মনে করিয়া লইতে পারি। লক্ষ্মী সরস্বতী কার্ত্তিক গণেশ যদিও আপাত দৃষ্টিতে বেশ ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া মনে হয়, যদিও পদ্ধতিকারেরা উহাদিগকে আবরণ দেবতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন,তথাপি তাঁহারা দেবী হইতে ভিন্ন নহেন। কারণ বিসর্জ্জনের সময় সমস্ত আবরণ-দেবতাকে দুর্গাশরীরে লয় করিয়া তাঁহাকে বিসর্জ্জন দিতে হয়। দুর্গামাহাত্ম্যেও আছে যে, যখন অষ্টনায়িকা ও চামুণ্ডা তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন তখন শুম্ভ বলিলেন—

অন্যাসাং বলমাশ্রিত্য যুধ্যসে যাতিমানিনী।

তখন দেবী বলিলেন—

একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।
পশ্যৈতা দুষ্ট ময়্যেব বিশন্ত্যো মদ্বিভূতয়ঃ॥

বলিয়া সমস্ত নবনায়িকাকে নিজ শরীরে লয় করিয়া লইলেন। দুর্গা একমাত্র থাকিলেন।

এইরূপে দুর্গোৎসবের সমস্ত ব্যাপার পিঁজিয়া পিঁজিয়া দেখা গেল যে, এই যে শারদীয়া পূজা ইহা অতি প্রাচীন কালের একটি শরৎকালের উৎসব। এই উৎসব শরৎকালের গাছপালা লইয়াই হইত। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এইরূপ গাছপালা লইয়া উৎসব আছে। 'আন্থ্রাপলজি'র পুস্তক পড়িলে দেখা যাইবে পৃথিবীর নানাস্থানে শীতের প্রারম্ভে এইরূপ গাছপালা লইয়া উৎসব হইয়া থাকে। ক্রমে সেই গাছপালার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হন। ক্রমে সেই দেবতাগণের মূর্ত্তি হইল। এমন সময়ে দুর্গা-মাহাত্ম্য নামক পুস্তকের উৎপত্তি হইল। দুর্গা-মাহাত্ম্যের সহিত মিলাইয়া নয় মূর্ত্তি হইতে ছোটখাট মূর্ত্তি বাদ দিয়া বড় বড় মূর্ত্তি দিয়া উৎসবের প্রতিমা গড়া হইল। ক্রমে সেসকল

মূর্ত্তি এক মূর্ত্তিতে অন্তর্হিত হইয়া গেল ; তিনিই প্রধান মূর্ত্তি—তিনিই দুর্গা। তিনিই—দশভুজা। গাছপালার পূজা ক্রমে ব্রাহ্মণদের হাতে পড়িয়া অষ্টেতে পরিণত হইল।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

বিজয়া

আজি গো সকল নয়ন হইতে ঝরিছে সলিল-ধারা ;
কাঁদিয়া নবমী করেছে গমন, ক্ষুব্ধ চন্দ্র তারা ;
বিদ্ধ করিয়া সকল প্রাণ, কহিছে বিদায় বাণী
তোমার মূরতিখানি জননি তোমার প্রতিমাখানি।

স্নেহের তনয়া সজল-নয়নে যাইলে আপন বাসে
বিজয়া দশমী আঁধার ভবনে আপনি স্মরণে আসে ;
বাসনা সতত ভকতি-কুসুমে পূজিতে জগত-রাণি,
তোমার মূরতিখানি জননি তোমার প্রতিমাখানি।

আঁধারে, আলোকে, হরষে, দুঃখে, ব্যাপিয়া সকল কাজে,
তোমার স্মৃতিটি সকল সময়ে জাগিছে হৃদয় মাঝে,
ভূষিত করিয়া অমর শোভায়, রাখিবে নয়নে আনি,
তোমার মূরতিখানি জননি তোমার প্রতিমাখানি।

বৎসর পরে স্থাপিবে চরণ, মোদের কুটীরে আসি,
দেখিব মধুর অধরে আবার ভুবনমোহন হাসি ;
শোভিবে উজলি সকল গৃহ হরষ আলোক দানি,
তোমার মূরতিখানি জননি তোমার প্রতিমাখানি।

শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র।